জাকারিয়া মাসুদ

সমর্পণ

১ ফাগুনহাওয়া বয়ে যাক তোমার পরানে | ০৯

২ জীবনটা কি এসবের জন্যেই? | ২৩

৩ জীবন্ত কিংবদন্তির উপাখ্যান | ৩৭

৪ Come on my brother, let us pray | ৪৭

৫ কাছে আসার সাহসী গল্প | ৬৩

৬ চমকানো মেঘ যেন চমকায় অবিরাম | ৭৩

৭ আঁধার ছাড়ায়ে যাব হারায়ে সঙ্গে তোমায় লয়ে | ৮১

৮ তবুও তো অনেক দেরি হয়ে যাবে | ৯৫

৯ মুশরিকরাও যাকে সত্যভাষী বলে মেনে নিয়েছিল | ১০১
১০ স্বাধীনতার সুখ | ১০৯
১১ প্রবঞ্চনা কোরো না নিজের সাথে | ১২৩
১২ চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে | ১৪৩
১৩ সময়ের ভ্রান্তিতে টলো না... | ১৫৫
১৪ তুমি ফিরবে বলে... | ১৬৩
১৫ অভিমত | ১৮১

ভূমিকা

বইটির কোনো ভূমিকা নেই। আমি চাচ্ছি না, ভূমিকা পড়ার সময়টুকুও নষ্ট হোক তোমার। এর চেয়ে বরং মূল আলোচনায় চলে যাই আমরা। ঝটপট এক কাপ কফি বানিয়ে ফেলো। দুধ-চিনি একটু বাড়িয়ে দিয়ো। ধোঁয়া ওঠা কফি খেতে খেতে আলোচনা শুনতে খুব একটা খারাপ লাগবে না আশা করি।

তোমার ভাই,

জাকারিয়া মাসুদ

৩০/০৬/১৯ খ্রি.

ফাগুনহাওয়া বয়ে যাক তোমার পরানে

"প্রত্যেকটা মানুষের অন্তরেই কিছু অস্থিরতা বিদ্যমান, যা শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই দূর করা সম্ভব। প্রত্যেকের অন্তরেই রয়েছে একাকীত্বের অনুভূতি, যা শুধুমাত্র আল্লাহর নৈকট্যলাভেই নির্মূল করা সম্ভব। প্রত্যেক অন্তরেই ভয় এবং উদ্বেগ বিরাজমান, যা শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে ছুটে যাওয়ার মাধ্যমেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। প্রতিটা অন্তরেই কিছুটা দুখানুভূতি বিদ্যমান, যা কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমেই মোচন করা সম্ভব।"

[ইবনু কাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন, ৩/১৫৬]

রাকিব আমার ক্লাসমেট। ক্লাসে ও আর আমি পাশাপাশি বসি। দুজনেই ব্যাকবেঞ্চার। তবে আমাদের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। রাকিব ধনী বাবার সন্তান, আর আমি নিতান্তই মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির ছেলে। কিছুটা ব্যতিক্রমতা থাকে উচ্চবিত্তদের লাইফস্টাইলে। আড্ডা-ফুর্তি-গান নিয়েই মত্ত থাকে ওরা। রাকিবও তেমন। বলে রাখা ভালো, রাকিব ওর ছদ্মনাম। ইচ্ছে থাকলেও আসল নামটা বলতে পারছি না। ও বারণ করেছে।

ভার্সিটির লাঞ্চ ব্রেক হয় বেলা একটায়। একটার দিকেই মাসজিদে আজান হয়। সোয়া একটায় সালাত। সালাত শেষে দুপুরের খাবার খেতে ক্যান্টিনে গেলাম। লাঞ্চ করতে করতে রাকিব জানাল, নিজের জীবন নিয়ে এখন সে অতিষ্ঠ। হতাশার সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে। কোনো কাজেই তার আর মন বসছে না। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, লাইফস্টাইল চেঞ্জ করে দেখবে কী হয়। রাকিবের কথা শুনে আমি আনন্দিত হলাম। যাক, শেষমেষ বন্ধুটা আমার ভুলগুলো বুঝতে পেরেছে। ও নিজের হতাশার কারণ জানাল। বাবার কাছে আবদার করে কোনো জিনিস পায়নি, এমন রেকর্ড নেই লাইফে। আইফোন থেকে শুরু করে কোর আই-সেভেন ল্যাপটপ, সবই আছে ওর। এতকিছুর পরেও নাকি সে শূন্যতা অনুভব করে। মাঝে মধ্যে চুপিচুপি কাঁদে।

ক্লাস শেষে আমরা গন্তব্যে ফিরছি। রাকিব জোর করে আমায় ফুচকা চত্বরে বসাল। সামনে পুকুর, দু-পাশে গাছপালা, আর বিকেলের মিষ্টি রোদ। পরিবেশটা অনেক সুন্দর। রাকিব জানাল, কদিন ধরে সে ঘুমোতে পারছে না। চোখে ঘুম থাকলেও অন্তর জেগে থাকছে। রাত পেরিয়ে যাচ্ছে বিছানায় গড়াগড়ি আর গান শুনে। কাল ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমিয়েছে। এখন সে কী করবে, বুঝে উঠতে পারছে না। ফুচকা খেতে খেতে আমি ওকে কিছু ঘটনা শুনালাম। ঘটনাগুলো একটু গুছিয়ে লিখেছি এখানে :

১.

মডেল সিনহা রাজ। পুরো নাম মাহাতারা রহমান শৈলী। মা-বাবার একমাত্র সন্তান সে। বিয়েও দিয়েছিলেন তাদের পছন্দে। কিন্তু স্বামীকে পছন্দ হয়নি তার। তাই নতুন করে সংসার গড়েছিলেন অভিজিতের সাথে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কাজ করতেন মিডিয়ায়। অভিজিৎ অভিনয় করতেন বিভিন্ন নাটকে। পরিচালক হিসেবেও কাজ করতেন। ওই জগতে তার নাম ছিল অভিজিৎ অভি।

মহাখালীর দক্ষিণপাড়ার ভাড়া বাসায় থাকতেন দুজন। বাইরে বাইরে খুব ভালোই কাটছিল জীবন। কিন্তু কোনো এক মধ্যরাতে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায় সিনহাকে। অভিজিৎ ও প্রতিবেশীরা তাকে নামিয়ে আনে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় মহাখালী মেট্রোপলিটন হাসপাতালে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। তীব্র হতাশা আর বুকচাপা কষ্ট নিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় শৈলী।

২.

চেস্টার বেনিংটন। একজন মার্কিন গায়ক। গীতিকার এবং অভিনেতা। বহুল পরিচিত লিংকিন পার্কের ভোকাল। এ ছাড়া দুটো রক ব্যান্ড ডেড-বাই-সানরাইজ ও স্টোন-টেম্পল-পাইলটসের সাথেও জড়িত ছিল ও। চেস্টার পরিচিতি লাভ করেন ২০00 সালে। লিংকিন পার্কের প্রথম অ্যালবাম হাইব্রিড-থিয়োরিতে ভোকাল হিসেবে গান গাওয়ার মাধ্যমে। অ্যালবামটি ব্যাপক সফলতা পায়। ওই দশকের সেরা অ্যালবামের তালিকায় স্থান করে নেয় হাইব্রিড-থিয়োরি। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি চেস্টারকে।

লিংকিন পার্ক-পরবর্তী ওর স্টুডিও অ্যালবামগুলো হলো—মিটিওরা, মিনিটস্-টু-মিডনাইট, এ-থাউজ্যান্ড-সানস্ এবং লিভিং-থিংস্। এগুলো যথাক্রমে ২০০৩, ২০০৭, ২০১০ এবং ২০১২ সালে প্রকাশ পেয়েছে। বেনিংটন তার নিজের ব্যান্ড ডেড-বাই-সানরাইজ শুরু করেন ২০০৫ সালে। ব্যান্ডটির প্রথম অ্যালবাম আউট-অব-অ্যাশেজ প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালের অক্টোবরের ১৩ তারিখে। বেনিংটনকে শ্রেষ্ঠ ১০০ হেভি মেটাল ভোকালিস্টদের একজন মনে করা হয়। গত ২০ জুলাই, ২০১৭-তে ক্যালিফোর্নিয়ার নিজ বাড়িতে তাঁর ঝুলন্ত লাশ পাওয়া যায়। লক্ষ জনতার মনজয়কারী এ গায়ক লস অ্যাঞ্জেলসের 'পালোস ভার্দোস স্টেটে' আত্মহত্যা করে।

লাখ লাখ ফ্যান-ফলোয়ারদের কাঁদিয়ে নিজের অশান্ত আত্মার কাছে পরাজিত হয়ে গলায় দড়ি দেয় চেস্টার।

৩.

২৪ মে, ২০১৭। মঙ্গলবার। ভোর ৫টা নাগাদ মিরপুরের রূপনগরের সাবলেট বাসা থেকে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় মডেল সাবিরা হোসাইনের লাশ। গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে সাবিরা। ওই বাসায় তিনি একাই থাকতেন।

সাবিরা বিভিন্ন ফ্যাশন হাউজের মডেল ছিলেন। একই সাথে মোহনা টেলিভিশন এবং গান বাংলা টেলিভিশনের মার্কেটিং অ্যাক্সিকিউটিভ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পারিবারিক ও প্রেমঘটিত কারণে বেশ ক'মাস মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন সাবিরা। ফেসবুকে আত্মহত্যার বিষয়ে ইঙ্গিতও দিচ্ছিলেন তিনি। মানসিক বিপর্যস্ততার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে শেষমেশ আত্মহত্যা করেন সাবিরা।

৪.

রক ব্যান্ড অ্যামারসন এবং লেক অ্যান্ড পামারের সহপ্রতিষ্ঠাতা কিথ এমারসন। মারা গেলেন ৭১ বছর বয়সে। বিখ্যাত এই ব্যান্ডটির ফেইসবুক পেইজে এ খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। ফেইসবুক পেইজে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে কেইথ অ্যামারসন সান্তা মনিকা, লস অ্যাঞ্জেলসে তার নিজের বাড়িতে মারা গেছেন।' অ্যামারসনের গার্লফ্রেন্ড মারি কাওয়াগুচি, শুক্রবার সকালে তার মৃতদেহ আবিষ্কার করে। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন তিনি।

ওদিকে আবার মোহাম্মদপুরের বাসায় গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন লাক্স তারকা সুমাইয়া। এক সময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ডলি আনোয়ারও একই পন্থায় আত্মহত্যা করে মারা যান। গত কয়েক বছরে তারকাদের আত্মহত্যার তালিকায় রয়েছেন—মডেল ও অভিনেত্রী মিতা নূর, লাক্স তারকা রাহা, মডেল ও অভিনেতা মঈনুল হক অলি, সিনহা, নায়লা, লোপা, সাবিরা, পিয়াস-সহ আরও অনেকেই। আর আত্মহত্যার চেষ্টা করেও বেঁচে আছেন। লাক্স তারকা জাকিয়া বারী মম, কণ্ঠশিল্পী নাজমুন মুনিরা ন্যানসি, মডেল ও অভিনেত্রী প্রভা এবং সারিকা। এর বাইরে অপ্রকাশিত তালিকায় যে কত শত অভিনেতা-অভিনেত্রী লুকিয়ে আছে, তা আল্লাহই

ভালো জানেন।

ঘটনাগুলো শোনানোর পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা রাকিব, তারা কেন আত্মহত্যা করল? কীসের অভাব ছিল তাদের? জনপ্রিয়তা?'

রাকিব বলল, 'নাহ। আমাদের থেকেও তো বহুগুণ বেশি ছিল এদের জনপ্রিয়তা।'

'তা হলে কি টাকা-পয়সার অভাব ছিল ওদের?'

'নাহ, তাও তো না। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের টাকা কম থাকবে নাকি?'

'তা হলে? কী ছিল না তাদের? কোন জিনিস না পাওয়ার বেদনা তারা করত ওদের? কেন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকত ওরা? আর এতকিছু পাওয়ার পর কেনই-বা তারা আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে?'

আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয়নি রাকিব। রাকিবের প্রশ্নটাই যদি তোমাকে করি, তবে তুমি কী উত্তর দেবে?

নবি ﷺ বলেছেন,

> "জেনে রাখো, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে। যখন তা ঠিক হয়ে যায়, তখন পুরো শরীরটাই ঠিক হয়ে যায়। আর যখন তা খারাপ হয়ে যায়, তখন পুরো শরীরটাই খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখো, সে গোশতের টুকরোটি হলো অন্তর।"[১]

যে অন্তর জীবনের মূল চালিকাশক্তি, সেটিকে তোমরা অস্বীকার করো বিজ্ঞানের নাম দিয়ে। আজকাল বিজ্ঞান হয়ে গেছে ছেলের হাতের মোয়া। যে যেভাবে চাচ্ছে, সেভাবেই ব্যবহার করছে। এসব বিজ্ঞান-অজ্ঞানের চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ভেবে দেখো একবার, যখন অন্তর ভালো থাকে জীবনটা কি তখন সতেজতায় ভরে যায় না? আর মনটা যখন খারাপ হয়ে যায়, তখন জীবনটা কি থমকে যায় না? বিষণ্ণতা মাথার ওপর চেপে বসে না?

বস্তুবাদ ইয়াং জেনারেশানকে ডুবিয়ে রেখেছে সেক্স-মিউজিক-মুভি-ড্রাগ-মানি-ক্যারিয়ারের সমুদ্দুরে। অতৃপ্ত আত্মার মানুষগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ছে এসবের ওপর। হৃদয় প্রশান্তকারী উপাদান খুঁজছে এসবের মধ্যে। কিন্তু এসব কি আদৌ মনকে নির্মল

---

১. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : ঈমান, হাদীস : ৫০।

করতে পারে? দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে পারে মানুষকে? নাকি অন্তরকে আরও অশান্ত করে তুলে? এসব যদি সত্যিই হৃদয়ে ফাগুনহাওয়া এনে দিতে পারত, তবে তো আত্মহননের পথ বেছে নিত না অর্থ-বিত্ত-বিলাসিতা-বৈভবের মাঝে বেড়ে ওঠা মানুষগুলো। নির্জনে চোখের জল ফেলত না রাকিবের মতো আদরের দুলালরা। না পাওয়ার বেদনা তাড়া করত না সুপার স্টারদের। লাখ লাখ ফলোয়ার থাকা সত্ত্বেও একাকীত্ব অনুভব করত না হলিউড-বলিউডের সেলিব্রেটিরা।

আধুনিক বিশ্বের সাথে খাপ-খাওয়াতে-চাওয়া মানুষগুলোর অন্তরটা শূন্যই রয়ে যায়। ওরা সারাক্ষণ আরও চাই আরও চাই স্লোগানে ডুবে থাকে। পান থেকে চুন খসলেই বেঁচে থাকাটা অর্থহীন হয়ে যায় ওদের কাছে। যাদের অভিধানে আখিরাত নামক কোনো শব্দের চ্যাপ্টার নেই, তাদের অবস্থা তো এমনটা হবেই। দুনিয়ার সুখ-শান্তিই যাদের মুখ্য বিষয়, হতাশা তাদের গ্রাস করবে না তো কাদের করবে বলো!

রাকিবের মতো তুমিও হয়তো হতাশায় নিমজ্জিত। জীবনের সঠিক গন্তব্য না থাকার কারণে, তোমার হৃদয়ও হয়তো ক্ষত-বিক্ষত। না পাওয়ার বেদনাই তোমার নিত্যসঙ্গী। আসলে বাহ্যিক উন্নতি-প্রগতিই তো মূল বিবেচ্য বিষয় তোমার কাছে। গার্লফ্রেন্ড-ফেইসবুক-মিউজিক-সেক্স এগুলোর চিন্তা তো বিভোর হয়ে আছ তুমি। আত্মিক জিনিসপত্তরের আর ঠাঁই দিলে কোথায়! ভাই আমার! বিশ্বাস করো, এসব ধোঁকার সামগ্রী আমাদের সাময়িক উত্তেজনা এনে দিতে পারে, কিন্তু কখনোই অন্তরকে নির্মল করতে পারে না।

"জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়।"[২]

যে আল্লাহ এই মনের স্রষ্টা, তিনিই বলেছেন—এর প্রশান্তি একমাত্র তাঁকে স্মরণ করার মধ্যেই। হৃদয়ের স্রষ্টা এভাবেই সেটাপ করেছেন হৃদয়কে। অন্তরে যখন আল্লাহ ছাড়া নারী-বাড়ি-গাড়ি-চাকরি স্থান পাবে, তখন হতাশা কেবল বাড়তেই থাকবে। না পাওয়ার বেদনা তাড়া করে বেড়াবে ক্ষণে ক্ষণে। 'কী যেন নেই আমার। কোন জিনিস যেন পাইনি আমি! কোথায় যেন একটা শূন্যতা রয়ে গেছে'—মনে এমন ভাবনার উদয় থাকবে প্রতিনিয়ত।

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামাতের দিন উত্থিত করব দিন অন্ধ অবস্থায়।"[৩]

২. সূরা রদ, (১৩) : ২৮ আয়াত।
৩. সূরা ত্বহা, (২০) : ১২৩-১২৪ আয়াত।

যে আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে, তার জীবনটা নিমীলিত হয়ে যাবে। সবকিছু পাওয়ার পরও সংকীর্ণ মনে হবে ধরণিকে। হাজার হাজার ফ্যান-ফলোয়ার থাকা সত্ত্বেও হতাশা কাটানোর জন্যে বেছে নিতে হবে আত্মহত্যার পথ। আধুনিক বিশ্বের দিকে তাকালে এই সত্যিটা স্পষ্ট হবে তোমার কাছে। হতাশা কাটাতে পশ্চিমারা অ্যালকোহল গ্রহণ করে, পার্টিতে যায়, সেক্স করে, ড্রাগ নেয়—কিন্তু দিনশেষে মোটাদাগে হতাশাগ্রস্তই থেকে যায়। কারণ নেশার-ঘোরে থাকলে হয়তো ব্যথা-বেদনা ভুলে থাকা যায়, কিন্তু নেশা কেটে গেলে হতাশা আবার চাঙা হয়ে ওঠে। এসব নেশার সামগ্রী তো সাময়িক সমাধানমাত্র। কিন্তু বাস্তব জীবনটা আর তো ক্ষণিকের নয়। পিচঢালা রাজপথ, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, আর দালান-কোঠার আধিক্য দেখে ভেবো না ওরা খুব শান্তিতে আছে। যদি শান্তিতেই থাকত, তবে আত্মহত্যায় ফার্স্ট হতো না ওরা। ধনী দেশগুলোর তালিকায় ওরা যেমন সামনের সারিতে রয়েছে, তেমনই আত্মহত্যার তালিকায়ও সামনের সিটগুলোই দখল করে রেখেছে ওরা।[৪]

চলো, ঝটপট একটা ক্যালকুলেশান করে ফেলি।

মনে মনে দুজন ব্যক্তিকে কল্পনা করো।

একজন দিবানিশি কেবল অর্থের পেছনেই ছুটে চলে। মানি-সেক্স-পর্ন-মিউজিক-ফ্ল্যাট-ব্রাইট ক্যারিয়ার এসবকে জীবনের মূল লক্ষ্য বানিয়েছে সে। তার কাছে বৈধ-অবৈধ সবই সমান। সে যে-কোনো মূল্যে নিজের ইচ্ছেগুলো পূর্ণ করতে চায়। প্রতিটি ক্ষণ ওসবের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। ফলে নিদ্রাহীন রজনিযাপন-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-হতাশা তার নিত্য অভ্যাসে পরিণত হয়।

আরেকজন ব্যক্তি মুমিন। যে কিনা আখিরাতের সফলতাকেই প্রকৃত লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে। সে বৈধ-অবৈধ পথ বেছে বেছে চলে। তার নিজের দুনিয়াবি খায়েশগুলো কতটা পূর্ণ হলো সেদিকে না তাকিয়ে, কে ইবাদাতের মাধ্যমে জান্নাতের মর্যাদা বাড়িয়ে নিল—সর্বদা সেদিকে লক্ষ রাখে। ফলে রাতের বেলা প্রশান্ত-হৃদে সাজদায় গিয়ে রবের কাছে আরও বেশি বেশি নেক আমল করার সুযোগ চায়।

এবার বলো তো, ওপরের দু-ধরনের ব্যক্তির মধ্যে কে বেশি সুখী হবে?

প্রথম ধরণের ব্যক্তি ক্ষণস্থায়ী সুখের মোহে প্রতিনিয়ত অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে

---

8. "Suicide rates Data by country". World Health Organization. 2016. Retrieved 23 September 2018.

রাতের আঁধারে, দিনশেষে তার অন্তরে কেমন জানি একটা অনুশোচনার জন্ম নেয়। সর্বদা এটা ভেবে সে উৎকণ্ঠিত থাকে যে, কেউ তাদের অন্তরঙ্গতার সময় দরজায় করাঘাত করছে কি না। তার বিবেকের দংশন তাকে আতংকিত করে তুলে; মেয়েটা কি তবে গর্ভবতী হয়ে যাবে, গর্ভপাতই কি করাতে হবে... পরিস্থিতির অবনতি ঘটার সাথে সাথে তার উদ্বেগ বাড়তেই থাকে। দুনিয়াবি শান্তির খুঁজে বেপরোয়াভাবে নিজেকে পাপের এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায়, এক নারীর বিছানা থেকে আরেক বিছানাতে, এক পানীয় থেকে অন্য পানীয়তে, এক সম্পর্ক থেকে অন্য সম্পর্কতে, অনলাইনের একটা অশ্লীল ভিডিও থেকে অন্যটিতে আবর্তন করায়। পাপের চক্রে ঘুরপাক খেতে থাকে অনবরত। আল্লাহর সাথে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান দূরত্ব তার অন্তরকে ধীরে ধীরে কঠিন থেকে কঠিনতর করে এবং জীবনকে করে তুলে অন্ধকারাচ্ছন্ন। সে তার অন্তরের শূন্যতা পূরণ করতে চায় যে-কোনো মূল্যে। কিন্তু তার অনুসৃত পন্থায় হৃদয়ের শূন্যতা কখনোই পূরণ হয় না। বরং বাড়তেই থাকে।[৫]

অপরদিকে দ্বিতীয় ধরনের ব্যক্তি মনে করে, দুনিয়াটা ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়ার দু [illegible]-কষ্টগুলোও ক্ষণস্থায়ী। এগুলো একদিন ঠিকই ফুরোবে। কিন্তু আখিরাতের দু [illegible]-কষ্টগুলো ফুরোবে না কখনও। একথা সে মাথায় রাখে সব সময়। ফলে দুনি[illegible]র ক্ষতিটাকে পরীক্ষা আর আখিরাতের ক্ষতিটাকে সর্বনাশা ক্ষতি হিসেবে বি[illegible]না করে।

> "অতঃপর আল্লাহ্ খারাপ লোকদের একজনকে আরেকজনের ওপর রে[illegible] সকলকে স্তূপীকৃত করবেন, এরপর এদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন (প্রকৃতপক্ষে) এই লোকগুলোই চরম ক্ষতিগ্রস্ত।"[৬]

সে দুনিয়ার ব্যথা-বেদনাগুলোর ওপর সর্বদা সবর করে। এগুলোকে আল্লাহর [illegible] থেকে আসা পরীক্ষা মনে করে ধৈর্য ধরে। সে যা পায়নি, তা নিয়ে কখনও আফ[illegible]ন করে না। কারণ সে বিশ্বাস করে—না পাওয়া বস্তুটা তারই ছিল না। আর যে জি[illegible]ন তার নয়, সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করাটা একধরনের বোকামো মনে হয় তার কাছে[illegible]স দুনিয়াকে একটা পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে দেখে। এবং বিশ্বাস করে—দুনিয়ায় [illegible]ক বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করা হবে। কখনও ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে, কখনও ব্যবস[illegible]ক লসের মাধ্যমে, কখনও-বা প্রিয় জিনিস তুলে নেওয়ার মাধ্যমে।

---

৫. বিপদ যখন নিয়ামাত, পৃষ্ঠা : ৬৮।

৬. সূরা আল-আনফাল, (০৮) : ৩৭ আয়াত।

> "আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, জানমাল ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি কিছু একটা দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। আর তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যধারণকারীদের।"[৭]

তাই পরীক্ষায় ভালো মার্কস পাওয়ার জন্যে সব সময় প্রস্তুত রাখে নিজেকে। সে যদি ভালো কিছু পায়, তো রবের শুকরিয়া আদায় করে। আর যদি কিছু হারায়, তবে ধৈর্যধারণ করে। কারণ সে জানে, এই ধৈর্যই তাঁকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে।

> "তাদেরকে তাদের ধৈর্যধারণের প্রতিদানস্বরূপ জান্নাত দেওয়া হবে। সেখানে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হবে সংবর্ধনা ও সালাম সহকারে। তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থান ও আবাসস্থল হিসেবে তা কতই-না উত্তম!"[৮]

যদি দীর্ঘদিন কষ্ট করার পরও ভালো জব না পায়, কিংবা ব্যবসায় মোটা অঙ্কের ক্ষতির সম্মুখীন হয়, অথবা কোনো প্রিয় জিনিস যদি হারিয়ে যায় তার জীবন থেকে, তখনও মনমরা হয়ে পড়ে থাকে না। কারণ, তার রবের ওয়াদা মমতার পরশে শুনিয়ে দেয় :

> "আমি যখন আমার মুমিন বান্দার কোনো প্রিয়তম কিছু দুনিয়া থেকে তুলে নিই আর সে ধৈর্যধারণ করে, তার জন্যে জান্নাত ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান নেই আমার কাছে।"[৯]

কেউই যখন তাকে বুঝতে চায় না, তার সমস্যাগুলো শুনতে চায় না, কিংবা প্রিয় কেউ ভুল বুঝে দূরে চলে যায়, তখনও সে একাকীত্ব অনুভব করে না। বরং খুশিমনে বলতে থাকে :

> "আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি।"[১০]

আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে হারামের সাথে সম্পর্ক আছে এমন চাকুরি ছেড়ে দিয়ে সে যখন সামান্য মাইনেতে ছোটোখাটো কোনো জব করতে থাকে আর তাই দেখে পাড়া-প্রতিবেশীরা হাসি-তামাশা করে, তখনও সে বিচলিত হয় না। কারণ, সে জানে :

---

৭. সূরা বাকারাহ, (০২) : ১৫৫ আয়াত।

৮. সূরা ফুরকান, (২৫) : ৭৫-৭৬ আয়াত।

৯. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : কোমল হওয়া, হাদীস : ৫৯৮১।

১০. সূরা ইউসুফ, (১২) : ৮৬ আয়াত।

> "আল্লাহ্ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অমুককে ভালোবাসেন। অতএব তুমিও তাকে ভালোবাসো।' (এ কথা শোনার পর) জিবরীলও তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন। এরপর সে (জিবরীল) আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন—'আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন। কাজেই তোমরাও তাকে ভালোবাসো।' তখন আকাশবাসীরাও ওই বান্দাকে ভালোবাসতে শুরু করে। অতঃপর পৃথিবীতে তাকে সম্মানিত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।"[১১]

শত্রুভাবাপন্ন লোকদের হাজারও ঠাট্টা-মশকারা তাকে তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। নিন্দুকেরা যখন তাকে নিয়ে কানাঘুষো করে, তখন এই আয়াত স্মরণ করে তার অন্তর প্রফুল্ল হয়ে ওঠে :

> "সম্মান তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের জন্যই, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।"[১২]

যখন কোনো দুঃখ-দুর্দশা-কষ্ট এসে কড়া নাড়ে তার দরজায়, তখন আল্লাহর বাণী তাকে সান্ত্বনা প্রদান করে :

> "নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।"[১৩]

রাত জেগে মাসের-পর-মাস পড়শোনা করার পরও ভালো জবটা যদি তার হাতছাড়া হয়ে যায়, কিংবা রক্ত পানি করে উপার্জিত টাকাগুলো যদি ছিনতাই হয়ে যায়, এমনকি দুর্ঘটনায় যদি তার অঙ্গহানিও হয়ে যায়, তবুও হাল ছড়ে না সে। এমনকি এটুকুও বলে না—'ইশ! আমি যদি আরেকটু সাবধানতা অবলম্বন করতাম, তবে তো এমনটা হতো না।' কারণ, তার রাসূল ﷺ তাকে শিখিয়েছেন :

> "...আর যদি তোমাদের ওপর কোনো (বিপর্যয়) আসে, তা হলে এমন কথা বলবে না যে, 'ইশ, যদি আমি এমনটি না করতাম, তা হলে আমার আজ এমন পরিণাম ভুগতে হতো না।' বরং বলবে, 'আল্লাহ (তাকদীরে) যা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, তা-ই হয়েছে।' 'যদি' কথাটা শয়তানের দরজা খুলে দেয়।"[১৪]

---

১১. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : সৃষ্টির সূচনা, হাদীস : ৩২০৯।
১২. সূরা মুনাফিকুন, (৬৩) : ৮ আয়াত।
১৩. সূরা আশ-শারহ, (৯৪) : ৫ আয়াত।
১৪. মুসলিম, আস সহীহ, হাদীস : ৬৪৪১।

কখনও যদি সে অর্থসঙ্কটে পড়ে যায়, কিংবা একের-পর-এক যাতনা, বিপদ, অসুস্থতা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা কিংবা ক্ষতির মধ্য দিয়ে পরিচালিত হতে থাকে, তবুও সাহস হারায় না। মনোবল ভেঙে পড়ে না তার। কারণ, তার পিঠে হাত বুলিয়ে নবি ﷺ বলতে থাকেন :

> "সবচেয়ে বেশি পরীক্ষিত হন নবিরা, অতঃপর তাঁদের নিকটবর্তীরা, এরপর এদের নিকটবর্তীরা। মানুষকে তার ঈমান অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। যদি তার ঈমান শক্তিশালী হয়, তা হলে তার পরীক্ষাও কঠিন হয়। আর যদি তার ঈমান দুর্বল হয়, তা হলে তার পরীক্ষাও সে অনুপাতে হালকা হয়। বিপদ বান্দার পিছু ছাড়ে না, পরিশেষে তার অবস্থা এমন হয় যে, সে পাপমুক্ত হয়ে যমীনে চলাফেরা করে।"[১৫]

সে আরও হিম্মত পায় যখন শুনে রাসূল ﷺ তাকে লক্ষ করে বলছেন :

> "মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে-সকল যাতনা, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এসবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন।"[১৬]

ওর পাশেই যখন কেউ পর্ন-মিউজিক-নারী-অ্যালকোহলের মাধ্যমে মাস্তি করতে থাকে, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এগুলো থেকে। শক্ত করে যমীন কামড়ে ধরে অশ্লীলতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। কখনও ঝরে যায় না। হারিয়ে যায় না অমবস্যার নিকষকালো আঁধারে। কারণ সে জানে—জান্নাতের অনাবিল সুখ-শান্তির কাছে এসব তো কিছুই না।

> "তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্যে যেসব চোখজুড়ানো বস্তু লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তা কেউই জানে না।"[১৭]

যুবক বয়সেই দ্বীনের ওপর চলার কারণে যখন কেউ ঠাট্টা-মশকারা করে তাকে নিয়ে, তাকে ব্রেইন ওয়াশড বলে গালি দেয়, তখন সে কুরআনের এই আয়াত স্মরণ করে :

> "অপরাধীরা মুমিনদের উপহাস করত। এবং তারা যখন মুমিনদের পাশ দিয়ে

---

১৫. তিরমিযি, আস সুনান, হাদীস : ২৪০১, আলবানি, আস-সহীহাহ, হাদীস : ১৪৪।
১৬. বুখারি, আস সহীহ, হাদীস : ২১৩৭।
১৭. সূরা সাজদা, (৩২) : ১৭ আয়াত।

গমন করত, তখন পরস্পর চোখ টিপে ইশারা করত। যখন তারা পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখন (মুমিনদের ঠাট্টা করে আসার জন্যে) তারা ফিরত উৎফুল্ল হয়ে। আর যখন মুমিনদেরকে দেখত, তখন বলত—এরা তো অবশ্যই বিভ্রান্ত।"[১৮]

সে এই আয়াত বারবার স্মরণ করে, আর বিস্মিত হয়। আল্লাহ সাড়ে চৌদ্দ শ বছর আগেই ওসব লোকদের কথা তাকে জানিয়ে দিয়েছেন, যারা আজ তাকে ব্রেইন ওয়াশড বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে। সে মোটেও মন খারাপ করে না ওদের কথা শুনে। সে জানে—একদিন তারও সুযোগ আসবে। সে সিংহাসনে বসে ওদের উপহাস ওদেরকেই ফিরিয়ে দেবে।

"আজ মুমিনগণ অবিশ্বাসীদের উপহাস করছে। সিংহাসনে বসে তাদের (অবিশ্বাসীদের) অবস্থা দেখছে। (আর বলছে,) অবিশ্বাসীরা তাদের কৃতকর্মের ফল পেলো তো?"[১৯]

মুমিন যদি সুখের মধ্যে থাকে, সেটাও তার জন্যে কল্যাণকর। আবার যদি কষ্টের ভেতরে থাকে, সেটাও তার জন্যে কল্যাণকর। মুমিনের কোনো লস প্রজেক্ট নেই। সবটাই তার লাভ।

"মুমিনের বিষয়টি বড়োই বিস্ময়কর! তার সবকিছুই কল্যাণকর; মুমিন ছাড়া অন্য কারও ক্ষেত্রে সেটি প্রজোয্য নয়। তার জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি এলে সে কৃতজ্ঞতা আদায় করে। ফলে তা হয় তার জন্য কল্যাণকর। আর দুঃখ-দুর্দশার মুখোমুখি হলে সে ধৈর্যধারণ করে। ফলে তাও হয় তার জন্য কল্যাণকর।"[২০]

এভাবেই একজন সত্যিকারের মুমিন সব সময় আত্মিক তৃপ্তির মধ্যে থাকে। সর্বদা প্রশান্ত থাকে তার হৃদয়। জান্নাতীসুখ অনুভব করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে।

"যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার পুরুষ হোক কিংবা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।"[২১]

আর যে পাপাচারী, অবিশ্বাসী, কুপ্রবৃত্তির দাস—সে সর্বদাই বঞ্চিত হয় প্রশান্তি

১৮. সূরা মুতাফফিফীন, (৮৩) : ২৯-৩২ আয়াত।
১৯. সূরা মুতাফফিফীন, (৮৩) : ৩৪-৩৬ আয়াত।
২০. মুসলিম, আস সহীহ, হাদীস : ২৯৯৯।
২১. সূরা নাহল, (১৬) : ৯৭ আয়াত।

থেকে। কারণ, না পাওয়ার বেদনা তার অন্তরে সারাক্ষণ হাহাকার সৃষ্টি করে রাখে। আত্মিক তৃপ্তি সে কোনোদিনও পায় না। এই কথাগুলো আমি সেদিন বোঝানোর চেষ্টা করেছি রাকিবকে। আজ তোমাকে বলছি—যদি সত্যিই হতাশার তীব্র উত্তাপের মধ্যে একপশলা বৃষ্টির ছোঁয়া পেতে চাও, তবে বদলে ফেলো নিজেকে।

হৃদয়দহনজ্বালা লয়ে কেন আছ দাঁড়ায়ে,
পিছুটান দূরে ঠেলে হাত দাও বাড়ায়ে।
হতাশার যত গ্লানি আছে সব মুছে ফেলে,
ফিরে এসো প্রেমময়ের দয়ার ছায়াতলে।
অন্তর তব বিমল করো করুণাময়ের স্মরণে,
দূর করো দহনজ্বালা রহমতের সঘনবরিষণে।
কষ্ট সব উড়ে যাক দখিনাসমীরণে,
ফাগুনহাওয়া বয়ে যাক তোমার পরানে।

কফিটা আস্তে আস্তে খাও। সামনের অধ্যায়গুলোতে আরও কিছু কথা হবে তোমার সাথে, সে পর্যন্ত যেন চলে। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-এর কিছু কথা মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে, ওটা শুনিয়েই ইতি টানছি এই অধ্যায়ের :

> "সুতরাং মহান প্রতিপালকের ইবাদাত, ভালোবাসা এবং তার প্রতি অভিমুখী হওয়া ছাড়া কোনো বান্দার অন্তর সংশোধিত হবে না, সফলতা লাভ করবে না, কোনোপ্রকার স্বাদ গ্রহণ করবে না, আনন্দিত হতে পারবে না, তৃপ্তি পাবে না, স্বস্তি লাভ করবে না এবং কিছুতেই প্রশান্ত হতে পারবে না। যেসব বিষয়ের দ্বারা সৃষ্টিজীব স্বাদ লাভ করে, এমন সবকিছুও যদি সে অর্জন করে ফেলে, তবুও তার অন্তর প্রশান্ত হবে না, স্বস্তি লাভ করবে না। কারণ তার অন্তর সত্তাগতভাবেই নিজ প্রতিপালকের মুখাপেক্ষী। তিনিই তার পালনকর্তা, প্রেমাস্পদ এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। তাই স্রষ্টাকে পেলেই কেবল প্রফুল্লতা, আনন্দ, স্বাদ, নিয়ামাত, স্বস্তি এবং প্রশান্তি অর্জিত হতে পারে।"[২২]

২২. ইবনু তাইমিয়্যা, দাসত্বের মহিমা, পৃষ্ঠা : ১০২।

জীবনটা কি এসবের জন্যেই?

দুনিয়ার মোহে পড়ো যদি ভাই পরকালকে ভুলি,
রহমতের কোমল পরশ দয়াময় নেবেন তিনি তুলি।
অনেক কিছু পাইনি আমি—এ সুর বাজবে প্রতিটা ক্ষণ,
বেদনার হাওয়া করিবে ধাওয়া প্রাণপিঞ্জরে আমরণ।
করুণাময় যদি বিস্মৃত হন তোমার সকল কাজে,
বোশেখী ঝড় উঠবে জেগে জীবনবীণার মাঝে।
(তাই) হাত বাড়ায়ে কান্না জড়ায়ে তাঁকে ডাকো রজনিশেষে,
জীবন তব উজলিত হোক বিধাতার আলোকপরশে।

ছোটোবেলায় তুমি কোন কোন জিনিসের জন্যে বায়না ধরতে, মনে আছে? তুমি বায়না ধরতে মেলা থেকে একটি ছোট্ট পুতুল কেনার জন্যে। সেই লাল টুকটুকে মিষ্টি পুতুল, যেটি কোলে নিয়ে তুমি ঘুমোবে; কিংবা রিমোট কন্ট্রোল একটি খেলনা গাড়ির জন্যে, যেটি তোমার হাতের পরশে দিগ্‌বিদিক ছুটোছুটি করবে; নয়তো রাস্তার মোড়ের কিছু রঙিন বেলুনের জন্যে, যেগুলো তোমায় নিয়ে উড়ে যাবে আকাশ পানে। এখন তো অনেক বড়ো হয়েছ। ভালো-মন্দ বুঝতে শিখেছ। ছোটোকালে খেলনা গাড়ি দিয়ে ভুলানো গেলেও, এখন আইপ্যাড কিংবা গ্যালাক্সিতেও কাজ হয় না। কোর আই-সেভেনের ল্যাপটপও হাতে এসেছে কদিন আগে। Gucci, Lacoste, Polo কিংবা Artistry-এর পোশাক তো ডাল-ভাতের মতো হয়ে গেছে। বন্ধুদের নিয়ে কেএফসি-তে আড্ডাটা ভালোই জমে তোমার। বিকেলের পড়ন্ত হাওয়ায় সিগারেটের ধোঁয়া যখন আকাশের দিকে ছাড়ো—তখন নিজেকে বড্ড ম্যাচিউর মনে হয়, তাই না?

আজকাল সবাই তোমাকে কুল বলে, হ্যান্ডসাম বলে। তোমার নাম ভাঙিয়ে বিল না দিয়েও খাবার খায় অনেকেই। লোকজন তোমাকে বেশ সমীহ করে চলে। রাস্তা ছেড়ে দেয় দেখলে। ছোটোরা 'ভাই ভাই' বলে সালাম হাঁকে দূর থেকে। এফবিতে তোমার ফলোয়ার তো কয়েক হাজার। 'গর্জিয়াস' একটা গার্লফ্রেন্ডও আছে তোমার। তাকে নিয়ে সেলফি আপলোড করার সাথে সাথে লাইকের বন্যা বয়ে যায়। কমেন্ট বক্সটা ভরে যায় ওয়াও, অসাম, নাইস, ওএমজি-দিয়ে।

আচ্ছা, এর বাইরে তুমি কী চাও?

বলো তো, তুমি আর কী কী চাও?

একটা লেইটেস্ট মডেলের গাড়ি আর বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, না-কি অ্যাপল-এর মতো

একটি কোম্পানি?

সত্যি করে বলো তো, এগুলোই কি তোমার শেষ চাওয়া?

এগুলো পেলেই কি তুমি তৃপ্ত হবে?

এর বাইরে কি আর কিছু পেতে চাইবে না?

> "আদম-সন্তানের যদি এক উপত্যকা ভর্তি স্বর্ণ থাকে, তবে অবশ্যই আরেকটি (উপত্যকা ভরা) স্বর্ণ চাইবে। মাটি ছাড়া আর কিছুই তার মুখ ভর্তি করতে পারবে না।"[২৩]

কথাটা কি একটু শক্ত মনে হলো?

হ্যাঁ, হতে পারে। কিন্তু ভেবে দেখো, তিনি ﷺ যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। আজ যদি তোমাকে বিল গেটস্ কিংবা ওয়ারেন বাফেটও বানিয়ে দেওয়া হয়, তবুও সন্তুষ্ট হবে না তুমি। তোমাকে যদি অ্যাপল কিংবা টাটার এমডি বানিয়ে দেওয়া হয়, তবুও তোমার হৃদয় তৃপ্ত হবে না। আরও পেতে চাইবে। কেন জানো?

কারণ তুমি কী কী পাওনি—সারাদিন এর হিসেব নিয়েই ব্যস্ত থাকো। কে কে তোমার চেয়ে এগিয়ে আছে, দিনভর এ নিয়েই জল্পনাকল্পনা করো। তোমার ক্লোজ ফ্রেন্ড কোন কোন দিকে তোমায় ছাড়িয়ে গেছে, সে চিন্তা বিভোর করে ফেলে তোমাকে। কখনও কি যমুনা পাড়ের আশি বছরের বৃদ্ধার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলে? ওই বৃদ্ধার দিকে, যে দু-মুঠো ভাতের জন্যে লাঠি হাতে ভিক্ষে করে মানুষের দুয়োরে দুয়োরে? কিংবা কারওয়ান বাজারের ওই ছেলেটার দিকে, যে স্লেট পেন্সিলের বদলে চটের বস্তা হাতে পলিথিন কুড়োয় দু-বেলা খাওয়ার জন্যে? অথবা দিনাজপুরের সেই দিনমজুরের দিকে, যে থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত সন্তানের চিকিৎসার খরচ জোগাতে না পেরে ডুকরে ডুকরে কাঁদে?

হয়তো দাওনি। দিলে বুঝতে পারতে কতটা সুখের সাগরে তুমি হাবুডুবু খাচ্ছ।

আজ তো প্রত্যেকেই যা আছে, তার চেয়ে এক ধাপ বেশি পাওয়াকে ন্যায্য পাওনা মনে করে। যে ফকিরটা দু-বেলা খেতে পায়, সে কেন তিন বেলা খেতে পায় না—এ নিয়ে ভাগ্যকে দোষারোপ করে। যে গ্যালাক্সি চালায়, সে কেন আইপ্যাড কিনতে পারে না—এটা নিয়ে যেন আফসোসের সীমা নেই তার। যে পালসার চালায়, সে কেন

---

২৩. তিরমিযি, আস-সুনান, অধ্যায় : সংসারের প্রতি অনাসক্তি, হাদীস : ২৩৪০।

প্রাডো কিনতে পারে না—এ নিয়ে নিয়ত তার মাথাব্যথা বেড়েই চলছে।

এটা কি শয়তানের ফাঁদ নয়?

এই ফাঁদ কি বান্দাকে আল্লাহর নিয়ামাত সম্পর্কে গাফিল করে দেয় না?

> "তোমরা ওই ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করো, যে তোমাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত নিঃস্ব অবস্থায় আছে। ওই ব্যক্তির দিকে কখনও দৃষ্টিপাত কোরো না, যে তোমাদের চেয়ে উন্নত অবস্থায় আছে। তোমাদের উচিত, তোমরা যেন আল্লাহর নিয়ামাতকে তুচ্ছ মনে না করো।"[২৪]

তোমার ওপর দরিদ্রতা নেমে আসবে, এই ভয়ে ভীত থাকো তুমি। অথচ আল্লাহ ﷻ উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্যে পৃথিবীকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। প্রশস্ত করে দিয়েছেন রিযিককে। না চাইলেও তোমার জন্যে নির্ধারিত অংশ তুমি পাবে। তাই তো উম্মাহর রিযিকের ব্যাপারটা নিয়ে রাসূল ﷺ ভীত হননি। তিনি কোন জিনিসটার ভয় করেছিলেন জানো?

> "আল্লাহর কসম! তোমাদের ওপর দরিদ্রতা আসবে আমি এ ভয় করি না। আমি তোমাদের জন্যে এ ভয় করি যে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর দুনিয়া প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল, সেভাবে তোমাদের জন্যেও দুনিয়া প্রশস্ত হয়ে যাবে। এরপর তোমরা তেমনই প্রতিযোগিতা করবে, যেমন করে তারা প্রতিযোগিতা করেছিল। আর (এ প্রতিযোগিতা) তোমাদেরকে সেভাবে ধ্বংস করে দেবে, যেভাবে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিল।"[২৫]

তুমি যদি দুনিয়ার চাকচিক্যই কামনা করো, তবে আল্লাহ ﷻ তোমায় প্রাচুর্য দেবেন। তুমি সপ্তাহ ধরে সেন্ট মার্টিন কাঁপিয়ে বেড়াবে। লং ড্রাইভে হারিয়ে যাবে সুন্দরী গার্লফ্রেন্ডকে সাথে নিয়ে। টাকার পাহাড় জমবে তোমার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে... অসম্ভব না, এগুলো হতেই পারে। কাফিরও যদি পরিশ্রম করে, তো সে তার বদলা পায়।

কিন্তু জীবনটা কি এসবের জন্যেই?

সব সময় আনন্দের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার জন্যেই কি দুনিয়াতে আসা?

---

২৪. মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, হাদীস : ৭১৬১।
২৫. মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, হাদীস : ৭১৫৬।

বন্ধু-আড্ডা-গান নিয়ে মেতে থাকাটাই কি জীবনের সার্থকতা?

নামিদামি ব্র্যান্ডের পোশাক ব্যবহার করে দম্ভভরে চলাটাই কি সফলতা?

> "অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে একটি শ্রেণির বিকাশ ঘটবে, যারা প্রাচুর্যের মধ্যে জন্ম নিবে এবং তাতেই পরিপুষ্টি লাভ করবে। তাদের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য হবে রকমারি খাবার ও রঙ-বেরঙের পোশাক লাভ করা। ওরা কথা বলবে দম্ভভরে। ওরা হলো আমার উম্মাতের নিকৃষ্ট অংশ।"[২৬]

একটু অনেস্টলি বলো তো, একটিবারের জন্যেও কি জীবনের উদ্দেশ্য তালাশ করেছ?

কেন এ ধরায় এসেছ, কেন সৃষ্টি হয়েছ মানুষ হিসেবে, কী উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে তোমায় শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ঘোষণা করা হয়েছে—এগুলোর উত্তর কখনও খুঁজেছ?

> "আমার ইবাদাত করার উদ্দেশ্যেই আমি জিন ও মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করেছি।"[২৭]

ভাই আমার! জীবনকে স্পাইসি করে তোলার সব আয়োজনই বৃথা, যদি আমরা না জানি আমাদের উদ্দেশ্য কী। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যদি কেউ আইডেন্টিফাই না করতে পারে, তা হলে দুনিয়াটায় আসাটা তার জন্যে মূল্যহীন। আর যদি মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়ে কেউ এমনটা করে, তবে তার জীবনটা তো ষোলো আনাই মূল্যহীন। ওর জীবন আর পদ্মার পাড়ের মোটাতাজা গরুটার জীবনের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। ওই গরুটা Voracious Animal, আর সে Voracious Human—পার্থক্য সর্বোচ্চ এতটুকুই।

এসব নীতিকথা বলে লাভ নেই—তাই তো বলবে তুমি?

আমি জানি, এগুলো এখন আর তোমায় টানে না। ধর্মের বিধিবিধান তো অনেক আগ থেকেই সেকেলে মনে করো তুমি। ঈদের সালাত ছাড়া বাদবাকি সালাতের কোনো খোঁজই রাখো না। এমনকি এও জানো না—তাওহীদ কাকে বলে, সুন্নাহ কাকে বলে, তোমার ওপর স্রষ্টার কাছ থেকে অর্পণ করা কী কী দায়িত্ব আছে? জানতে ইচ্ছেও করে না হয়তো...

---

২৬. আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাব আয-যুহদ (অনুবাদ : রাসূলের চোখে দুনিয়া), পৃষ্ঠা : ১০৪-১০৬।
২৭. সূরা আয-যারিয়াত, (৫১) : ৫৬ আয়াত।

দুনিয়ার চাকচিক্য আর ক্যারিয়ারের মোহ অন্ধ করে দিয়েছে তোমাকে। তাই তো তুচ্ছ মনে করছ আল্লাহর বিধিবিধানকে। ব্যাকডেইটেট মনে হচ্ছে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে। দ্বীন হয়ে গেছে খেল-তামাশার বস্তু। কুরআনের বদলে গানেই বেশি তৃপ্তি পাচ্ছ তুমি। সত্যিই, দুনিয়া তোমাকে ভালোই প্রতারিত করেছে!

কথাটা কেমন জানি একটু নকড়াছকড়া টাইপ হয়ে গেল, তাই না?

হ্যাঁ, হতে পারে। কিন্তু চিন্তা করলে যে তুমিও আমার সাথে একমত হবে।

> "তারা তাদের দ্বীনকে খেলা-তামাশার বস্তু বানিয়েছিল, আর দুনিয়ার জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিল।"[২৮]

আচ্ছা, একটা জিজ্ঞাসা—যে দুনিয়ার সাথে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধার জন্যে তোমার রবকে ভুলে যাচ্ছ; তুমি কি জানো, এ দুনিয়ার গুরুত্ব কতটুকু?

> "দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই না। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্যে পরকালের জীবনই অধিক কল্যাণময়। তবুও কি তোমাদের বোধোদয় হবে না?"[২৯]

যিনি দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন, তিনি নিজেই বলেছেন—দুনিয়া মূল্যহীন। নিছক খেলনার মতো। এটাই বাস্তবতা। কিন্তু বাস্তবতা তো তুমি বুঝতে চাও না। বুঝবে কী করে বলো, আল্লাহর কোনো কথার গুরুত্বই দাও না তুমি। গুরুত্ব দাও বা না-দাও, সে তোমার ব্যাপার। কিন্তু মহামহিম আল্লাহর কাছে এ দুনিয়ার কোনো মূল্য নেই, এটিই বাস্তব। দুনিয়া নিতান্তই তুচ্ছ এক সৃষ্টি।

> "এই দুনিয়া যদি আল্লাহর কাছে একটি মশার ডানার সমানও মূল্য রাখত, তবে তিনি এ (দুনিয়া) থেকে কোনো অবিশ্বাসীকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।"[৩০]

কথাগুলো শুনে কি বিরক্তি বোধ করছ?

আসলে আমি তো কথাসাহিত্যিক নই, তাই হয়তো সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতে পারছি

---

২৮. সূরা আল-আরাফ, (০৭) : ৫১ আয়াত।

২৯. সূরা আল-আনআম, (০৬) : ৩২ আয়াত।

৩০. তিরমিযি, আস-সুনান, অধ্যায় : সংসারের প্রতি অনাসক্তি, হাদীস : ২৩২৩; আলবানি, আস-সহীহাহ, হাদীস : ৯৪০।

না। তবুও একটু ধৈর্য ধরে শুনেই দেখো না। আজেবাজে মুভি দেখেও তো অনেক সময় পার করো। আজ না হয় কিছুটা সময় আমার সাথে কাটালে।

একবার কী হয়েছিল জানো?

তোমার রাসূল ﷺ একবার মদীনার এক বাজার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাঁর সাথে সাহাবিরাও ছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা একটি বাজারের কাছে পৌঁছুলেন। বাজারের ধারেই পড়েছিল একটি মৃত বকরির বাচ্চা, যেটার কান ছিল বেশ ছোটো। তো রাসূল ﷺ সে বাচ্চাটির কান ধরে বললেন, 'তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের বিনিময়েও এটা নিতে আগ্রহী হবে?'

সাহাবিরা বললেন, 'আল্লাহর শপথ! কোনো কিছুর বিনিময়েও তো আমরা এটা নিতে আগ্রহী নই। এই মৃত বাচ্চা দিয়ে আমরা কী করব।'

রাসূল ﷺ বললেন, '(বিনে পয়সায়) তোমরা কি এটা নিতে আগ্রহী?'

সাহাবিরা বললেন, 'এর কান তো খুবই ছোটো। এটা যদি জীবিত থাকত, তবুও আমরা নিতাম না, আর এখন তো এটা মৃত। কীভাবে আমরা তা নিতে পারি?'

তাঁদের উত্তর শুনে রাসূল ﷺ বললেন, 'আল্লাহর শপথ! এটা তোমাদের কাছে যতটা তুচ্ছ, আল্লাহর কাছে এ দুনিয়া তার চেয়েও তুচ্ছ।'[৩১]

দ্যাটস্ দ্যা রিয়েলিটি। এটাই হচ্ছে দুনিয়া, যার পেছনে দিনরাত হন্যে হয়ে ছুটছ তুমি। যার জন্যে কয়লা করে ফেলছ জীবনকে। যার পেছনে ব্যয় করছ যৌবনের দামি সময়গুলোকে। ইবনু কায়্যিম ؒ দুনিয়া নিয়ে খুব সুন্দর কিছু কথা বলেছেন :

> "দুনিয়া হলো পতিতা নারীর মতো, যে একজন স্বামীর সাথে স্থির থাকে না বরং একাধিক স্বামী তালাশ করে—তাদের সাথে আরও বেশি ভালো থাকার আশায়। ফলে সে বহুগামিনী হওয়া ব্যতীত সন্তুষ্ট থাকে না। দুনিয়ার পেছনে ঘোরা হলো হিংস্র জানোয়ারের চারণভূমিতে বিচরণ করার মতো। এতে সাঁতার কাটা মানে কুমিরের পুকুরে সাঁতার কাটার মতো। দুনিয়ার দ্বারা আনন্দিত হওয়া মানে হলো নিশ্চিত দুশ্চিন্তায় পতিত হওয়া। দুনিয়ার ব্যথা-বেদনাগুলো এর স্বাদ থেকেই সৃষ্টি হয়। এর দুঃখ-কষ্টগুলো এর আনন্দ থেকেই জন্ম নেয়।"[৩২]

---

৩১. মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, হাদীস : ৭১৫০।
৩২. ইবনু কায়্যিম, মুখতাসার আল-ফাওয়ায়িদ, পৃষ্ঠা : ৩২।

আজ যে লোকটি টাখনুর ওপরে কাপড় রেখে বাইরে বেরোয়, তাকে দেখলে তোমার খুব হাসি পায়। মনে মনে ভাবো—'বর্ষার কোনো নাম-গন্ধ নেই, অথচ লোকটি পাজামা কোথায় তুলেছে। ছি! দেখতে কেমন অড লাগে।' তোমার যে ফ্রেন্ড বড়ো দাড়ি রেখেছে, কেমন জানি বিরক্তি ভাব জন্ম নেয় তাকে দেখলে। মাঝে মধ্যে তো মুখ ফুটে বলেই ফেলো—'এসব কী জঙ্গল রেখেছিস? যাক না আর কটা দিন। বুড়ো হ, তারপর না হয় এসব করিস।' আর হুজুরদের তো তুমি আনকালচার্ড, গেঁয়ো বলে দিনরাত গালি দাও। মনে মনে এদের সবাইকেই Loser মনে করো।

তুমি দুনিয়ার চাকচিক্য চেয়েছ, আল্লাহ ﷻ তোমাকে সেইটেই দিয়েছেন। যেমনটা ফিরআউন রাজত্ব চেয়েছিল আল্লাহ ﷻ গোটা দুনিয়ার রাজত্ব দান করেছিলেন তাকে। আজ তুমি যাদের নিয়ে ট্রল করো, ওরা দুনিয়ায় রাজত্ব চায়নি। যাদের লুযার বলো, তারা অন্ধ হয়ে যায়নি ক্যারিয়ারের মোহে। তাই হয়তো ওদের গায়ে Gucci, Lacoste, Polo, Artistry কিংবা Adidas-এর ড্রেস নেই। DKNY Golden, Baccart, Shalini, Annick Goutal, কিংবা Caron Poivre পারফিউমও ব্যবহার করার সামর্থ্য তাদের হয় না। হয়তো হারাম থেকে বাঁচতে গিয়ে কিছুটা আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে ওরা। কিন্তু তবুও তারা লুযার নয়। সত্যিকার অর্থে লুযার কারা জানো?

> "বলো, আমি কি তোমাদের ওই সব লোকের সংবাদ দেবো, যারা কর্মের দিক থেকে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত? তারা হলো সেসব লোক—দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে, আর তারা মনে করছে যে তারা ঠিক কাজটিই করেছে।"[৩৩]

কবরের জীবনে ওরা সালাত-সাওম-জিহাদ-যিকির-তিলাওয়াত-সহ অনেক কিছু নিয়ে যাবে। কিন্তু তুমি?

তুমি কী নেবে বলো?

সখের গিটার, রেভেন-এর ব্ল্যাক সানগ্লাস, পার্পল কালারের প্রিয় শার্ট, সদ্য কেনা লটোর লোফার, অ্যাপলের পিসি, রোলেক্স-এর নতুন রিলিজ হওয়া ঘড়ি, কিউট গার্লফ্রেন্ড—এগুলো? এগুলো কি সাথে নিতে পারবে? একদিন চোখ খুলে দেখবে ওরাই তোমার চেয়ে বড়ো প্রতিদান পেয়েছে। আর এত বিলাসিতার মধ্যে থেকেও তুমি শূন্য হাতে দৌড়চ্ছ মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। পাশে কেউ নেই। আগুন

---

৩৩. সূরা আল-কাহফ, (১৮) : ১০৩-১০৪ আয়াত।

ছাড়া কোনো সঙ্গী নেই তোমার।

সত্যিকার লুযার তো তুমি।

> "যারা এ দুনিয়ার জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, আমি তাদের কৃতকর্মের ফল দুনিয়াতেই দিয়ে দিই। আর তাদের জন্যে কিছুই কম করা হয় না। তারা এমন লোক যে, আখিরাতে আগুন ছাড়া তাদের জন্যে কিছুই নেই। আর তাদের যাবতীয় কাজকর্ম বিফল হবে।"[৩৪]

ধরো, প্রাইভেট ভার্সিটিতে লাখ লাখ টাকা খরচ করে তুমি অনার্স কমপ্লিট করলে। কিন্তু অনার্স শেষে দেখলে তোমার সাবজেক্টের আদৌ কোনো চাহিদা নেই; কিংবা সারা বছর ধরে যে-শেয়ারের পেছনে কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট করলে, বছর শেষে দেখলে তার বাজারমূল্যে ধ্বস নেমেছে; অথবা রাতের-পর-রাত জেগে ফাইনাল পরীক্ষার জন্যে মজবুত প্রস্তুতি নেওয়ার পর হলে গিয়ে দেখলে যে তুমি ভুল পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছিলে—তখন তোমার কেমন লাগবে?

আমি যদি বলি—তুমি যে পথে হাঁটছ, সে পথটাও ঠিক তেমন; জাহান্নাম ছাড়া যার কোনো প্রতিদান নেই, তখন কেমন লাগবে? তুমি যা-কিছুকে কল্যাণকর মনে করছ, সেগুলো আদৌ কল্যাণকর নয়। হয়তো আজ ভালো প্রফেশনকে সফলতা মনে হচ্ছে। স্মার্টনেস মনে হচ্ছে গিটার হাতে ললনাদের দেখিয়ে র‍্যাপ সং গাওয়াকে। গার্লফ্রেন্ডকে সাথে নিয়ে স্পিডে বাইক চালানোকেই সাক্সেস মনে হচ্ছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এগুলো কোনো সফলতাই নয়। সফলতা কাকে বলে জানো?

> "মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্যে আল্লাহ এমন জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, যার তলদেশে ঝর্ণা প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর (ওয়াদা দিয়েছেন) উত্তম বাসস্থানের, ওই স্থায়ী জান্নাতে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হলো (তাদের জন্যে) সবচেয়ে বড়ো নিয়ামাত। এটাই হলো মহা-সাফল্য (Greatest Success)।"[৩৫]

হ্যাঁ, এটাই Greatest Success. সত্যিকারের সফলতা। সত্যিকার সাক্সেস হলো জান্নাত। সেদিন যাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই সফল। তাই সতর্ক হও। আল্লাহর অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াবি উন্নতি দান করা হচ্ছে বলে ধরাকে সরা জ্ঞান

---

৩৪. সূরা হুদ, (১১) : ১৫ আয়াত।

৩৫. সূরা আত-তাওবা, (০৯) : ৭২ আয়াত।

কোরো না। ভুলে যেয়ো না, এগুলো তোমার জন্যে টোপমাত্র।

> "যখন তুমি দেখবে পাপাচার সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা কোনো ব্যক্তিকে পার্থিব জীবনে তার প্রিয় বস্তুগুলোকে দিচ্ছেন, তখন বুঝবে তা হলো তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্যে একটি টোপমাত্র।"[৩৬]

তোমার সব ইচ্ছে পূর্ণ হচ্ছে বলে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ো না। অনেক বিত্তশালী এখন রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়ায়। ভার্সিটির বহু প্রফেসর বৃদ্ধাশ্রমে একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় পার করে জীবনের শেষ দিনগুলো। এক সময়কার দাপুটে নেতারা পথেঘাটে সাগর কলা বিক্রি করে দু-টাকা উপার্জনের আশায়। এগুলো তো দুনিয়াতে কিছু নমুনা মাত্র, আর আখিরাতে!

> "যারা কুফরি করে তারা যেন কিছুতেই ধারণা না করে যে, আমি তাদের যে অবকাশ দিয়েছি তা তাদের জন্যে কল্যাণকর। আমি তো শুধু এ জন্যেই তাদের অবকাশ দিই—যেন তাদের পাপের পরিমাণ বেড়ে যায়। আর তাদের জন্যে তো আছে অপমানকর শাস্তি।"[৩৭]

তুমি কি জানো না, এই চাকচিক্যের জীবনটা একদিন শেষ হয়ে যাবে? মাঝে মধ্যে তো ট্রল করে স্ট্যাটাস দাও—'একদিন চলেই যাব আমরা সবাই, থাকব না আমরা কেহ। শুধু মাটির বুকে পড়ে রবে দেহ।'

> "তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবে। যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো।"[৩৮]

হ্যাঁ, মৃত্যুটা এমনই বাস্তবতা; যে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে সবাইকেই। কী ছেলে কী বুড়ো, সবাই মোলাকাত করবে মৃত্যুর সাথে। এমনকি যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, সেও। কেন জানি এ বাস্তবতাকে সব সময় এভয়েড করো তুমি। মৃত্যুর কথা বললেই পাশ কাটিয়ে যাও। আমি জানি না, কেন এমনটা করো। তুমি কি কখনও এমন রাতের কথা চিন্তা করোনি, যার পরদিন সকালে তোমার মৃত্যু? নাকি এটাই মনে করো—তরুণরা অমর, আর বৃদ্ধরা মরণশীল?

---

৩৬. আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাব আয-যুহদ (অনুবাদ : রাসূলের চোখে দুনিয়া), পৃষ্ঠা : ৪৯-৫০।
৩৭. সূরা আ ল ইমরান, (০৩) : ১৭৮ আয়াত।
৩৮. সূরা আন-নিসা, (০৪) : ৭৮ আয়াত।

তুমি কি দেখোনি তোমার বয়েসী কত যুবক এই দুনিয়া থেকে চলে গেছে তোমার আগেই? তোমার সামনেই তো জেলা স্কুলের ক্লাস সেভেনের বাচ্চাটা লিউকোমিয়ায় মারা গেল। এই তো গত পরশু অনার্স প্রথম বর্ষের ছেলেটা বন্ধুদের সাথে ভ্রমণ করার সময় কাটা পড়ল ট্রেনের নিচে। আজ বিকেলেও তো ২৩ বছরের যুবকের জানাজা হলো আমাদের মাসজিদে। এগুলো দেখার পরেও কি তোমার হুঁশ হবে না?

আসলে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাই এগুলো মনেই আসে না তোমার!

> "প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে এসে উপস্থিত হও। (তোমরা যে ভুল ধারণায় ডুবে আছ) এটা মোটেই ঠিক নয়। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আবার বলি, এটা মোটেই ঠিক নয়; শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।"[৩৯]

একদিন সুন্দর দেহটা মাটির সাথে মিশে যাবে। শেষ হয়ে যাবে বন্ধু-আড্ডা-গানের মেকি জগৎটা। পড়ে রবে তোমার শখের পারফিউম-স্যুট-গিটার-গার্লফ্রেন্ড, সব। সবকিছু। শুধু তুমি চলে যাবে। একা। যে মেয়েটার জন্যে যৌবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করছ, সেও সাথে যাবে না। যে বন্ধুদের সাথে তাস খেলে রাতের-পর-রাত পার করেছ, তারাও সাথে যাবে না।

কখনও কি এই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করেছ?

> "তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তিকে অনুসরণ করে থাকে। দুটো ফিরে আসে, আর একটি তার সাথে থেকে যায়। তার পরিবারবর্গ, তার মাল, তার আমল তাকে অনুসরণ করে। তার পরিবারবর্গ ও তার মাল ফিরে আসে, পক্ষান্তরে তার আমল তার সাথে থেকে যায়।"[৪০]

আজ যে হাতে আইফোন আছে, কাল সে হাত খালি থাকবে। যে পায়ে লটোর লোফার আছে, কাল সে পাও খালি থাকবে। খালি থাকবে Artistry-এর পোশাক পরা সিক্স প্যাক শরীরটাও। রিক্ত হস্তেই তুমি সাক্ষাৎ করবে আল্লাহর সাথে।

> "নিশ্চয়ই তোমরা খালি পা, নগ্ন ও খাতনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহ তাআলার

---

৩৯. সূরা আত-তাকাসুর, (১০২) : ১-৩ আয়াত।
৪০. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : কোমল হওয়া, হাদীস : ৬০৭০।

সাথে সাক্ষাৎ করবে।"[৪১]

আমি জানি না, তুমি কেন এই বিষয়গুলো বুঝতে চাও না। আর কেনই-বা বুঝলেও মানতে চাও না। ভাই আমার! যা চাচ্ছ তা-ই পাচ্ছ বলে অহংকার কোরো না। ভুলে যেয়ো না—ফসলের সজীবতা কখনও চিরদিন থাকে না। একটা সময় তা খড়কুটো হয়ে উড়ে যায় বাতাসের সাথে। দুনিয়াটাও ঠিক তেমন, জাস্ট হোকাস পোকাস। ছু মন্তর ছু।

> "তোমরা জেনে রেখো, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পাস্পরিক অহংকার-প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে আধিক্য লাভের প্রতিযোগিতামাত্র। তার উদাহরণ হলো—বৃষ্টি, আর তা হতে উৎপন্ন শস্য—যা কৃষকের মনকে আনন্দে ভরে দেয়। তারপর তা পেকে যায়, তাই তুমি তাকে হলুদ বর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে তা খড়-কুটোয় পরিণত হয়ে যায়। (অবিশ্বাসীদের জন্যে) পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং (নেককারদের জন্যে আছে) আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবন তো ধোঁকার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৪২]

আর হ্যাঁ, আমাকে ভুল বুঝো না যেন। দুনিয়াটা তুচ্ছ, তাই সব ছেড়ে-ছুড়ে দরবেশ হয়ে জঙ্গলে চলে যেতে হবে, এমনটা আমি বলছি না। জঙ্গলে চলে যাওয়া রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ না। সামাজিক জীবন যাপন করাটাই রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ। তুমি যদি বড়ো ব্যবসায়ী হতে চাও, হতে পারবে। জাস্ট পন্থাটা হালাল হতে হবে। মানুষের টাকা মেরে বড়োলোক হওয়া যাবে না। যদি নেতা হতে চাও, তো আল্লাহর বিধান অনুসারে উম্মাহর নেতা হতে পারবে। সমস্যা নেই কোনো। কিন্তু কোনো পদবি গ্রহণ করা যাবে না কারও মাথায় রিভালবার ঠেকিয়ে। তুমি প্রেম করতে চাও, করো; কে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু নিজের স্ত্রী ছাড়া প্রেম-প্রেম খেলা খেলা যাবে না কোনো নারীর সাথে। আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না কোনো কাজেই।

> "সুতরাং যে সীমালঙ্ঘন করে আর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়, নিশ্চয় জাহান্নাম হবে তার আবাস্থল।"[৪৩]

তুমি আমার কথাগুলো এভয়েড করতে চাইলে করতে পারো। কিন্তু একদিন ঠিকই

---

৪১. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : কোমল হওয়া, হাদীস : ৬০৮১।

৪২. সূরা আল-হাদীদ, (৫৭) : ২০ আয়াত।

৪৩. সূরা নাযিআত, (৭৯) : ৩৪-৪১ আয়াত।

উপলব্ধি করবে। একেবারে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যাবে সুবোধ বালকের মতো। কিন্তু তোমার সে উপলব্ধি কোনো কাজে আসবে কি?

> "সেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে। আর সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে। কিন্তু তার সে উপলব্ধি কোন উপকারে আসবে? সে বলবে, হায়! আমার এ জীবনের জন্যে যদি অগ্রিম কিছু পাঠাতাম!"[৪৪]

সেদিন সত্যকে উপলব্ধি করে কোনো লাভ হবে না। কীভাবে হবে বলো? যৌবন আর শক্তি যা ছিল, তার সবটাই তো গার্লফ্রেন্ড আর ধন-সম্পদ উপার্জনের পেছনে ব্যয় করেছ। তোমাকে দুনিয়াতে একটা লম্বা হায়াৎ দেওয়া হয়েছিল, সেটা শেষ করে দিয়েছ মাস্তি করে। পরকালের জন্যে তো কিছুই করোনি।

কত ওয়াক্ত সালাত তুমি মাসজিদে গিয়ে আদায় করেছ?

রমাদানের কতটা সিয়াম পালন করেছ নিষ্ঠার সাথে?

কোন পথে সম্পদ আয় করেছ?

সম্পদ থেকে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছ আল্লাহর রাস্তায়?

এগুলোর হিসেব করেছিলে কখনও?

একাধিকবার জিজ্ঞেস করেছিলাম প্রশ্নগুলো, কোনো উত্তর পাইনি। থাক, আজও উত্তর দিতে হবে না। যত পারো নিজেকে ফাঁকি দাও। এ ফাঁকিই তোমার ধ্বংস ডেকে আনবে। কারও কিছু করার থাকবে না। ফাঁকি মারতে গিয়ে আজ যেভাবে আল্লাহকে ভুলে যাচ্ছ, কাল ঠিক সেভাবে তোমাকেও ভুলে যাওয়া হবে।

> "আল্লাহ বলবেন, এভাবেই তো আমার নিদর্শসমূহ যখন তোমার কাছে এসেছিল তখন তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজ সেভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হলো।"[৪৫]

---

৪৪. সূরা আল-ফাযর, (৮৯) : ২৩-২৪ আয়াত।

৪৫. সূরা ত্বহা, (২০) : ১২৬ আয়াত।

জীবন্ত কিংবদন্তির উপাখ্যান

"যারা ঈমান আনে, হিজরত করে, আর নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, আল্লাহর নিকট তাদের বিরাট মর্যাদা রয়েছে। আর তারাই সফলকাম। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ, সন্তুষ্টি আর জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্যে চিরস্থায়ী সুখের ব্যবস্থা রয়েছে।"

[সূরা তাওবা, (০৯) : ২০-২১ আয়াত]

আমি তোমাকে যে কিংবদন্তির কাহিনি[৪৬] শুনাতে চাচ্ছি, তার নাম মুসআব। বাবার নাম উমাইর। মা খুনাস বিনতু মালিক। মক্কার এক অভিজাত পরিবারে যার জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন মক্কার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। বাবা-মা'র অনেক আদুরে সন্তান ছিলেন মুসআব। ছোটোবেলা থেকে অঢেল বিত্তের মাঝে বেড়ে উঠেছেন। দুঃখ-ক্লেশ, দারিদ্র্য, না পাওয়ার বেদনা তাঁকে স্পর্শ করেনি কখনও। আদরের সন্তান হওয়ায় যখন যা চেয়েছেন, পেয়েছেন তার চেয়ে ঢের বেশি।

মুসআবের বাবা তাঁর জন্যে এমন পোশাকের অর্ডার দিতেন, যা মক্কায় পাওয়া যেত না। সিরিয়া কিংবা ইয়ামান থেকে রয়্যাল ব্র্যান্ডের পোশাক আসত তাঁর জন্যে। নামিদামি ব্র্যান্ডের আতর ব্যবহার করতেন তিনি। সে আতরের এমন হতো যে, তিনি কোনো পথ দিয়ে গেলে মানুষজন তা আন্দাজ করতে পারত। মানুষ বুঝত, এই আতর মুসআব ছাড়া অন্য কারও নয়। তাঁর চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তায় ছিল আভিজাত্যের ছাপ। আর এই জন্যেই মক্কার অন্যান্য যুবকদের থেকে তাঁকে সহজেই আলাদা করা যেত। যুবক হওয়া সত্ত্বেও বড়ো বড়ো নেতাদের সমাবেশে স্থান হতো তাঁর। কুরাইশদের এই সম্ভ্রান্ত ছেলেটি অংশ নিতেন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজে। মেধা, প্রজ্ঞা আর অভিজাত ব্যক্তিত্বের কারণে কুরাইশদের প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। অসাধারণ বাগ্মিতা ছিল তাঁর। ব্যক্তিত্ব ছিল চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতো। এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বই তাঁকে সত্যের পথের পথিক হতে উদ্বুদ্ধ করে।

একদিন তিনি শুনতে পেলেন—মুহাম্মাদ ﷺ নাকি নতুন দ্বীন প্রচার শুরু করেছেন। আর দিন দিন সে দ্বীনের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে মানুষ। প্রতিনিয়ত বেড়েই যাচ্ছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারীর সংখ্যা। কুরাইশদের শত অত্যাচারের মুখেও মাথা নত করছে না তাঁরা। যত অত্যাচার করা হচ্ছে, তাদের ঈমান তত মজবুত হচ্ছে। এসব শোনার

---

৪৬. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : যুদ্ধাভিযান, হাদীস : ৩৭৪৯, ৩৭৫১, ৩৭৭৯, ৩৭৮০, ৩৭৮২, অধ্যায় : কোমল হওয়া, হাদীস : ৬০০৪; মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, ১/২১৪-২১৯।

পর তিনি ভাবতে লাগলেন—কেন মানুষ মুহাম্মাদের দিকে এতটা ঝুঁকে পড়ছে? প্রশাসনের লোকেরা তাঁকে জাদুকর বলছে, পাগল বলছে। আবার কেউ-কেউ বলছে মুহাম্মাদকে জিনে ধরেছে। আসল ব্যাপারটা কী? তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সরাসরি মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে দেখা করবেন।

খোঁজ নিয়ে জানলেন, মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাথিরা মাঝে মধ্যে জড়ো হন আরকামের বাড়িতে। সাফা পাহাড়ের পাদদেশেই আরকামের বাড়ি। সব দ্বিধা ঝেড়ে একদিন সন্ধেবেলায় আরকামের বাড়িতে হাজির হলেন তিনি। পৌঁছে দেখলেন মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাথিরা সেখানে বসা। তিনিও বসে গেলেন তাদের পাঠচক্রে। মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর কথাগুলো। ইতোমধ্যে জিবরীল ﷺ এলেন। কুরআনের আয়াত নাজিল হলো। রাসূল ﷺ সাহাবিদের তা পাঠ করে শোনালেন। মুসআব হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করলেন আয়াতগুলো। অন্যরকম এক শিহরন অনুভব করলেন হৃদয়ে। আয়াতগুলো তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে লাগল। চোখেমুখে ফুটে উঠল পরিবর্তনের ঢেউ। মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দিকে তাকালেন। পবিত্র হাত রাখলেন মুসআবের বুকের ওপর। গভীর প্রশান্তি অনুভব করলেন মুসআব। ঈমান তাঁর অন্তরে দৃঢ়তর হলো। এদিনই মুসলিম হলেন তিনি।

মুসআব তাঁর মাকে খুব ভয় করতেন। তাই ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখলেন। চুপি চুপি যেতে লাগলেন রাসূল ﷺ-এর পাঠচক্রে। দারুল আরকামে যাওয়া-আসাও চলতে থাকল। একদিন দারুল আরকামে ঢোকার সময় উসমান ইবনু তালহা দেখে ফেলল তাঁকে। আরেকদিন সালাত আদায় করার সময়ও ধরা পড়লেন ইবনু তালহার হাতে। ফলে তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবরটি প্রকাশিত হয়ে গেল। বাতাসের বেগে সে খবর ছড়িয়ে পড়ল মক্কার অলিতে-গলিতে। পৌঁছে গেল তাঁর মা'র কাছেও। মক্কার মুশরিকরা যারপরনাই বিস্মিত হলো। তারা কোনোভাবেই বিষয়টা মেনে নিতে পারছিল না। মুসআবের মতো প্রিন্স কীভাবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর ঈমান আনতে পারে? তবে কি মুসআবের মতো প্রজ্ঞাবান যুবকের ওপরেও মুহাম্মাদ ﷺ জাদু করল?

মুসআবকে হাজির করা হলো মুশরিক নেতাদের সামনে। তাঁর মা-কেও ডেকে আনা হলো। শুরু হলো উপদেশ-পর্ব। সবাই মিলে তাঁকে বোঝাতে লাগল, এটা তুমি কী করলে? অভিজাত বংশের ছেলে হয়েও গরিবদের সাথে বসে গেলে? এত বিচার-বিবেচনাবোধ থাকা সত্ত্বেও কিনা মুহাম্মাদের কথায় প্রভাবিত হলে? মুহাম্মাদ এত সহজেই তোমার ব্রেইন ওয়াশ করে দিলো?

ওদের কথাগুলো মুসআবের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারল না। একটুও বিচলিত হলেন না তিনি। উপদেশ-পর্ব শেষ হলে তিনি তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন কুরআনের অমিয় বাণী। তিলাওয়াত শুনে মা রাগান্বিত হলেন। মারধরও করলেন। কিন্তু চুপ করে সব সয়ে নিলেন মুসআব। এই অবস্থা দেখে মুশরিকরা আরও ক্ষোভে জ্বলতে লাগল।

সেদিন বাড়ি ফেরার পর তাঁর মা তাঁকে ঘরে বন্দি করে রাখলেন। একেবারে তিন স্তরবিশিষ্ট নিরাপত্তার মধ্যে বন্দি করা হলো প্রিন্স মুসআবকে। বন্দি অবস্থায় চলতে থাকল নানান নির্যাতন। বারবার তাঁকে ইসলাম ত্যাগ করার কথা বলা হলো। কিন্তু এক চুলও নড়লেন না তিনি। সৃষ্টির ভয় তাঁকে স্রষ্টার ওপর আনীত ঈমান থেকে ফেরাতে পারল না। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀ বলেছেন,

> 'সৃষ্টিকে কেবল সে-ই ভয় করতে পারে, যার অন্তরে রোগ আছে।'[৪৭]

মুসআবের অন্তর ছিল পবিত্র, কলুষতামুক্ত। এমন অন্তর কীভাবে সৃষ্টির অত্যাচারে ভীত হতে পারে? তাই তো অত্যাচারের-পর-অত্যাচারও টলাতে পারল না তাঁকে। একদিন সবার চোখে ধুলো দিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন তিনি। হিজরত করলেন হাবশায়। কিন্তু মনটা যেন মক্কাতেই রয়ে গেল। যার জন্যে বাড়িঘর ছেড়েছেন, পরিবার ছেড়েছেন, আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়েছেন—তাঁকে মক্কায় রেখে কীভাবে শান্তিতে ঘুমোবেন!

তিনি হাবশা থেকে ফিরে এলেন মক্কায়। মক্কায় আসার পর মা তাঁকে আবার বন্দি করতে চাইলেন। নির্ভীক মুসআব এবার কসম খেয়ে বললেন, 'মা! আল্লাহর শপথ! যদি তুমি এমনটি করো আর কেউ যদি এ কাজে তোমাকে সাহায্য করে, তা হলে আমি তোমাকে-সহ সবাইকে হত্যা করব।' ছেলের কথা শুনে মা ভীত হলেন। মা জানতেন—তার সন্তান ভয়ানক জেদি। ছেলে যেহেতু কসম কেটেছে, তাই তাঁকে আর ফেরানো সম্ভব হবে না। কিন্তু তিনি অনেক ভালোবাসতেন মুসআবকে। তাই বারবার তাঁকে ঈমান ছেড়ে দিয়ে বাসায় থেকে যাওয়ার জন্যে অনুনয়-বিনয় করলেন। কিন্তু কিছুতেই রাজি হলেন না মুসআব। মানুষের ভালোবাসা কখনোই আল্লাহর ভালোবাসার ওপর প্রাধান্য পেতে পারে না। কারণ আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

> "... যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তানেরা, তোমাদের ভাইয়েরা, তোমাদের

---

৪৭. নদভি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলি, সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস, ২/৫৪।

স্ত্রীরা, তোমাদের স্বগোত্রের লোকেরা, আর ওই ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর ওই ব্যাবসা যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশঙ্কা করো, আর ওই বাসস্থান যেখানে অতি আনন্দে বসবাস করছ—আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর বিধান (শাস্তি) নিয়ে আসেন। আর আল্লাহ অবাধ্য আচরণকারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"[৪৮]

তাই তো মায়ের ভালোবাসার ওপরে আল্লাহর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিলেন মুসআব। রাজপ্রাসাদ আর প্রিন্সের জীবন ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বিদায় বেলায় মা-ছেলের অশ্রু গড়িয়ে পড়ল যমীনে। এক সময়কার প্রিন্স, এক কাপড়ে বের হয়ে এলেন বাড়ি থেকে। বিলাসী মুসআবের গায়ে রেশমের বদলে এবার উঠল চটের বস্তার মতো মোটা কাপড়।

একদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের সাথে বসা। মুসআবও তাঁদের সাথে বসা। কিন্তু আজ আর মুসআবের গায়ে চিরচেনা পরিপাটি পোশাক দেখা যাচ্ছে না। ময়লাযুক্ত পোশাক আর ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে আছেন তিনি। জামাটি ছিঁড়ে গেছে বহু জায়গায়। ছেঁড়া জায়গাগুলোতে চামড়ার তালি লাগানো হয়েছে। এ অবস্থা দেখে মুসআবের ইসলামপূর্ব জীবনের ছবি সাহাবিদের চোখে ভেসে উঠল। এ কি সেই মুসআব—যে দামি কাপড় ছাড়া বাইরে বের হয়নি কোনোদিন? এই কি সেই মুসআব, যার আতরের ঘ্রাণ পথচারীকে পর্যন্ত আকর্ষিত করত? এ কি সেই মুসআব, যার আভিজাত্যে মুগ্ধ হতো সকলে? সাহাবিদের চোখ অশ্রুসজল হলো। রাসূল ﷺ বললেন, 'মক্কায় মুসআবের চেয়ে সুদর্শন ও উৎকৃষ্ট পোশাকধারী আর কেউ ছিল না। তাঁর চেয়ে পিতামাতার বেশি আদরের আর কোনো যুবক ছিল না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসায় সে সবকিছু ত্যাগ করেছে।'

কিছুদিন পরের ঘটনা। হাজ্জের মৌসুম চলছে তখন। মদীনা থেকে আগত কিছু লোক রাসূল ﷺ-এর কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম কবুল করল, তারপর ফিরে গেল মদীনায়। রাসূল ﷺ মদীনার মুসলিমদের দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্যে কাউকে পাঠানোর প্রয়োজনিয়তা অনুভব করলেন। মুসআবকে মদীনায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। মক্কায় মুসআবের চেয়ে বয়সে বড়ো অনেক সাহাবা ছিলেন, তবুও মুসআবকেই দূত হিসেবে মনোনীত করা হলো। তাঁর বাগ্মিতা, মেধা, উত্তম চরিত্র, দ্বীনের জন্যে কুরবানি—মুগ্ধ করেছিল নবিজিকে। মুসআব ইসলামের শিক্ষা দিতে

৪৮. সূরা তাওবা, (০৯) : ২৪ আয়াত।

লাগলেন মদীনায়। তাঁর দাওয়াতে মুসলিম হলো মদীনার বনী আবদিল আশহালের নেতা উসাইদ-সহ আরও অনেক বড়ো বড়ো নেতা। মদীনায় বইতে শুরু করল ইসলামি বিপ্লবের বাতাস। দ্রুত গতিতে বয়ে চলল সময়।

ইতোমধ্যেই রাসূল ﷺ মদীনায় হিজরত করেছেন। মক্কার মুশরিকদের অত্যাচার থেকে এতদিনে স্বস্তি পেয়েছে মুসলিমরা। মুসলিমদের সুখ-শান্তি দেখে ক্ষোভে জ্বলতে লাগল কুরাইশরা। ইসলামের নিশানা মিটিয়ে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো তারা। মুসলিম ও কুরাইশরা মুখোমুখি হলো বদরের প্রান্তরে। মুসলিমদের ধ্বংস করা তো দূরের কথা, একেবারে নাকানিচুবোনি খেয়ে বিদেয় হলো কুরাইশরা। কোনো রকমে জীবন নিয়ে পালাল। কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই আবার যুদ্ধ হলো দু-বাহিনীর মধ্যে। উহুদের প্রান্তরে একত্র হলো উভয় বাহিনী। যুদ্ধ শুরুর আগে রাসূল ﷺ কার হাতে ইসলামের পতাকা তুলে দেবেন, এই নিয়ে ভাবতে লাগলেন। তিনি গভীরভাবে উপস্থিত সাহাবিদের নিরীক্ষণ করলেন। এরপর মুসআবকে ডেকে ইসলামের পতাকা তুলে দিলেন।

যুদ্ধ শুরু হলো। একেবারে কোণঠাসা হয়ে গেল কুরাইশরা। কিন্তু ছোট্ট একটি ভুলের কারণে শেষের দিকে এসে মুসলিমদের ওপর তুমুল আক্রমণ করার সুযোগ পেল ওরা। বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল মুসলিম-বাহিনী। এই সুযোগে কুরাইশরা টার্গেট করল নবিজিকে। যুবক মুসআব বিপদের তীব্রতা অনুভব করলেন। উঁচু করে ধরলেন ঝাণ্ডা। তাকবীর দিতে লাগলেন উচ্চস্বরে। ঘোড়া ছুটিয়ে গেলেন নবিজিকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্যে। এক হাতে ঝাণ্ডা, আরেক হাতে তলোয়ার নিয়ে তিনি নিয়ে শত্রুবাহিনীর মধ্যে ঢুকে গেলেন। আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে কাঁপিয়ে তুললেন আকাশ-বাতাস। যুদ্ধ করতে লাগলেন বীর-বিক্রমে। মুসআব শুধু মুসআব রইলেন না, একজন মুসআব পরিণত হলেন একটি সেনাবাহিনীতে।

তিনি দেখতে পেলেন শত্রুরা রাসূল ﷺ-এর খুব কাছে চলে এসেছে। ঘোড়া ছুটিয়ে দ্রুত নবিজির কাছে পৌঁছুলেন তিনি। আক্রমণের তীব্রতা অনুভব করতে পেরে নবিজির জন্যে ঢাল বানালেন নিজের শরীরকে। ইবনু কামীয়ার আঘাতে তাঁর ডান হাত বিচ্ছিন্ন হলো দেহ থেকে। সাথে সাথে বাম হাতে ঝাণ্ডা তুলে নিলেন। বলিষ্ঠ-স্বরে আবৃত্তি করলে লাগলেন— وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ (ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রসূল, ক্বদ খলাত মিং ক্ববলিহির রুসুল)। কিছুক্ষণ পর তাঁর বাম হাতটিও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলো। কর্তিত বাহু দ্বারাই তিনি ইসলামের ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরলেন, আর পড়তে লাগলেন— وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ . এবার তাঁকে লক্ষ্

করে বর্শা নিক্ষেপ করা হলো। বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেল বর্শাটি। বীরের মতো যুদ্ধ করতে করতে দুনিয়া থেকে বিদেয় নিলেন মুসআব। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাসূল ﷺ-এর সুরক্ষার জন্যে লড়াই করলেন তিনি।

যুদ্ধ শেষ হলো। শহীদদের লাশগুলো জড়ো করা হলো একজায়গায়। মুসআবের লাশটি আনা হলো। রক্ত আর ধুলোবালিতে তাঁর চেহারা একাকার। সাহাবারা এ দৃশ্য দেখে কান্না শুরু করলেন। নবিজিও কাঁদলেন। খাব্বাব رضي الله عنه বলে উঠলেন—'আমরা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করেছিলাম আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। আমাদের এ কাজের প্রতিদান দেওয়া আল্লাহর দায়িত্ব। আমাদের মধ্যে যারা এ কাজের প্রতিদান মোটেও না নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদেয় নিয়েছেন, মুসআব তাঁদেরই একজন।'

মুসআবকে কাফন দেওয়ার জন্যে চাদর আনা হলো। একপ্রস্থ চাদর ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। সে চাদর দিয়ে মাথা ঢাকলে পা, আর পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে যাচ্ছিল। শেষমেশ রাসূল ﷺ বললেন, 'চাদর দিয়ে মাথার দিক যতটুকুন ঢাকা যায়, ঢেকে দাও। আর পায়ের দিকে ইযখীর ঘাস দিয়ে দাও।' নবিজির নির্দেশমতো তা-ই করা হলো। মুসআবের কাছে দাঁড়িয়ে রাসূল ﷺ কুরআন কারীমের একটি আয়াত পাঠ করলেন :

> "মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কেউ কেউ (সে অঙ্গীকার পালনের উদ্দেশ্যে) শাহাদাত বরণ করেছে। আবার কেউ কেউ (শাহাদাতের) অপেক্ষায় আছে। তারা (তাদের অঙ্গীকার) তিল পরিমাণও পরিবর্তন করেনি।"[৪৯]

নবিজি মুসআবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে মক্কায় দেখেছি। সেখানে তোমার চেয়ে কোমল চাদর এবং সুন্দর যুলফি আর কারও ছিল না। আর আজ তুমি এ চাদরে ধুলোমলিন অবস্থায় পড়ে আছ। আল্লাহর রাসূল সাক্ষ্য দিচ্ছে, কিয়ামাতের দিন তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে সাক্ষ্যদানকারী হবে।'

এরপর রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তাঁদের জিয়ারত করো। তাঁদের কাছে এসো। তাঁদের ওপর সালাম পেশ করো। সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! কিয়ামাত পর্যন্ত যে-কেউ তাঁদের ওপর সালাম পেশ করবে, তাঁরা সেই সালামের জওয়াব দেবে।'

---

৪৯. সূরা আল-আহযাব, (৩৩) : ২৩ আয়াত।

মুসআব শহীদ হওয়ার পর পরই জিবরীল ﷺ এলেন। নাজিল হলো :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

"মুহাম্মাদ একজন রাসূল ছাড়া কিছুই নয়। তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল গত হয়েছে। কাজেই সে যদি মারা যায় অথবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা উল্টোদিকে ফিরে যাবে? যে ব্যক্তি উল্টোদিকে ফিরে দাঁড়ায়, সে আল্লাহর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। এবং আল্লাহ অতি শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের বিনিময় প্রদান করবেন।"[৫০]

সুবহানাল্লাহ! এক মিনিট একটু চোখটা বুজো তো। এরপর ভাবো। যে বাক্যটা মুসআব মৃত্যুর আগে পড়ছিলেন, সে আয়াতটিই নিয়ে এলেন জিবরীল ﷺ। মুসআব এর উচ্চারিত বাক্য আর মহান রবের পাঠানো বাক্য—হুবহু মিলে গেল।

মুসআব তাঁর রবের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করেছেন যে, তাঁর রব তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। না, এ দাবি আমার নয়। কুরআন খুলো, নিজেই বুঝতে পারবে। কুরআনের একাধিক আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে। সাথে সাথে এও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেউ যদি মুসআবদের অনুসরণ করতে পারে, তবে আল্লাহ তাঁর প্রতিও সন্তুষ্ট হবেন।

"আর আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে যারা অগ্রগামী এবং যাবতীয় কাজে যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই হলো মহাসাফল্য।"[৫১]

আমি মুসআবকে জীবন্ত কিংবদন্তি কেন বলেছি, জানো?

'যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনও মৃত বোলো না, বরং তারা জীবিত। তারা তাদের রবের কাছ থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত।'[৫২]

ভাই আমার! আজ তুমি কাদের কিংবদন্তি বলছ?

---

৫০. আ ল ইমরান, (৩) : ১৪৪ আয়াত।
৫১. সূরা তাওবা, (০৯) : ১০০ আয়াত।
৫২. আ ল ইমরান, (৩) : ১৬৯ আয়াত।

অনুসরণ করছ কাদের?

কাদেরকে জীবনের মডেল বানিয়েছ?

আল্লাহ যাঁদেরকে তোমার জন্যে মডেল বানালেন, তাঁদেরকে দূরে ঠেলে আজ তুমি কাদের পাল্লায় পড়েছ? কাদের ড্রেসআপ, কাদের স্টাইল, কাদের চালচলন বেছে নিয়েছ নিজের জন্যে? তুমি কি তোমার অবস্থান নিয়ে ভেবেছ কোনোদিন? তুমি যে অবস্থায় আছ সে অবস্থায় যদি মারা যাও, তা হলে তোমার স্থান কোথায় হবে?

বিশ্বাস করো, তুমি যদি জাহিলি অবস্থাতেই মারা যাও তবে হয়তো দুনিয়ায় কিছু মানুষ তোমায় মনে রাখবে কিন্তু আসমানের অধিবাসীদের কেউই তোমায় মনে রাখবে না। তাঁদের কেউ কাঁদবে না তোমার জন্যে। কেউ সালাত ও তাসলিম পেশ করবে না তোমার প্রতি। আর যদি মুসআব হতে পারো, তা হলে তোমার নাম তাঁদের সাথে লেখা হবে যাদের নাম শুনলেই আমরা পড়ি—রদিয়াল্লাহু আনহুম (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট)।

আমাকে বলো তো, কেন তুমি অন্ধকার ছেড়ে আলোর পথে আসছ না? তোমার ধন-সম্পদ কি মুসআব ইবনু উমাইর-এর থেকেও বেশি? তুমি কি মুসআবের চেয়েও বেশি আদরে লালিত-পালিত হয়েছ? নাকি তোমার বাবা মুসআবের বাবার চেয়েও বড়ো ব্যবসায়ী? আভিজাত্যের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েও মুসআব যদি দ্বীনের পথে আসতে পারেন, তবে কী অজুহাত থাকতে পারে তোমার? সত্যিই, তোমার অন্তর মরে গেছে। তুমি অন্ধ হয়ে গেছ দুনিয়ার ভালোবাসায়। ক্যারিয়ারের মোহ আজ তোমায় বধির করে ফেলেছে। সম্পদের নেশায় মাতাল হয়ে আছ তুমি। ভাই আমার! যদি জানতে তোমার জীবন থেকে কী হারিয়ে গেছে, তা হলে খুব কমই হাসতে। কাঁদতে অনেক বেশি। অঝোর ধারায় কাঁদতে।

অধ্যায় ৪

Come on my brother, let us pray

(জান্নাতীরা জাহান্নামীদের জিজ্ঞেস করবে) 'কীসে তোমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে?'

তারা বলবে, 'আমরা সালাত আদায় করতাম না।'

[সূরা মুদ্দাসসির, (৭৪) : ৪২-৪৩ আয়াত]

বিশ্বাস করো, আমি প্রতিদিনই তোমার অপেক্ষায় থাকি। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি—তুমি আসবে বলে। কিন্তু প্রতিদিনই তুমি আমায় নিরাশ করো। একবারও দেখা দাও না। অবিশ্যি না দেওয়ারই কথা। তুমি তো ঘুমিয়েছই শেষ রাতে। গার্লফ্রেন্ডের সাথে চ্যাট করতে করতে কোনদিক দিয়ে রাত শেষ হয়েছে, টেরই পাওনি। ফজরের সালাতে আসবে কীভাবে? শেষরাতে ঘুমিয়ে ফজর ধরাটা কষ্টকর বৈ-কি। আচ্ছা, তুমি কি জানো ফজর সালাতের গুরুত্ব কতটুকু?

> "ফজরের দু-রাকাআত (সুন্নাত) পৃথিবী ও তার মধ্যিকার সকল কিছুর চাইতেও উত্তম।"[৫৩]

এ তো গেল সুন্নাতের কথা। ফজরের ফরজের দাম কত, কোনো আইডিয়া করতে পারবে?

> 'যে ব্যক্তি দু শীতের (ফজর ও আসর) সালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৫৪]

কেউ যদি ফজরের ফরজ সালাত নিয়মিত আদায় করে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি যদি বোঝাতে পারতাম জান্নাত কাকে বলে, তা হলে হয়তো তোমার টনক নড়ত। কিন্তু জান্নাত আল্লাহর এমন নিয়ামাত, যা বলে বোঝানো সম্ভব না। আচ্ছা, ফজরের কথা না হয় বাদই দিলাম। ফজর না হয় ঘুমেই কাটিয়ে দিলে। কিন্তু যোহর? মাঝবেলায় তুমি নিশ্চয় ঘুমাও না? তা হলে কী করো? একটার পরে তো ব্যস্ততা থাকার কথা না। সব প্রতিষ্ঠানেই লাঞ্চ ব্রেক আছে। তা হলে যোহর আদায় করতে তোমার সমস্যা কোথায়? কেন যোহর আদায় করছ না?

---

৫৩. নাবাবি, রিয়াদুস সালিহীন, অধ্যায় : ফজরের দু-রাকাআত সুন্নাতের তাকীদ, হাদীস : ১১০৯।

৫৪. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : সালাতের ওয়াক্তসমূহ, হাদীস : ৫৪৬।

"তারা যদি জানত আওয়াল ওয়াক্তে যোহরের সালাত আদায় করার কী (ফযীলত) আছে, তা হলে এর জন্যে তারা প্রতিযোগিতা করত।"[৫৫]

তুমি হাদীসটা যদি একটু বুঝতে চেষ্টা করতে, কতই-না ভালো হতো। যোহর এতটাই দামি যে, এর ফযীলত জানলে তুমি প্রতিযোগিতা শুরু করে দিতে। কিন্তু তুমি তো বেখেয়াল! কবে যে তোমার হুঁশ হবে!

দুপুরের আবহাওয়া জুতসই না বলে যোহর আদায় করলে না। প্রচণ্ড গরমে তোমার স্কিন ঝলে যাবে বলে মাসজিদে এলে না; কিন্তু আসর? আসরের পরিবেশ তো অনুকূলে। আসরের সময় সূর্যির উত্তাপ থাকে না বললেই চলে। তো এখন কী অজুহাত থাকতে পারে? আসরের সময় তোমার কী হলো? বিকেলে এত কীসের ব্যস্ততা তোমার? রাজ্যের সব কাজ কি তোমার ওপর? তা হলে কেন আসর আদায়ের জন্যে চেষ্টা করছ না?

সত্যি বলতে কী—তুমি সালাতকে গুরুত্বহীন মনে করো, তাই চেষ্টা করো না। সালাতকে যদি গুরুত্ব দিতে, তবে তো অবশ্যই আসর আদায় করতে। আসর তো এমন সালাত, যা মানুষের জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হবে।

"যে ব্যক্তি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে সালাত (ফজর ও আসর) আদায় করে, সে কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।"[৫৬]

হায়! যদি বুঝতে জাহান্নাম কী জিনিস, তা হলে হয়তো আসর আদায়ে অবহেলা করতে না। আসলে তুমি জাহান্নাম নিয়ে কখনও ভাবো না। ক্যারিয়ার নিয়ে যতটা চিন্তা করো, তার সিকিভাগও চিন্তা করো না জাহান্নাম নিয়ে। যদি করতে, তবে নিশ্চয়ই আসর আদায় করতে। যদি আসর আর ফজর সময়মতো আদায় করতে, তা হলে ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে গিয়ে তোমার নাম উল্লেখ করে বলত, 'তার কাছে যখন গিয়েছিলাম, তখন সে সালাতের মধ্যে ছিল। তাকে যখন আমরা ছেড়ে আসি, তখনও সে সালাতরত অবস্থাতেই ছিল।'[৫৭]

ফেরেশতারা গুণগান করল কি না, এই নিয়ে কি আর মাথাব্যথা আছে? দরকার কি অযথা এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর। তোমার কত কাজ পড়ে আছে। এসব ভাববার

৫৫. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : আযান, হাদীস : ৫৮৮।
৫৬. মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : মাসজিদ ও সালাতের স্থান, হাদীস : ১৩১১।
৫৭. নাবাবি, রিয়াদুস সালিহীন, অধ্যায় : ফজর ও আসরের সালাতের ফযীলত, হাদীস : ১০৫৭।

মতো সময় কোথায়!

সন্ধেটুকু তো বন্ধু কিংবা গার্লফ্রেন্ডের হাত ধরেই পার করো। মাগরিব যে কোন দিক দিয়ে আসে আর কোন দিয়ে যায়, বুঝতেই পারো না। ব্যস্ততা শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে তখন ঈশা। মাসজিদে আজান হলো। মুয়াযযিন ঘোষণা করল, 'সালাতের দিকে এসো। কল্যাণের দিকে এসো।' কীসের সালাত, আর কীসের কল্যাণ! তুমি তো কল্যাণ খুঁজছ ব্যাবসা-বাণিজ্যের মধ্যে, সরকারি ভালো চাকরির মধ্যে, বেক্সিমকোর শেয়ারের মধ্যে। কিন্তু সালাতের মধ্যে যে প্রকৃত কল্যাণ, তা তোমাকে কে বোঝাবে।

ফোনটা হাতে নিলে। গার্লফ্রেন্ড সেইফলি পৌঁছিয়েছে কি না, তার খবর নিলে। গার্লফ্রেন্ডের কথা ঠিকই মাথায় এল। কিন্তু সালাত? সালাতের কথা কি একটি বারও মাথায় এল না? ঈশার জামাআত যে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তার জন্যে কি এতটুকুও ব্যথা অনুভব করলে না?

ফ্রেশ হয়ে নিজের কাজে বসে গেলে। কাজের ফাঁকে মনে হলো ফেইসবুকের কথা। ঢুকতেই ৯৯ + নোটিফিকেশান। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখবে। মনে হলো, ঘুরতে যে গিয়েছিলে সেটার স্ট্যাটাস দেওয়া হয়নি। দ্রুত গার্লফ্রেন্ডকে ট্যাগ করে স্ট্যাটাস দিলে। সাথে দুজনের একটা সেলফি। Feeling excited…

নিয়েছিলে দশ মিনিটের ব্রেক, কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক কোনদিক দিয়ে পেরিয়ে গেছে, টেরই পাওনি। তুমি কি জানো, ঈশা আর ফজরের সালাত ছেড়ে দেওয়াকে নবি ﷺ মুনাফিকির আলামত বলেছেন? জানো না? অবশ্যই জানো। এই দু-সালাত আদায় করা মুনাফিকদের জন্যে বেশি কষ্টের।[৫৮] তুমি কি তা হলে নিফাকের দিকে ধাবিত হচ্ছ? তোমার ঈমানের মধ্যে কি কপটতা ঢুকে যাচ্ছে? তুমি কি আবদুল্লাহ ইবনু উবাই[৫৯]-এর দলে নাম লিখাচ্ছ?

> "আর ঈশা ও ফজরের সালাত আদায়ের কী ফযীলত আছে তা যদি তারা জানত, তবে নিঃসন্দেহে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা (মাসজিদে এসে) উপস্থিত হতো।"[৬০]

ডিনারের সময় হলো। খাবারের ছবি উঠিয়ে গার্লফ্রেন্ডকে পাঠিয়ে দিলে—মেসেঞ্জারে।

---

৫৮. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : সালাতের ওয়াক্তসমূহ, অনুচ্ছেদ : ৩৭১।

৫৯. নবিজির যুগে আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ছিল মুনাফিকদের নেতা।

৬০ বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : আযান, হাদীস : ৫৮৮।

খাওয়া শেষ হলো। হাতের কাজগুলো গুছিয়ে নিলে। ঘড়িতে তখন একটা। ক্লান্ত দেহে বিছানায় চলে গেলে। এবার শুধু অপেক্ষা। কখন যে তার কল আসে, কখন যে তার কল আসে.... হঠাৎ স্ক্রিনে আলো জ্বলে উঠল। ব্যস, তুমি মহা খুশি। সে মিসকল দিয়েছে। দ্রুত ব্যাক করতে হবে। নাহ, ফোনে কথা বললে টাকা বেশি ফুরোবে। ম্যাসেঞ্জারই ভালো। (প্রযুক্তি গোনাহকে অনেক সাশ্রয়ী করে দিয়েছে। খুব কম পয়সায় অনেক বড়ো বড়ো গোনাহ করে ফেলা যায়) ম্যাসেঞ্জারে কল দিলে। সে রিসিভ করল। তুমি হারিয়ে গেলে—দূরে, বহুদূরে...

রাত গভীর হলো, দুজনের কথাও জমে উঠল। এভাবে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ চলে এল। তোমাদের আলাপন তখন অনেকদূর গড়িয়েছে। রব্বে কারীম নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করলেন। তিনি বলতে থাকলেন, 'কেউ আছে কি মাগফিরাত কামনাকারী, আমি তাকে মাফ করব? কেউ কি আছে প্রার্থনাকারী, আমি তার ডাকে সাড়া দেবো? কেউ কি আছে দুআকারী, আমি তার দুআ কবুল করব?'[৬১]

স্বয়ং আল্লাহ ﷻ তোমায় ডাকছেন। তোমার কী কী প্রয়োজন তা জিজ্ঞেস করছেন, যদিও তিনি সবই জানেন। তোমার কি ইচ্ছে হয় না সেই মহামহিম আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে? তুমি যদি রবের ডাকে সাড়া দিতে, তা হলে তোমার গোনাহ মাফ করে দেওয়া হতো। তোমার চাওয়াগুলো পূর্ণ করা হতো। তোমার দুআকে কবুল করা হতো। হায়, তুমি কতই-না অকৃতজ্ঞ! তুমি তো গার্লফ্রেন্ড আর ফেইসবুকিং-এ ব্যস্ত। তুমি আজ শুধু গার্লফ্রেন্ডের সাথেই একাকী সময় কাটাতে পছন্দ করো, কিন্তু আরশ ও যমীনের অধিপতি আল্লাহর সাথে কিছু সময় কাটানোকে তুচ্ছ মনে করো। এ ব্যাপারে তোমার কোনো আগ্রহই আমি দেখিনি। অনেকদিন সতর্ক করেছি, অনুরোধ পর্যন্ত করেছি; কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি!

ফজরের সময় হলো। মুয়াযযিন ঘোষণা করল, 'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম' —'ঘুম থেকে সালাত উত্তম।' তুমি তখন মরার মতো ঘুমোচ্ছ। এভাবেই তোমার দিন কেটে যাচ্ছে। এভাবেই সালাতগুলো বিনষ্ট হচ্ছে তোমার দ্বারা।

তুমি কি জানো, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ ﷻ প্রথম কোন জিনিসটার হিসেব চাইবেন?

তুমি কোন কোন গবেষণা-প্রকল্পের অধীনে কাজ করেছ, এটা জিজ্ঞেস করা হবে না। কোন ভার্সিটি থেকে অনার্স কমপ্লিট করেছ, সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হবে না। নোবেল-প্রাইজ পেয়েছ কি না, তাও জিজ্ঞেস করা হবে না। সেদিন আল্লাহ ﷻ

---

৬১. মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : মুসাফিরের সালাত ও কসর, হাদীস : ১৬৫০।

প্রথম যে জিনিসটার হিসেব চাইবেন, সেটা হলো 'সালাত'। আগে সালাত, এরপর অন্য কিছু। যদি সালাত ঠিক থাকে, তো তুমি মুক্তি পাবে। সফল হবে। জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৬২] আর যদি তা না হয়?

> "তারা (দুনিয়ায়) যে আমল করেছিল আমি সেদিকে অগ্রসর হব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলোকণায় পরিণত করে দেবো।"[৬৩]

ছোটোবেলায় 'জীবনের হিসাব' নামে একটা কবিতা পড়েছিলে, মনে আছে? ওই যে, সুকুমার রায়ের কবিতাটা। আমার কিছুটা মনে আছে, শেষের দিক থেকে পড়ছি একটু :

খানিক বাদে ঝড় উঠেছে, ঢেউ উঠেছে ফুলে,
বাবু দেখেন, নৌকোখানি ডুবল বুঝি দুলে।
মাঝিরে কন, 'এ কি আপদ! ওরে ও ভাই মাঝি,
ডুবল নাকি নৌকো এবার? মরব নাকি আজি?'
মাঝি শুধোয়, 'সাতার জানো?' মাথা নাড়েন বাবু,
মূর্খ মাঝি বলে, 'মশাই, এখন কেন কাবু?
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব কোরো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোলো-আনাই মিছে।'[৬৪]

বাবু নৌকোয় ওঠে প্রথমে খুব ভাব নিয়েছিল। চাঁদ কীভাবে বাড়ে, জোয়ার-ভাটা কেন আসে, পাহাড় থেকে কীভাবে নেমে আসে নদীর ধারা, সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণ কেন হয়—ইত্যাদি প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে ফেলছিল মাঝিকে। এসব প্রশ্নের কোনো জবাব যখন মাঝি দিতে পারেনি, তখন সে তাচ্ছিল্য করে বলছিল :

'বলব কী আর, বলব তোরে কি তা—
দেখছি এখন জীবনটা তোর বারো-আনাই বৃথা।'

যে জ্ঞানের ভারে সে অহংকার করছিল, একটু বাদেই সে জ্ঞান তার কোনো কাজে

৬২. তিরমিযি, আস-সুনান, অধ্যায় : সালাত , হাদীস : ৪১৩।
৬৩. সূরা ফুরকান, (২৫) : ২৩ আয়াত।
৬৪. সুকুমার রচনাবলী, ২/৩৪।

আসেনি। বিদ্যে না থাকায় মাঝির জীবন বারো-আনা বৃথা হয়েছিল ঠিক, কিন্তু বিদ্যে থাকার পরও বাবুর জীবনটা ষোলো-আনাই বৃথা হয়ে গেছে। বাবুর কিতাবি জ্ঞান ছিল বটে কিন্তু পানিতে পড়লে নিজেকে কীভাবে বাঁচাতে হয়, এই ব্যবহারিক দিকটা তার জানা ছিল না। সাঁতার না জানায়, ইতিহাস-ভূগোল-জোতির্বিদ্যার জ্ঞান কোনো কাজে আসেনি। যদি অবহেলা করে সালাত ছেড়ে দাও, তো তোমার অবস্থা এই বাবুর মতো হবে। তুমি হয়তো পিএইচডি কিংবা পোস্ট ডক্টরেট কমপ্লিট করে ফেলতে পারো; হয়ে যেতে পারো নাসার সাইন্টিস্ট কিংবা অক্সফোর্ডের প্রফেসর; অ্যাপল কিংবা টাটার এমডি; কিন্তু বিশ্বাস করো, এসব আখিরাতে কোনো কাজেই আসবে না যদি-না সালাত ঠিক থাকে। সালাত ঠিক, তো সব ঠিক। আর সালাতে ঘাপলা, তো ষোলো-আনাই মিছে।

আল্লাহর শপথ! ঈমান আনার পর সালাতের চেয়ে দামি কোনো ইবাদাত নেই। দুনিয়ায় যত নেক আমল আছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো সালাত। সালাত হচ্ছে সেই আমল, যা তোমাকে রবের নিকটবর্তী করে দেবে। তোমাকে মুক্তি দেবে দুশ্চিন্তা থেকে। চক্ষুকে শীতল করবে। তুমি কি জানো, বিনয়ের সাথে সালাত আদায়কারীদের সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়?

> "যদি কোনো মুসলমান ফরজ সালাতের সময় হলেই ভালোভাবে ওজু করে, তারপর ভীতি ও বিনয় সহকারে সালাত আদায় করে, তা হলে তার এ সালাত পূর্বের সকল গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়।"[৬৫]

সালাতের সাথে আল্লাহর ওয়াদা আছে। তুমি যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ঠিকমতো আদায় করতে পারো, তা হলে আল্লাহ ﷻ তোমাকে জান্নাত দেবেন। ভেবো না আমি মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছি। না, এটি মিথ্যে আশ্বাস নয়। নবিজি এমনটিই বলেছেন।

> "আল্লাহ ﷻ তাঁর বান্দাহর ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি তা ঠিকমতো আদায় করবে, আর অবহেলা করে কোনোটিই ছেড়ে না দেবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর ওয়াদা করেছেন। আর যে ব্যক্তি তা আদায় করবে না, তার জন্যে আল্লাহর কোনো ওয়াদা নেই। তিনি ইচ্ছে করলে তাকে শাস্তি দেবেন, কিংবা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[৬৬]

আল্লাহ ﷻ প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রতি দয়া

৬৫. নাবাবি, রিয়াদুস সালিহীন, অধ্যায় : সালাতের ফযীলত, হাদীস : ১০৫৩।
৬৬. আবূ দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায় : সালাত , হাদীস : ১৪২০।

করে ৫০ ওয়াক্তকে কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করে দিয়েছেন। সালাতের ওয়াক্ত কমিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সওয়াব বিন্দু পরিমাণও কমাননি। ৫০ ওয়াক্ত আদায় করলে যে সওয়াব হতো, পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করলে ঠিক সমান সওয়াবই দেওয়া হবে। একটুও কম-বেশি করা হবে না।[৬৭] অন্য যত ইবাদাত আছে, সেগুলো আল্লাহ ﷻ দুনিয়ায় ফরজ করেছেন। কিন্তু সালাত? সাত আসমানের ওপরে নবিজিকে নিয়ে গিয়ে আল্লাহ ﷻ সালাত উপহার দিয়েছেন। সালাতের গুরুত্ব বোঝার জন্যে এটাই কি যথেষ্ট নয়? এরপরেও তুমি সালাতে মনোযোগী হবে না?

তুমি যদি জানতে জামাআতে সালাত আদায়ের কী ফযীলত, তা হলে হয়তো ঘরে বসে থাকতে না। ফেইসবুকিং-এ ব্যস্ত রইতে না। গার্লফ্রেন্ডের সাথে চ্যাট করে অযথা সময় নষ্ট করতে না। জামাআতের সময়গুলো ইউটিউবে আইটেম সং দেখে দেখে পার করতে না।

"জামাআতে সালাত আদায়ের ফযীলত—একাকী সালাত আদায় করার থেকে সাতাশগুণ বেশি।"[৬৮]

ওজু করার পর যদি সালাতের উদ্দেশ্যে মাসজিদের দিকে রওনা হতে, তবে প্রতিটি কদমের বিনিময়ে একটি করে গোনাহ মাফ করে দেওয়া হতো। জান্নাতের মর্তবা বৃদ্ধি করা হতো। আর মাসজিদে পৌঁছে যতক্ষণ জামাআতের জন্যে অপেক্ষা করতে, ততক্ষণ সালাত আদায়কারী বলে গণ্য করা হতো তোমাকে। সালাত শেষ করার পর যদি আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে, তবে ফেরেশতারা দুআ করত তোমার জন্যে। তারা বলত, 'হে আল্লাহ! আপনি তার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। আর তার প্রতি

---

৬৭. মিরাজের দিন আল্লাহ ﷻ প্রথম পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছিলেন। রাসূল ﷺ যখন ফিরে আসছিলেন তখন মূসা عليه السلام-এর সাথে দেখা। তিনি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনার রব আপনার উম্মতের ওপর কী ফরজ করেছেন?'

রাসূল ﷺ বলেছিলেন, 'পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত।'

এ কথা শুনে মূসা عليه السلام বলেছিলেন, 'পুনরায় আপনার রবের কাছে ফেরত যান। কেননা আপনার উম্মাতের তা পালন করার সামর্থ্য থাকবে না।'

মূসা عليه السلام-এর কথা শুনে রাসূল ﷺ আল্লাহর কাছে ফেরত যান। গিয়ে সালাত কমানোর আবেদন করেন। আল্লাহ ﷻ অর্ধেক কমিয়ে দেন। নবিজি যখন অর্ধেক কমিয়ে ফেরত আসছিলেন, তখনও মূসা عليه السلام-এর সাথে দেখা। তিনি আবারও ঠিক একই কথাই বলেন। রাসূল ﷺ আবার আল্লাহর কাছে যান। সালাত কমানোর আবেদন করেন। এভাবে কমাতে কমাতে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেওয়া হয়। এরপর আল্লাহ ﷻ বলেন, 'এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বাকি রইল। আর তা সওয়াবের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান হবে। আমার কথার পরিবর্তন হয় না।' [বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : আম্বিয়া কিরাম, হাদীস : ৩১০৬]

৬৮. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : আযান, হাদীস : ৬১৭।

অনুগ্রহ করুন।'[৬৯]

তুমি কি কোটি টাকার বিনিময়েও একজন ফেরেশতা দিয়ে নিজের জন্যে দুআ করাতে পারবে? পারবে না। কোনোদিনও পারবে না। সে ক্ষমতা তোমার নেই। শুধু তোমার না, কারও নেই। কিন্তু যদি মাসজিদে আসতে, তা হলে বিনে পয়সায় ফেরেশতারা তোমার জন্যে দুআ করত। তুমি তো বড্ড বেখেয়াল!

তুমি কি চাও না, ফেরেশতারা তোমার জন্যে দুআ করুক?

তা হলে কেন মাসজিদে আসো না? কেন রবের ডাকে সাড়া দাও না?

জামাআত ছাড়ার জন্যে নবিজি কতটা ধমকি দিয়েছেন, জানো? তিনি তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছেন, যারা আযান শুনেও সালাত আদায় করার জন্যে মাসজিদে আসে না।

> "যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমার ইচ্ছে হয়, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দিই। তারপর সালাত কায়েম করতে বলি।... এরপর আমি লোকদের কাছে যাই এবং (যারা জামাআতে অংশ নেয়নি) তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিই।"[৭০]

তুমি কি হাদীসটা নিয়ে একটু ভাববে? প্লিজ, একটু ভাবো। তুমি যার উম্মত, তিনিই তোমার ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে চাচ্ছেন। কেন? কারণ তুমি জামাআতে সালাত আদায় করছ না। এ থেকেও কি বোঝা যায় না, সালাত আদায় না করাটা কত নিকৃষ্ট কাজ!

শয়তান শুধু একবার আল্লাহর নির্দেশিত সাজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। শুধু একবার। ব্যস, এতেই সে অভিশপ্ত হয়েছে চিরদিনের জন্যে। আল্লাহর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। আর তুমি?

তুমি তো দৈনিক চৌত্রিশটা ফরজ সাজদা থেকে গুটিয়ে রাখো নিজেকে। মুয়াযযিন সাজদা দেওয়ার আহ্বান জানায়, আর তুমি বিরক্তি প্রকাশ করো। তা হলে কে বেশি নিকৃষ্ট? শয়তান? নাকি ওই ব্যক্তি, যে দৈনিক চৌত্রিশটা ফরজ সাজদার বিধান লঙ্ঘন করে?

---

৬৯. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : আযান, হাদীস : ৬১৮।
৭০. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : আযান, হাদীস : ৬১৬।

আজ তুমি কত দুশ্চিন্তায় ভুগো। জীবন থেকে কত কিছু হারিয়ে গেছে বলে অভিযোগ করো। মাঝে মধ্যে হাজারও বিষণ্ণতা তোমাকে ছেয়ে বসে। আল্লাহর শপথ! এসব থেকে মুক্তির উপায় হলো সালাত। সালাত হলো আলো, তবে তুমি কেন অন্ধকারে সাঁতরে বেড়াবে? সালাত হলো আল্লাহর সাথে কথা বলার মাধ্যম, তবে তুমি কেন দৌড়ে পালাবে? সালাতে দাঁড়িয়ে যদি সূরাতুল ফাতিহা পড়তে, তবে আল্লাহ ﷻ তোমার সাথে কথা বলতেন। তোমার কথার জবাব দিতেন। বিশ্বাস করো, রাসূল ﷺ এমনটিই জানিয়েছেন।[৭১]

তুমি যখন পড়তে : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে, যিনি জগৎসমূহের রব)।

তখন আল্লাহ ﷻ বলতেন : 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।'

তুমি যখন বলতে : اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু)।

তখন আল্লাহ ﷻ বলতেন : 'আমার বান্দা আমার গুণাবলি বর্ণনা করেছে।'

এরপর তুমি বলতে : مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (তিনি বিচার-দিবসের মালিক)।

জবাবে আল্লাহ ﷻ বলতেন : 'আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে।'

তারপর তুমি বলতে : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (আমরা শুধু তোমারই ইবাদাত করি, আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই)।

তোমার বলা শেষ হলেই আল্লাহ ﷻ বলতেন : 'এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যিকার ব্যাপার। আমার বান্দা যা চাইবে, তা-ই সে পাবে।'

শেষটায় এসে যখন বলতে : اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ (আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করো, তাদের পথে—যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ করেছ, তাদের পথে নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট))।

তখন আল্লাহ ﷻ বলতেন : 'এটা কেবলই আমার বান্দার জন্যে। আমার বান্দা যা চায়, সে তা-ই পাবে।'

সুবহানাল্লাহ! সেই আল্লাহ ﷻ— যিনি অন্য কারও সাহায্য ছাড়াই এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন—তিনি তোমার সাথে কথা বলতেন, তোমার কথার জবাব দিতেন; তুমি যা চাইতে, তা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিতেন। এমন সুযোগ আর কোথায় পাবে

৭১. মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : সালাত, হাদীস : ৭৬৪।

ভাই?

একটা বিষয় মনে পড়েছে। একটু আগে ভেবেছিলাম তোমায় বলব, কিন্তু ভুলে গেছি। সূরা ফাতিহা শেষ করে আমীন বলা নবিজির সুন্নাত, এটা তো নিশ্চয় জানো? আচ্ছা, তুমি কি জানো—জামাআতে সালাত আদায়ের সময় সূরা ফাতিহা শেষ করে আমীন বললে কী হয়?

মাথা চুলকোচ্ছ কেন? জানা নেই?

> "ইমাম যখন আমীন বলে, তখন তোমরাও আমীন বলো। কেননা যার আমীন (বলা) ও ফেরেশতাদের আমীন (বলা) এক হয়, তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।"[৭২]

একটি কন্ডিশান মেনে নিলে তোমার সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে, শুধু একটি কন্ডিশান—তুমি জামাআতে সালাত আদায় করবে, আর ইমাম যখন আমীন বলবে সাথে সাথে তুমিও আমীন বলবে, ব্যস। তুমি কি বুঝতে পারছ, এটি তোমার জন্যে কত বড়ো অফার?

এরপরেও কি সালাতে মনোযোগী হবে না?

তুমি কি জানো না, মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাথিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ ﷻ কী বলেছেন?

> "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর তার সাথে যারা আছে—তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, নিজেদের প্রতি সদয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তাদেরকে রুকু ও সাজদায় অবনত অবস্থায় দেখবে। তাদের মুখমণ্ডলে সাজদার চিহ্ন থাকবে। তাওরাতে তাদের বর্ণনা এমনই এবং ইনজিলেও।"[৭৩]

আল্লাহ ﷻ তাঁদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেছেন :

১) তাঁরা কাফিরদের প্রতি কঠোর।

২) নিজেদের প্রতি সদয়।

৩) আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তাঁরা রুকু ও সাজদা করবে।

---

৭২. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : আযান, হাদীস : ৭৪৪।

৭৩. সূরা আল-ফাতহ, (৪৮) : ২৯ আয়াত।

৪) তাঁদের মুখমণ্ডলে সাজদার চিহ্ন থাকবে।

৩ আর ৪ নম্বর বৈশিষ্ট্যগুলো একটু খেয়াল করো তো। তুমি কি এগুলো নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেছ? যদি না করে থাকো, তবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর শত্রুদের সাথে তোমার পার্থক্য কোথায়?

একদিন তুমি মারা যাবে। অবশ্যই মারা যাবে। এরপর বিচারের মাঠে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। সেদিন আল্লাহ ﷻ তোমায় সাজদা করতে আদেশ দেবেন।

> "হাঁটুর নিম্নভাগ পর্যন্ত পা খোলার দিনের (কিয়ামাতের) কথা স্মরণ করো, সেদিন তাদেরকে সাজদা করার জন্যে আহ্বান করা হবে।"[৭৪]

যদি দুনিয়ায় আল্লাহকে সাজদা করার অভ্যাস গড়ে না তুলো, তবে সেদিন যে বড্ড বিপদে পড়ে যাবে। দুনিয়ায় রহমানকে সাজদা করে থাকলে, সেদিন সাজদা করতে পারবে। আর যদি ফাঁকি দিয়ে থাকো, তো ধরা খেয়ে যাবে। তখন অপমান আর লাঞ্ছনা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। লজ্জায় দৃষ্টিকে নত করা ছাড়া আর কোনো পথ থাকবে না। সেদিন আক্ষেপ করার থেকে এখন একটু কষ্ট করা ভালো নয় কি?

> "কিন্তু তারা সাজদা করতে সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি হবে অবনত। অপমান-লাঞ্ছনা তাদের ওপর চেপে বসবে। তারা যখন সুস্থ ও নিরাপদ ছিল তখনও তাদেরকে সাজদা করার জন্যে ডাকা হতো (কিন্তু তারা সাজদা করত না)।"[৭৫]

আল্লাহ ﷻ জাহান্নামীদের জন্যে স্পেশাল অফার ঘোষণা করবেন। জাহান্নাম থেকে বের করার অফার। একে একে ঈমানদারদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। সবার শেষে যাদের বের করা হবে, তাদের মধ্যে ওসব লোক থাকবে যাদের চেহারায় সাজদার চিহ্ন থাকবে।

> "জাহান্নামীদের মধ্যে যাদের প্রতি আল্লাহ ﷻ রহমত করতে ইচ্ছে করবেন, তাদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের নির্দেশ দেবেন যেন জাহান্নাম থেকে তাদের বের করে আনা হয়। ফেরেশতারা তাদের বের করে আনবেন এবং সাজদার চিহ্ন দেখে তাদের চিনবেন। আল্লাহ ﷻ জাহান্নামের জন্যে সাজদার চিহ্ন মিটিয়ে

৭৪. সূরা আল-কালাম, (৬৮) : ৪২ আয়াত।
৭৫. সূরা আল-কালাম, (৬৮) : ৪২ -৪৩ আয়াত।

দেওয়াকে হারাম করেছেন। ফলে জাহান্নাম থেকে তাদের বের করে আনা হবে। কাজেই সাজদার চিহ্ন ছাড়া বানী-আদমের সবকিছুই আগুন গ্রাস করে ফেলবে। অবশেষে অঙ্গারে পরিণত অবস্থায় তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। এরপর তাদের ওপর আবে হায়াত ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে তারা স্রোতে বাহিত ফেনার ওপর গজিয়ে ওঠা উদ্ভিদের মতো সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। এরপর আল্লাহ বান্দাদের বিচারকাজ শেষ করবেন।"[১৬]

সেদিনের কথা কি একটি বারও ভাববে না, যেদিন এই সাজদা তোমাকে মুক্তি দেবে? তুমি যতই 'ফেয়ার এন্ড হ্যান্ডসাম' মাখো না কেন, লাভ নেই। স্নো মাখতে মাখতে যদি চেহারা ধবধবে সাদাও করে ফেলো, তবুও লাভ নেই। সুন্দর চেহারা সেদিন কাজে আসবে না, কাজে আসবে সাজদার চিহ্ন। সাজদার চিহ্ন দেখেই জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তুমি তো সালাতই আদায় করো না, চেহারায় সাজদার চিহ্ন আসবে কোত্থেকে?

ভাই আমার! একটা ভালো চাকরি আশায় কত নেতার পেছনেই-না ঘুরঘুর করো। কত জনের চেম্বারেই না ধর্ণা দাও। অথচ যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, যার হাতে তোমার প্রাণ—সেই সত্তার দিকে ফিরেও তাকাও না। তোমার অন্তর কি মরে গেছে? হৃদয় থেকে আল্লাহভীতি একেবারেই চলে গেছে? আমাকে বলো তো—এ তোমার কেমন জীবন, যে জীবনে সাজদার লেশমাত্র নেই? তুমি কেমন বান্দা, যার রুটিনে সালাতের ছিটেফোঁটাও নেই? তুমি কেমন যুবক, রহমানের প্রতি যার সামান্যতম কৃতজ্ঞতাবোধও নেই?

- সালাত আদায় করতে কি সারাদিন লাগে?

- না।

- আট ঘণ্টা লাগে?

- না।

- যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতে পড়তে চাও, তা হলে কতক্ষণ লাগবে?

- সর্বোচ্চ এক ঘণ্টা।

- তবে কেন সালাত আদায় করো না?

---

১৬. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : আযান, হাদীস : ৭৬৯।

ঘন্টার-পর-ঘন্টা তো ফেইসবুকেই কাটাও। গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলে পার করো সারা রাত। দুনিয়াবি ব্যস্ততায় পুরোটা দিন দৌড়ঝাঁপ করো। দিন-রাত মিলিয়ে ঘন্টাখানিকও কি আল্লাহর জন্যে বের করা যায় না? আল্লাহকে কি এতটাই গুরুত্বহীন মনে করো? এতটাই তুচ্ছ মনে করো আল্লাহর বিধান সালাতকে? তোমার কাছে কি সাজদার একটুও মূল্য নেই?

এই তো কাল তুমি আমাকে বলেছ, 'আমি নিজের সাথে পেরে উঠছি না। শয়তান আমার ওপর জয়ী হচ্ছে। আমাকে হারিয়ে দিচ্ছে। আমি অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ছি।' আমি কি তোমায় বলিনি, সালাতই হচ্ছে একমাত্র সমাধান? তোমার প্রশ্ন শুনে সাথে সাথে বলেছি, 'তুমি রহমানের মাসজিদে যাও। সালাতে মনোযোগী হও।' সালাত হলো সেই ইবাদাত, যা তোমাকে অশ্লীলতা থেকে মুক্ত রাখবে। তোমার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করবে। তোমাকে আল্লাহর পথে অটল থাকার সাহস জোগাবে।

"নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে।"[৭৭]

আল্লাহর শপথ! তোমার অন্তর কখনও প্রশান্ত হবে না, যদি রহমানের সাজদায় মাথা না নোয়াও। তোমার সমস্যার কখনও সমাধান হবে না, যদি মাসজিদের পানে ছুটে না যাও। তোমার বিষণ্ণতা কখনও কাটবে না, যদি সালাতে মনোযোগ না দাও।

ভাই আমার! কবে তুমি সালাত আদায়কারীদের কাতারে শামিল হবে? কবে রহমানের বান্দাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সালাত আদায় করবে? কবে সালাতে অশ্রু বিসর্জন দিয়ে নিজের গোনাহের জন্যে লজ্জা প্রকাশ করবে? কবে সালাতের মাধ্যমে নিজের পাপগুলো মাফ করিয়ে নেবে?

কবে?

From those around…

I hear a cry…

A muffled sob…

A hopeless sigh…

I hear their Footsteps leaving slow…

And then I know my soul must fly

৭৭. সূরা আল-আনকাবুত, (২৯) : ৪৫ আয়াত।

A chilly wind begins to blow…

Within my soul, from head to toe…

And then, last breath escapes my lips

It's time to leave and I must go!

So it is true (But it's too late)

They said, "Each soul has its given date."

When it must leave its body's core

And meet with its eternal fate!

Oh! Mark the words that I do say

Who knows? Tomorrow could be your day

At last, it comes to heaven or hell

Decide which now do not delay!

Come on my brothers let us pray!

Decide which now do not delay![٩٢]

٩٢. Ahmed Bukhatir, Last Breath, https://www.lyricsfreak.com/a/ahmed+bukhatir/last+breath_20846599.html

অধ্যায়

৬

কাছে আসার সাহসী গল্প

“এদের কাহিনিসমূহে বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।”

[সুরা ইউসুফ, (১২) : ১১১ আয়াত]

কোনো এক রাজপুত্রের কাহিনি তোমায় শোনাতে চাচ্ছি। তবে সে রাজপুত্তুরের নাম কী ছিল, তা বলব না। শুধুই তার জীবনী নিয়ে কিছু কথা বলব। তিনি ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। বাস করতেন পারস্যের ইস্পাহান নগরের জাই গ্রামে। এলাকার প্রধান জমিদার ছিলেন তাঁর বাবা। বাবা তাঁকে এতটাই ভালোবাসতেন যে, এক পলকের জন্যেও চোখের আড়াল হতে দিতেন না। পারিবারিকভাবে তাঁরা ছিলেন অগ্নিপূজারি। তাঁদের গ্রামে বিশাল যে অগ্নিকুণ্ডটি ছিল, সেটির প্রধান রক্ষক ছিলেন তাঁর বাবা। বাবার অবর্তমানে প্রধান রক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁকে। তিনি সে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন আপন-মনে।

একবার তাঁর বাবার প্রাসাদের বাইরের খামারে কিছু কাজ পড়ে যায়। বাবা নিজে যেতে না পারে তাঁকেই খামারের কাজে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। বাবার আদেশ পেয়ে তিনি বের হলেন খামারের উদ্দেশ্যে। পথিমধ্যে এক গির্জার সন্ধান পান। বেশ আগ্রহ নিয়ে উঁকি দেন গির্জার ভেতরে। শুনতে পান খ্রিষ্টানদের প্রার্থনার আওয়াজ। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'এখানে কী হচ্ছে?' তারা বলে, 'এরা খ্রিষ্টান। প্রার্থনা করছে।'

ওদের কথা শুনে তিনি গির্জার ভেতরে প্রবেশ করেন। বসে যান সেখানে। প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা দেখতে থাকেন। খ্রিষ্টানদের প্রার্থনা তাকে এতটাই মুগ্ধ করে যে, কোনদিক দিয়ে সূর্য ডুবে যায়, তা তিনি খেয়ালই করেননি। সেদিন আর খামারে যাওয়া হলো না তাঁর। সন্ধে পর্যন্ত আটকে গেলেন সেখানেই। ততক্ষণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বাবা তাঁকে খোঁজার জন্যে লোক পাঠিয়েছেন চতুর্দিকে। সন্ধের কিছুক্ষণ পর তিনি বাসায় ফেরেন। সন্তানকে কাছে পেয়ে তাঁর বাবা জিজ্ঞেস করেন, 'কোথায় ছিলে তুমি? আমি তো তোমার চিন্তায় পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম!'

জবাবে তিনি বলেন, 'বাবা! আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। যাদেরকে খ্রিষ্টান বলা হয়। তাদের উপাসনা ও প্রার্থনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাই তারা কীভাবে

কী করছে—সেটা দেখার জন্যে বসে গিয়েছিলাম ওখানে।'

ছেলের মুখে এমন কথা শুনে পিতা হকচকিয়ে গেলেন। এরপর বললেন, 'ছেলে আমার! তোমার ও তোমার পিতৃপুরুষের দ্বীন ওদের দ্বীনের চেয়ে উত্তম।'

তিনি বললেন, 'না। আল্লাহর শপথ! আমাদের দ্বীন তাদের দ্বীনের চেয়ে উত্তম নয়। তারা এমন এক সম্প্রদায়, যারা আল্লাহর গোলামি করে। তাঁকে ডাকে এবং তাঁরই উপাসনা করে। আর আমরা! আমরা তো আগুনের উপাসনা করি। যা আমরা নিজের হাতে জ্বালাই, আর আমরা দেখভাল ছেড়ে দিলে তা নিভে যায়।'

পুত্রের মুখে এ কথা শুনে পিতা যারপরনাই বিস্মিত হলেন। পুত্রকে হারানোর ভয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিলেন তিনি। শেকল লাগিয়ে দিলেন ছেলের দু-পায়ে। বন্দি করে রাখলেন বাসায়। বাবার ভয়ে বন্দি-জীবনই বেছে নিতে হলো তাঁকে। কিছুদিন পর বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে খ্রিষ্টানদের কাছে একটি লোক পাঠালেন তিনি। উদ্দেশ্য—খ্রিষ্টানদের দ্বীনের উৎস সম্পর্কে জানা। তাঁর পাঠানো লোকটি এসে জবাব দিলো, 'তাদের দ্বীনের উৎস শামে।' তিনি লোকটিকে বললেন, 'ওখান (শাম) থেকে লোক এলে আমাকে জানাবে।'

সিরিয়া, ইরান, ফিলিস্তিন-সহ বিস্তৃত ভূমিকে শাম বলা হয়। এই শামেই রয়েছে আমাদের প্রথম কিবলা বায়তুল মাকদিস। নবি ﷺ এই শামের জন্যে কল্যাণের দুআ করেছেন বহুবার। তো কিছুদিন পর শাম থেকে কিছু লোক এলে তাঁর কাছে খবরটা পৌঁছানো হলো। তিনি পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকলেন। যখন শামের লোকজন কাজকর্ম শেষ করে ফিরে যাচ্ছিল, তখন তিনি বাবার চোখে ধুলো দিয়ে শেকল ভেঙে পালিয়ে গেলেন ওদের সাথে। সফর করতে করতে অবশেষে পৌঁছলেন শামে।

শামে পৌঁছে খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে জানার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। সফরসঙ্গীদের মধ্য থেকে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'খ্রিষ্টধর্মের সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?' তারা একটি গির্জার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'এই গির্জাবাসী পাদরি।' তিনি তার কাছে গিয়ে বলেন, 'আমার একান্ত ইচ্ছে—আপনার সাথে এ গির্জায় থেকে আল্লাহর উপাসনা করব। আর আপনার কাছ থেকে উপকারী জ্ঞান শেখব।'

পাদরি রাজি হলেন তাঁর প্রস্তাবে। মানুষ পাদরিকে ভালো মানুষ হিসেবে জানত। কিন্তু বাস্তবে সে ছিল অত্যন্ত লোভী। তিনি এ অবস্থা থেকে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। ওর

প্রতি ঘৃণা জন্মাতে লাগল তাঁর মনে। কিছুদিন পর পাদরি মারা গেলেন। লোকজন ওকে দাফন করতে এল। তিনি বললেন, 'এ তো একটি খারাপ লোক। সে লোকদেরকে দান-খয়রাতের নির্দেশ দিত ঠিক, কিন্তু নিজে তা করত না। সে লোকজনকে ভালো কাজের নির্দেশ দিত, কিন্তু তলে-তলে আবার নিজেই খারাপ কাজ করে বেড়াত। তোমাদের দান-সদাকার টাকাগুলো অভাবীদের না দিয়ে নিজের কাছেই রেখে দিত সে।'

লোকজন ক্ষেপে গেল তাঁর কথায়। তাদের দৃষ্টিতে যিনি মহৎ, তাকে তিনি মন্দ বলবেন—তা কী করে হয়। তারা প্রমাণ চাইল। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে তার জমা করা সম্পদ বের করে দেখাচ্ছি।' তিনি পাদরির লুকোনো সাতটি পাত্র বের করে দেখালেন, যেখানে অনেক সোনা-রূপা জমা করা ছিল। লোকজন এ দৃশ্য দেখে তাদের ভুল বুঝতে পারল। দাফন না করে তারা শূলিতে চড়াল পাদরির লাশ। এরপর রাগে-ক্ষোভে পাথর নিক্ষেপ শুরু করল লাশের ওপর।

ওই পাদরি মারা যাওয়ার পর আরেকজন পাদরি নিয়োগ দেওয়া হলো। তিনি সে পাদরির ভক্ত হয়ে গেলেন। একটা সময় নতুন পাদরির জীবন আয়ু ঘনিয়ে এল। নতুন পাদরি যখন মারা যাচ্ছিল, তখন তিনি তার শিয়রে বসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আল্লাহর ফয়সালা (মৃত্যু) আপনার সামনে হাজির। আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবেসেছি। (এখন) আমাকে কী কী কাজ করার আদেশ দিচ্ছেন? কার কাছে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন?'

নতুন পাদরি বললেন, 'বৎস! আল্লাহর শপথ! আমি কেবল একজনকেই চিনি, যিনি মসুলে থাকেন। তার কাছে যাও। সেখানে গেলে দেখবে—তার অবস্থাও আমার মতোই।'

নতুন পাদরি মারা যাওয়ার পর মসুলে এসে উপস্থিত হলেন তিনি। একসময় মসুলের পাদরি জীবন সায়াহ্নে চলে এল। তিনি তাকে সে কথাই জিজ্ঞেস করলেন, যা শামের পাদরিকে করেছিলেন। তার প্রশ্নের জবাবে মসুলের পাদরি বলেন, 'বৎস! আল্লাহর শপথ! আমি কেবল একজনকেই চিনি, যিনি নাসীবাইন এলাকায় থাকেন। তার অবস্থাও আমার মতোই। তার কাছে যাও।'

মসুলের পাদরি মারা গেলে তিনি নাসীবাইন পৌঁছলেন। সেখানকার পাদরির সান্নিধ্য গ্রহণ করলেন। নাসীবাইনের পাদরি যখন মারা যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাকেও একই কথা বলেন, যা অনান্য পাদরিদের বলেছিলেন। তার কথা শুনে নাসীবাইনের পাদরি

তাঁকে বাইজান্টাইন রাজ্যের আম্মূরিয়্যা এলাকায় যাওয়ার নির্দেশ দেন। পাদরিকে দাফন করে তিনি আম্মূরিয়্যায় পৌঁছান। আম্মূরিয়্যার পাদরির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি কিছু অর্থ সম্পদ অর্জন করেন। ভেড়ার একটি ছোট্ট পাল ও কয়েকটি গাভীর মালিক বনে যান। যখন আম্মূরিয়্যার পাদরির মৃত্যু ঘনিয়ে আসে, তখন তিনি তার কাছেও উপদেশ চান। আম্মূরিয়্যার পাদরি বলেন, 'বৎস! আল্লাহর শপথ! আমার মতো আর কোনো ব্যক্তি আছে বলে আমার জানা নেই, যার কাছে তুমি যেতে পারো। তবে সময় খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছে। আল-হারাম থেকে একজন নবি প্রেরণ করা হবে। অগ্নেয়শিলা গঠিত দুই অঞ্চলের মাঝামাঝি এলাকায় তিনি হিজরত করবেন। যে অঞ্চলের মাটি হবে কিছুটা লবণাক্ত ও খেজুর গাছবহুল। তাঁর মধ্যে কিছু স্পষ্ট নিদর্শন থাকবে। তাঁর দু-কাঁধের মধ্যে থাকবে নবুওয়াতের সীলমোহর। তিনি উপহার গ্রহণ করবেন, কিন্তু সদাকা গ্রহণ করবেন না। সেই অঞ্চলে যাবার সামর্থ্য থাকলে চলে যাও। কারণ তাঁর আগমনের সময় খুব কাছাকাছি চলে এসেছে।'

কিছুদিন পর আরব ব্যবসায়ীদের একটি কাফেলার সাথে দেখা হয় তাঁর। নিজের ভেড়া ও গাভীর পালের বিনিময়ে তাঁকে আরব ভূমিতে পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব দেন তিনি। প্রস্তাবে রাজি হয় ওরা। কিন্তু আল-কুরা উপত্যকায় এসে ব্যবসায়ী কাফেলা গাদ্দারী করে বসে। দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয় তাঁকে। তাঁকে কিনে নেয় এক ইয়াহূদি। এরপর তাঁকে মদীনায় আনা হয়। তিনি সেখানে খেজুর গাছ দেখতে পান। খেজুর গাছ দেখে তাঁর মনে খুশির ঢেউ উঠতে থাকে। তিনি বুঝতে পারেন—এটাই সে শহর, যার সম্পর্কে আম্মূরিয়্যার পাদরি তাঁকে বলেছিলেন। তিনি মনিবের অধীনে দাসত্বের জীবন কাটাতে থাকেন। অপেক্ষা করতে থাকেন সে সময়ের, কখন তাঁর সাথে সেই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ হবে।

একদিন তিনি খেজুর বাগানে কাজ করছিলেন। গাছের ওপর ওঠে খেজুর নামাচ্ছিলেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন তাঁর মনিবের এক চাচাতো ভাই বলছেন, 'আল্লাহ্ বানূ কাইলা গোত্রকে শায়েস্তা করুন। আল্লাহর শপথ! তারা এখন মক্কা থেকে আগত এক ব্যক্তির চারপাশে জড়ো হয়েছে কুবাতে। তাদের ধারণা সে একজন নবি।' এ কথা শুনে তাঁর অন্তরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন—এ ব্যক্তিটাই কি সেই মহাপুরুষ? তা হলে কী সব প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে? আমি কি সত্যের কাছে পৌঁছে গেছি? চিন্তাগুলো তাঁর মনে এতটাই ঢেউ খেলতে থাকল যে, গাছ থেকে পড়ে যাবার উপক্রম হলো। তিনি দ্রুত গাছ থেকে নেমে এসে তাঁর মনিবের চাচাতো ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী সংবাদ? উনি কে? (আমাকে একটু তাঁর

সম্পর্কে খুলে বলবেন?)'

তিনি দাস ছিলেন, তাই তাঁর কথা শুনে মনিবের চাচাতো ভাই রেগে গেলেন। কষে থাপ্পড় বসিয়ে দিলেন তাঁর গালে। ভুরু কুঁচকে জবাব দিলেন, 'এ দিয়ে তোর কী? যা! নিজের কাজে যা।'

দিন গড়িয়ে সন্ধে হলো। তিনি কিছু খেজুর হাতে রওনা হলেন সেই ব্যক্তিটির সাথে দেখা করার জন্যে, যার কথা তাঁর মনিবের চাচাতো ভাই বলছিল। সে মহাপুরুষের কাছে গিয়ে বললেন, 'শুনলাম—আপনি একজন ভালো মানুষ। আর আপনার সাথে কিছু সাথি আছে যারা এ এলাকায় অপরিচিত। আমার কাছে কিছু সদাকার খেজুর আছে। মনে হলো এ অঞ্চলে আপনারাই হলেন এর হকদার। এই হলো খেজুর। এখান থেকে কিছু খান।'

তাঁর কথা শুনে সে মহাপুরুষ হাত গুটিয়ে নিলেন। সাথিদের ডেকে বললেন, 'তোমরা খাও।' তিনি মনে মনে ভাবলেন—আম্মূরিয়্যার পাদরি তাঁকে মহাপুরুষের যেসব গুণ বলেছিলেন, তার একটা পাওয়া গেল। এই ভেবে তিনি দ্রুত ফিরে গেলেন মনিবের বাড়িতে। খানিক সময় পর নিজের জমানো কিছু খাবার হাতে আবারও সে মহাপুরুষের কাছে গেলেন। গিয়ে বললেন, 'একটু আগে দেখলাম, আপনি সদাকার জিনিস খান না। এটি উপহার। সদাকা নয়। এখান থেকে কিছু খান।' মহাপুরুষটি সে খাবার থেকে খানিকটা খেলেন এবং তাঁর সাথিদেরকেও দিলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি ভাবলেন—আম্মূরিয়্যার পাদরির দেওয়া দুটো বৈশিষ্ট্য মিলে গেল। সেদিনকার মতো ফিরে এলেন তিনি।

দিন কয়েক পর আবার সে মহাপুরুষের কাছে গেলেন কথা বলার জন্যে। তিনি দেখতে পেলেন, সে মহাপুরুষটি একটি লাশের পেছন পেছন যাচ্ছিলেন। তিনি চক্কর দিতে লাগলেন তাঁর পাশে। তাঁকে চক্কর দিতে দেখে সে মহাপুরুষ বুঝে ফেললেন—তিনি কী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তিনি তাঁর গায়ের চাদর নামিয়ে ফেললেন। মহাপুরুষের দু-কাঁধের মধ্যিখানের সীলমোহর এবার স্পষ্ট হলো। তা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। অবিশ্যি এ কান্না দুঃখের কান্না নয়। এতদিন পর তিনি সত্যকে খুঁজে পেয়েছেন, এ কান্না ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ। তিনি তা খুঁজে পেয়েছেন, যা তিনি হন্নে হয়ে খুঁজেছেন। তিনি সে মহাপুরুষকে খুঁজে পেয়েছেন, যার জন্যে অপেক্ষা করেছেন বছরের-পর-বছর। প্রিন্স হয়েও দাসত্বের জীবন মেনে নিয়েছেন যার জন্যে, আজ তাঁর সামনে তিনি। এ দৃশ্যের প্রকৃত রূপটা আমি আমার লেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারব না। সে

সাধ্যি আমার নেই। তবে এই মুহূর্তে দু-লাইন অখাদ্য কবিতা মনে পড়ছে, সেইটে উল্লেখ করছি :

বহু দেশ ঘুরে, বহু ক্লেশ পরে,
খুঁজে পেলেম তারে;
হৃদয় পটে, ভাবনার তটে,
রেখেছিলেম যারে।
বাড়াও হায়াৎ, করাও দেখা,
হে প্রভু দয়াময়—
এ প্রার্থনার পরে, দিনমান ভরে,
করিয়াছি অনুনয়।
ভাসিয়াছে মনে, ক্ষণে ক্ষণে,
তাহাঁর বিধুবদনখানি;
অশ্রু সে তো, গড়িয়েছে কত,
কেবলই আমি জানি।
সে মহামানবেরে, মদীনার পরে,
আজি করিলেম দরশন;
মম হিয়ার মাঝারে, বহিছে সজোরে,
শ্যামলকোমলসমীরণ।

একবার মানচিত্রটা হাতে নাও, এরপর দেখো—কোথায় পারস্য, আর কোথায় মদীনা। কতটা দূরত্ব এই শহর দুটোর মধ্যে। আর সে সময় তো দ্রুতগামী যানবাহনও ছিল না আমাদের মতো। গন্তব্য পথে ছিল সীমাহীন প্রতিকূলতা। এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, মাইলের-পর-মাইল সফর করেছেন তিনি। যার জীবন কেটেছে রাজকীয় মহলে, বাদশাহি হালতে, তিনিই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছেন। সত্যের আলোকিত পথ খুঁজে বেড়িয়েছে দেশ হতে দেশান্তরে। তিনি ছিলেন এমনই বীরপুরুষ, যিনি সত্যের কাছে আসার জন্যে বাজি রেখেছেন নিজের জীবনকে। আসলে বীরপুরুষরা এমনই হয়। কোনো প্রতিবন্ধকতা রুদ্ধ করতে পারে না তাঁদের গতিকে।

তিনি দ্রুত সে মহাপুরুষের কাছে গেলেন। উপুড় হয়ে নবুওয়তের সীলমোহরে চুমো খেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন—এ মহাপুরুষই তিনি, যার আগমনের কথা পাদরি তাঁকে জানিয়েছিলেন। ইনিই হলেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁর হৃদয় শিহরিত হলো। দাড়ি ভিজে গেল চোখের জলে। তাঁর কান্না দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'সালমান! এদিকে এসো।'

এই যা! বলেই ফেললাম—তাঁর নামটা।

কী আর করার। আমি যার কাহিনি তোমায় শুনাচ্ছি, তাঁর নাম সালমান। সালমান ফারিসি। যিনি সত্যকে আলিঙ্গন করার জন্যে রাজকীয় জীবন পরিত্যাগ করেছেন। সত্যের স্বাদ আস্বাদন করার জন্যে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছে। সত্যকে খুঁজতে খুঁজতে মাইলের-পর-মাইল পথ পাড়ি দিয়েছেন। ক্লান্তি যাঁকে স্পর্শ করেনি। যিনি বিরতিহীন ছুটেছেন। ছুটেছেন সত্যের পথে। নবিজির কাছে তিনি সব ঘটনা খুলে বললেন। সাহাবারা বিস্মিত হলেন তাঁর ত্যাগের কথা শুনে। বিশাল মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনা হলো তাঁকে। মুক্তি পেয়ে তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছে চলে এলেন। সে থেকে মৃত্যু অবধি সত্যের ওপর অটল ছিলেন তিনি। শেষমেশ সত্যের জন্যে জীবনকে উৎসর্গ করে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।[৭১]

তুমি সেদিন আমায় 'কাছে আসার সাহসী গল্প' শুনিয়েছিলে। ওই যে, ক্লোজ আপের কাছে আসার সাহসী গল্প, মনে পড়েছে? তুমি যখন প্রেমিক-প্রেমিকার জেনার গল্পকে 'কাছে আসার গল্প' বলে চালিয়ে দিচ্ছিলে, তখন বড্ড মাথা ধরছিল আমার। কিন্তু তখন কিছুই বলিনি। এখন বলছি—প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে কোনো নারীকে ভালোবেসে যাওয়ার নাম 'কাছে আসা' নয়। রবের দিকে ফিরে আসার নাম 'কাছে আসা'। সত্যকে আলিঙ্গন করার নাম 'কাছে আসা'। সত্যকে আপন করে পাওয়ার নাম 'কাছে আসা'। আমি জানি, প্রকৃত কাছে আসার স্বাদ তুমি অনুভব করোনি। কারণ তুমি কখনও সত্যকে আলিঙ্গন করতে চাওনি। হ্যাঁ, সত্যিই চাওনি। আল্লাহ ﷻ তোমাকে জন্ম দিয়েছিলেন মুসলিম ঘরে। সত্য সব সময় তোমায় হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। তোমাকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছে। কিন্তু তুমি! কখনও সেটা উপলব্ধি করতে চাওনি। কখনও বুঝতে চাওনি যে, ভুল পথে আছ তুমি। আর আমি যখন তোমাকে বোঝাতে চেয়েছি, তখন এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিয়েছ।

আচ্ছা, এত কীসের অহংকার তোমার?

---

৭১. ইবরাহীম আলি, সীরাতুন নবি ﷺ, পৃষ্ঠা : ৬০-৬৬।

তোমার বাবা কি সালমানের বাবার চেয়েও বড়ো জমিদার?

সালমানের চেয়েও কি বেশি আদরের লালিত-পালিত হয়েছ তুমি?

নাকি রাজপুত্তুর তুমি?

তবে এত দাম্ভিকতা কোথা থেকে আসে?

সালমানরা যদি কষ্টের-পর-কষ্ট করে সত্যকে খুঁজে নিতে পারে, তবে তুমি কেন সত্যকে মেনে নিতে পারবে না? তুমি তো পারিবারিকভাবেই এ সত্যকে পেয়েছ। তবুও তুমি সত্যকে মানার ব্যাপারে বেখেয়াল, উদাসীন!

আমি জানি না, আর কবে তুমি ফিরে আসবে।

বিশ্বাস করো, আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে তোমায় বেশি পরিশ্রম করতে হবে না। মাইলের-পর-মাইলে সফর করতে হবে না সালমানের মতো। উত্তপ্ত বালুতে তীব্র অত্যাচারে জর্জরিত হতে হবে না বিলালের মতো। আরাম-আয়েশ সব ছেড়ে রাস্তায় নেমে যেতে হবে না মুসআব ইবনু উমায়ের-র মতো। না, এমনটা করতে হবে না। শুধু একটু সৎ হতে হবে। সত্যকে আপন করে নেওয়ার স্পৃহা জাগাতে হবে হৃদয়ে। আর সত্যের ওপর অটল থাকার দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। ইবনু কায়্যিম ﵀ বলেন,

> "আল্লাহর কাছে তাঁর পাশে দারুস সালামে যেতে এগিয়ে এসো। সেখানে যেতে অত বেশি কষ্ট-ক্লেশ, দুঃখ-বেদনা, পরিশ্রম করতে হবে না। এটি তো সংক্ষিপ্ত ও সহজ পথ।... আর এ কাজ করতে তোমাকে খুব বেশি কষ্ট-ক্লেশ, দুঃখ-বেদনা সহ্য করতে হবে না। আর এটি কোনো কঠিন কাজও না... এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ নয় যে, কষ্টকর হবে। কাজটি শুধু দৃঢ় সংকল্প, চূড়ান্ত নিয়তের—যা তোমার শরীর, মন ও গোপনীয় কাজকে আরাম দিবে। অতএব, যা-কিছু ছুটে গেছে তাওবার দ্বারা তা সংশোধন করবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সে কাজ করা থেকে বিরত থাকবে—এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প ও নিয়ত করো।... পরকালের তুলনায় এ ক্ষুদ্র সময়ে যদি তুমি তোমার রবের পথে চলো, তা হলে তুমি মহাসাফল্য ও মহাবিজয় অর্জন করবে। আর যদি প্রবৃত্তি, আরাম-আয়েশ, হাসি-তামাশায় জীবন কেটে দাও—যা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে—তা হলে পরকালে তোমাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব পেতে হবে। (মনে রেখো) হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা, আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণ করা ও প্রবৃত্তির বিপরীত কাজ করার তুলনায় সে আযাবের দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা ও বেদনা অত্যধিক কঠিন,

শত্রু ও সর্বদা বিদ্যমান।"[৮০]

৮০. ইবনু কায়্যিম, মুখতাসার আল-ফাওয়ায়িদ, পৃষ্ঠা : ২৮।

চমকানো মেঘ যেন চমকায় অবিরাম

"(মুহাম্মাদ) তুমি বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তা হলে আমার অনুসরণ করো। (তবে) আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

[সূরা আ-ল ইমরান, (০৩) : ৩১ আয়াত]

আচ্ছা, তোমার টি-শার্টে ওটা কার ছবি?

-চে গুয়েভারার?

টম ক্রুজের ছবিওয়ালা একটা ব্যাগ ছিল তোমার। ওটা কি এখনও ইউজ করো?

এটা কী কাটিং দিয়েছ চুলের? একেবারে রোনালদোর মতো লাগছে।

দাড়িগুলো কি রবীন্দ্রনাথকে ফলো করে রেখেছ?

-নাহ, ঠাকুরের দাড়ি তো এতটা ছোটো ছিল না। যদ্দুর মনে পড়ে, তার দাড়ি আরও বড়ো ছিল। মেসির স্টাইল ফলো করেছ, তাই না?

আজ ওরা নি-জয়েন্টের কাছে প্যান্ট কেটে পড়েছে, তো কাল তুমি নি-জয়েন্ট বরাবর কাটা প্যান্টের খোঁজ করছ বসুন্ধরায়। Balbo, Bandholz কিংবা Garibaldi স্টাইলে দাড়ি রেখেছে ওরা, তো তুমিও সেলুনে গিয়ে ওভাবেই দাড়ির কাটিং দিচ্ছ। ওরা Messy textured, Taper Fade, Undercut, Pompadour Fade অথবা Quiff কাটিং দিয়েছে চুলের, তো তুমিও সেটা দেওয়ার জন্যে পাগলপারা হচ্ছ। হয়তো নিজেও জানো না, দিন দিন তুমি ওদের গোলামে পরিণত হচ্ছ। আধুনিকতা, স্টাইল কিংবা ফ্যাশনের নামে এভাবে নিজের পরিচয় বিকিয়ে দিচ্ছ!

আমাকে বলো তো, কেন তুমি তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ছ?

তবে কি তাদের রোল মডেল বানিয়েছ?

তোমার রব কি এমন কাউকে পাঠাননি, যিনি ওদের চাইতে পূত-পবিত্র?

তবে কেন সেই মহামানবকে নিজের জীবন থেকে ডিলিট করে দিয়ে সে জায়গায় ক্রুজ, ম্যাসি, শাহরুখ কিংবা রোনালদোকে বসিয়েছ?

তাঁকে কি এতটাই তুচ্ছ মনে হয় তোমার?

তুমি কি জানো না তাঁর সৌন্দর্যের কথা? মনে নেই তাঁর সুমহান চরিত্রের কথা? তাঁর মহানুভবতা, উদারতা, বদান্যতা, বীরত্বের কথা? ভুলে গেছ কি সবই? কখনও কি তাঁর সম্পর্কে জানতেও ইচ্ছে হয় না?

ইচ্ছে না হলেও আজ বলব। বলেই ছাড়ব। বড়ো ভাই হিসেবে এটুকু জোর তো করতেই পারি।[৮১]

তবে বলি শুনো—অসাধারণ সুন্দর ছিলেন তিনি। খুব বেঁটেও ছিলেন না, আবার অস্বাভাবিক লম্বাও ছিলেন না। একেবারে পার্ফেক্ট ছিল তাঁর উচ্চতা। তাঁর চুল খুব বেশি কোঁকড়ানো না, আবার একেবারে খাড়াও ছিল না। গোলাপি আর গৌর বর্ণের মাঝামাঝি গায়ের রঙ ছিল তাঁর। সুন্দর গঠন ছিল, যা সটান সোজাও নয়, আবার ঝুঁকে পড়াও নয়। সুরমারাঙা চোখ ছিল তাঁর। ভুরু ছিল তলোয়ারের মতো। কপাল অত্যধিক মাংসলও ছিল না, আবার শুকনোও ছিল না। দুই কাঁধের মধ্যিখানে ছিল নবুওতের মোহর। বুক ছিল প্রশস্ত। হালকা চুলের রেখা ছিল বুকের ওপর থেকে নাভি পর্যন্ত। লোমশূন্য ছিল দেহের অন্যান্য অংশ। হাত পা ছিল মাংসল। পেশি ছিল চওড়া। ঘামলে তাঁর চেহারা আরও সুন্দর মনে হতো। ঘাম থেকে খুশবু বের হতো। আয়িশা ﷺ তাঁর ঘর্মাক্ত চেহারা দেখে কবিতা আবৃতি করতেন—

তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম
চমকানো মেঘ যেন চমকায় অবিরাম।

তাঁর হাতের তালুর চেয়ে অন্য কারও তালু বেশি নরম ছিল না। রেশমের চাইতে বেশি কোমল ছিল তাঁর হাত। পায়ের গোড়ালি ছিল সরু। চলার সময় স্পন্দিত ভঙ্গিতে পা তুলতেন তিনি। হাঁটলে মনে হতো যেন যমীন সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে তাঁর জন্যে। কোনো জিনিস তাঁর মতো সুন্দর ছিল না। সূর্য ঝলঝল করত চেহারায়। দূর থেকে দেখলে তাঁকে আরও উজ্জ্বল দেখাত। কাছ থেকে তাঁর মিষ্টি-মধুর ব্যক্তিত্ব অনুভব করা যেত।

---

৮১. লেখাটি লিখতে যেসব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে : বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : আম্বিয়া কিরাম, ৬/৩২৯০-৩৩০২, ৩৩০৪, ৩৩০৮-৩৩১০; মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : ফযীলত, হাদীস : ৫৮০২, ৫৮০৪-৫৮১২, ৫৮১৯, ৫৮২৫,৫৮৩৮-৫৮৪০, ৫৮৪২, ৫৮৪৫-৫৮৪৬, ৫৮৫৫-৫৮৬৩, ৫৮৬৫-৫৮৬৮, ৫৮৭৯; ইবনু কায়িম, যাদুল মাআদ, ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া; নদভি, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলি, নবীয়ে রহমত; মুবারকপুরি, শফিউর রহমান, আর রাহীকুল মাখতুম; ইবরাহীম আলি, সীরাতুন নবি; তিরমিযি, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা, শামায়িলুন নবি; আলবানি, মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন, সহীহ শামায়েলে তিরমিযি।

হঠাৎ কেউ তাঁকে দেখলে তাকিয়ে থাকত অবাক নয়নে।

তিনি উঠতে বসতে আল্লাহর স্মরণ করতেন। ইস্তিগফার করতেন। অপছন্দ করতেন সমাবেশে তাঁর জন্যে স্পেশাল জায়গা রাখাটা। মজলিসের যেখানেই জায়গা পেতেন, সেখানেই বসে যেতেন। উপস্থিত সবাইকে দেখতেন সমান চোখে। সবাই ভাবত, তিনি তাকেই বেশি মহব্বত করেন। অনর্থক কোনো কথা আলোচিত হতো না তাঁর মজলিসে। সে মজলিস হতো ইলম ও আমানতদারিতার মজলিস। সেখানে উচ্চস্বরে কথা বলতো না কেউ। মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হতো না কারও। স্থান পেত না অশালীন কোনো আলোচনা। কাউকে হুমকি-ধমকি দিয়েও কথা বলা হতো না। মজলিসে কারও প্রয়োজন দেখা দিলে তা পুরো করা হতো। ছোটো-বড়ো সবাই মতামত পেশ করার সুযোগ পেত।

সুস্পষ্ট প্রকাশভঙ্গি ছিল তাঁর। কথা খুব সংক্ষিপ্তও ছিল না, আবার দীর্ঘও ছিল না। তিনি যখন কথা বলতেন, দেখে মনে হতো যেন আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে দাঁতের ফাঁক দিয়ে। কথা বলতেন তিনি প্রাঞ্জল ভাষায়। অলঙ্কৃত ভাষা ছিল তাঁর। অল্প কথায় গভীর ভাব প্রকাশ করতে পারতেন। আরবের সব গোত্রের ভাষারীতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন তিনি। প্রত্যেক গোত্রের সাথে কথা বলতেন তাদের বাগ্‌রীতিতে। বেদুইনদের মতো দৃঢ়তাব্যঞ্জক বাচনভঙ্গি আবার শহুরে নাগরিকদের বিশুদ্ধ ভাষা, সবই ছিল তাঁর আয়ত্তাধীন।

তাঁর কথা ছিল সুস্পষ্ট। উপস্থিত লোকেরা সে কথার মর্ম বুঝতে পারত। অনর্থক এদিক-সেদিকের আলোচনা করতেন না কখনও। বাহুল্যবর্জন করতেন কথায়। তাঁর মুখ দিয়ে শুধু এমন কথাই বের হতো, যা কল্যাণকর। তিনি বলা শুরু করলে, সাথিরা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন; দেখে মনে হতো যেন চড়ুই বসে আছে তাঁদের মাথায়। টুঁ শব্দটিও করতেন না কেউ। সাথিদের কেউ কথা বললে তিনি পূর্ণ মনোযোগ দিতেন তাঁর দিকে। নীরব থাকতেন কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। অতিমাত্রায় প্রশংসা করতেন না কারও। কারও প্রতি রুষ্ট হলেও ধমক দিতেন না।

যে কথা শুনে তাঁর সাথিরা অবাক হতো, সে কথায় তিনিও অবাক হতেন। যে কথায় সাথিরা হাসত, সে কথায় তিনিও হাসতেন। তবে কেউ জোরে হাসত না তাঁর সামনে। তিনি নিজেও জোরে হাসেননি কখনও। মুচকি হাসিই ছিল তাঁর চিরচেনা বৈশিষ্ট্য। কেউ লম্বা করে কথা বললে তিনি বিরক্ত হতেন না। অপরিচিত কেউ অসংযমী হলে ধৈর্য হারাতেন না তিনি। কোনো প্রয়োজনে তাঁর কাছে এলে, তিনি উঠে যেতেন না

প্রয়োজন পুরো না হওয়া পর্যন্ত। কেউ কিছু চাইলে তিনি ফিরিয়ে দিতেন না খালি হাতে। কিছু না থাকলে বলতেন, 'পরে এসো'।

সর্বাধিক লাজুক ছিলেন তিনি। কারও চেহারার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন না। তাঁর লজ্জাশীলতা এত বেশি ছিল যে, সরাসরি অপ্রিয় কথা বলতেন না মুখের ওপর। কারও দোষ-ত্রুটি দেখলে তাকে অপমান করতেন না মানুষের সামনে। কবি বলেন,

লজ্জাশীল তিনি তাই দৃষ্টি নত তাঁর,

তাঁকে দেখে চোখের নজর, নত যে সবার।

তাঁর সাথে কথা বলা সম্ভব হয় তখন,

অধরে তাঁর মৃদু হাসি ফোটে যখন।

রেষারেষি থেকে তিনি ছিলেন সর্বদাই দূরে। তাঁর ক্ষমার মাত্রা এতটাই বেশি ছিল যে, তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদেরও তিনি ক্ষমা করেছেন। রক্তাক্ত করার পরেও ক্ষমা করেছেন রক্তাক্তকারীদের। নিজের স্বার্থের জন্যে প্রতিশোধ নেননি কারও কাছ থেকে। তবে কেউ আল্লাহর আইন লঙ্ঘন করলে তিনি তাকে শাস্তি দিতেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক, বিনম্র, অতুলনীয় সৌজন্যবোধের অধিকারী ও উদার স্বভাবের মানুষ। অনিচ্ছাকৃতভাবেও অশালীন কথা বলেননি তিনি। অশ্লীল কাজ করেননি কখনও। তাঁকে দুটি কাজের একটিকে বেছে নিতে বলা হলে—যদি সেটা গোনাহের কাজ না হতো—তবে তিনি সহজটিই বেছে নিতেন। ন্যায়পরায়ণতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। ছিলেন সত্যবাদী ও বিশিষ্ট আমানতদার। তাঁর শত্রু-মিত্র সকলেই এ ব্যাপারে একমত। উপাধি ছিল তাঁর 'আল-আমীন'। চিরশত্রু আবূ জাহল পর্যন্ত তাঁর সত্যবাদিতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিত। আত্মীয়তার সম্পর্ক পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন তিনি। আত্মীয়দের সাথে হৃদ্যতা ও বদান্যতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সব সময় আত্মীয়দের খোঁজখবর রাখতেন। ভালো খাবার পেলে পৌঁছে দিতেন তাদের বাড়িতে।

তিনি মন্দের বদলা মন্দ দিয়ে দিতেন না। মন্দের বিপরীতে অবলম্বন করতেন ক্ষমার নীতি। কেউ তাঁর হাত ধরলে তিনি ছাড়িয়ে নিতেন না। অপেক্ষা করতেন—কখন লোকটি নিজে থেকেই হাত ছাড়িয়ে নেয়। যে-কেউ তাঁকে দাঁড় করিয়ে কথা বলতে পারত। ছোটো ছোটো বাচ্চারা তাঁর হাত ধরে অনেকদূর নিয়ে যেত। দাস-দাসীদের

প্রতি কখনও খারাপ আচরণ করেননি তিনি। গালি দেননি কোনো দাসকে। এমনকি এ কথাও বলেননি, 'কেন তুমি এটা করলে না?' কিংবা এও বলেননি, 'কেন তুমি এটা করলে?' তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ দাসদের থেকে উন্নত ছিল না। গরিব-মিসকিনদের তিনি ভালোবাসতেন। ওঠাবসা করতেন গরিবদের সাথে। খোঁজখবর নিতেন। নিজেই ইমামতি করতেন গরিবদের জানাযায়। কিয়ামাতের দিন গরিবদের সাথে ওঠার দুআ করতেন।

তিনি সব সময় গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। অবিশ্যি সে চিন্তা আরাম আয়েশের জন্যে নয়, ক্ষমতার জন্যেও নয়। চিন্তা করতেন উম্মাহর কল্যাণের জন্যে। পানাহার দ্রব্যের সমালোচনা করতেন না তিনি। স্বল্প-দামি হাদীয়া এলেও তা গ্রহণ করতে সংকোচ বোধ করতেন না। ইশারা করতে তিনি হাতের পুরো তালু ব্যবহার করতেন। বিস্ময়ের সময় হাত উল্টোতেন। দৃষ্টি নিচু করতেন খুশি হলে। রাগান্বিত হলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। সব সময় ঐক্যবদ্ধ রাখতেন সাথিদের। সাথিদের খোঁজখবর নিতেন। কুশলাদি বিনিময় করতেন তাঁদের সাথে। সম্মান করতেন সকল গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকদের। সম্মানিত লোকদেরই নেতা মনোনীত করতেন। সাবধান থাকতেন মানুষের অনিষ্ট থেকে। মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন সব বিষয়ে। তাঁর কাছে মর্যাদার মাপকাঠি ছিল তাকওয়া। যে-কোনো পরিস্থিতির জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতেন তিনি। সত্য ও ন্যায় থেকে দূরে থাকাকে অপছন্দ করতেন। সর্বদা দূরে থাকতেন অন্যায় থেকে। কিন্তু কেউ অন্যায় করলে তার প্রতিবাদ করতেন।

তিনি ছিলেন নিরহংকার, অতি বিনয়ী। কেউ তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলে তিনি তা অপছন্দ করেছেন। রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও মাথায় মুকুট পরেননি কোনোদিন। মণিমুক্তো জমিয়ে রাখেননি ঘরে। যা হাদিয়া পেয়েছেন, সবই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছেন। কখনও ব্যাকুল হননি দামি পোশাকের জন্যে। তালি-দেওয়া জামা গায়ে দিয়েছেন। মাসের-পর-মাস আগুন জ্বলেনি তাঁর উনুনে। পুরো মাস পার করেছেন সাধারণ মানের খেজুর ও পানি খেয়ে।

তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। শত্রুরা যখন তীব্র আক্রমণ শুরু করত, তখন সাথিরা তাঁর আড়াল গ্রহণ করতেন। শত্রুর ভয় তাঁকে ভীত করেনি কভু। ময়দান থেকে কখনও পালিয়ে যাননি তিনি। কখনও বিচলিত হননি সংখ্যাধিক্যের ভয়ে। বড়ো বড়ো বাহাদুররা যখন পিছপা হতো, তখনও তিনি দৃঢ়চিত্তে সামনে এগিয়ে যেতেন। হুনাইনের যুদ্ধে তাঁর সাথিরা যখন সবাই বিক্ষিপ্ত হয়ে ছুটোছুটি শুরু করেছিল, সেদিনও তিনি ময়দানে দাঁড়িয়ে নির্ভীকের মতো বলছিলেন—আমি সত্য নবি মিথ্যা

নবি নই। আর আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।

ইনিই হলেন মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ। ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁকে বাছাই করা হয়েছে তোমার আদর্শ হিসেবে।

তুমি এমন কোন আদর্শ চাও, যা তাঁর মধ্যে নেই?

তুমি যদি একজন আল্লাহভীরু বান্দাহকে দেখতে চাও, তবে সালাতের-পর-সালাত পড়ে নিজের পদযুগল ফুলিয়ে ফেলা মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে তাকাও। যদি একজন অত্যাচারিত-উৎপীড়িত অসহায়কে দেখতে চাও, তবে তায়েফের ময়দানে পাথরের আঘাতে জর্জরিত মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে তাকাও। তুমি যদি একজন সত্যনিষ্ঠ মনিষীকে দেখতে চাও, তবে মক্কার পূত-পবিত্র আল-আমীনের দিকে তাকাও। যদি অসত্য আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কাউকে দেখতে চাও, তবে জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে চির-বিদ্রোহী মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে তাকাও।

যদি একজন আদর্শ যোদ্ধাকে দেখতে চাও, তবে বদরের সফল যোদ্ধা মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে তাকাও। যদি একজন নির্ভিক সেনানায়ককে দেখতে চাও, তবে হুনাইনের একনিষ্ঠ বীর সেনানী মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে তাকাও। যদি একজন রক্তাক্ত নির্ভিক কমান্ডারকে দেখতে চাও, তবে ওহুদের যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে তাকাও।

যদি একজন আদর্শ স্বামীকে দেখতে চাও, তবে খাদিজা رضي الله عنها কিংবা আয়িশা رضي الله عنها-এর প্রেমময় নিষ্কলুষ স্বামী মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে তাকাও। যদি একজন আদর্শ পিতাকে দেখতে চাও, তবে ফাতিমার স্নেহময় পিতা মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে তাকাও। যদি একজন আদর্শ নানাকে দেখতে চাও, তবে হাসান কিংবা হুসাইনকে মাথায় করে সালাতে দাঁড়ানো মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে তাকাও। যদি একজন আদর্শ ব্যবসায়ীকে দেখতে চাও, তবে সিরিয়া ও বসরার বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে তাকাও। যদি একজন শ্রেষ্ঠ দানবীরকে দেখতে চাও, তবে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে মাটির বিছানায় শয়নকারী মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে তাকাও।

যদি দুনিয়াবিমুখ কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে দেখতে চাও, তবে ছেড়া পোশাক গায়ে মদীনার গলিতে হেঁটে চলা মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে তাকাও। যদি একজন ন্যায়বান বিচারককে দেখতে চাও, তবে গরিব-ধনী সবার ওপর ইনসাফকারী মদীনার প্রধান বিচারপতি মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে তাকাও। যদি একজন আদর্শ সমাজ সংস্কারককে

দেখতে চাও, তবে জাহিলিয়াতের অন্ধকার থেকে মুক্ত আলোর দিকে আহ্বানকারী মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে তাকাও। যদি ঐশ্বর্য ও বৈভবমুক্ত একজন নির্লোভ নেতাকে দেখতে চাও, তবে জাজিরাতুল আরবের দীনহীন অধিপতি মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে তাকাও। যদি একজন চিরবিপ্লবীকে দেখতে চাও, তবে মদীনা নামক ক্ষুদ্র রাষ্ট্র থেকে সারা দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জকারী বিপ্লবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে তাকাও। যদি একজন সফল রাষ্ট্রনায়ককে দেখতে চাও, তবে গোত্রগত সংঘাত আর হানাহানি থেকে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার রূপকার মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে তাকাও। যদি একজন আদর্শ শিক্ষককে দেখতে চাও, তবে মসজিদে নববির মিম্বরে উপবিষ্ট গুরুগম্ভীর মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে তাকাও। যদি নিজ আদর্শের ওপর চিরঅটল কোনো ব্যক্তিত্ববান মহাপুরুষকে দেখতে চাও, তবে শত অত্যাচার সত্ত্বেও দ্বীনের ঝাণ্ডা সমুন্নতকারী নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর দিকে তাকাও।

মুহাম্মাদ ﷺ শুধু একটি নাম নয়, একটি কালজয়ী আদর্শ, একটি ইতিহাস। যিনি একদিকে সত্যের বার্তা-বাহক, আদর্শ চিন্তানায়ক, সমাজ সংস্কারক, সফল রাষ্ট্রনায়ক, সত্যদর্শী সাধক, নিষ্কলুষ মনিষী, ন্যায়বিচারক। অপরদিকে একজন একনিষ্ঠ আল্লাহভীরু বান্দা, মমতাময়ী পিতা, আদর্শ স্বামী, পরিবারের আদর্শ কর্তা। যার মধ্যে রয়েছে সর্বযুগের, সর্বকালের, সর্বজাতির মানুষের জন্যে আদর্শ।

> "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে—তাদের জন্যে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে আছে উত্তম আদর্শ।"[৮২]

আমি জানি না, এর পরেও তুমি আর কাকে নিজের আদর্শ বানাবে। কার পেছনে দৌড়ে জীবনের দামি সময়গুলো নষ্ট করবে। কাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তার লাইফ-স্টাইল অনুসরণের জন্যে পাগলপারা হবে। আমি সত্যিই জানি না।

---

৮২. সূরা আল আহযাব, (৩৩) : ২১ আয়াত।

আঁধার ছাড়ায়ে যাব হারায়ে সঙ্গে তোমায় লয়ে

"তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন দুঃখে কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। যালিমদের জন্যে কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না, যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।"

[সূরা আল-মুমিন/গাফির, (৪০) : ১৮ আয়াত]

মাঝে মধ্যে একটু কবি-কবি-ভাবের উদয় হয় হৃদয়ে। তখন দু-চার কলম লিখি। তবে নিজের কবিতা নিজের কাছেই অখাদ্য লাগে। তাই এগোতে পারি না খুব একটা। এখন বন্ধুত্ব নিয়ে দু-লাইন কবিতা মনে উঁকি দিচ্ছে। সেটা আগে শুনাই তোমাকে। ভালো না লাগলে, সে দায় কিন্তু আমার নয়।

বন্ধু তুমি জীবন-মাঝে আছ জোছনা হয়ে

আঁধার ছাড়ায়ে যাব হারায়ে সঙ্গে তোমায় লয়ে।

যদি থাকো পাশে, ভালোবেসে, রাখো বাহুডোরে

ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসব দুজন অকূলপারাবারে

আমার এক কলেজবন্ধুর কাহিনি তোমায় বলি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজে একই সেকশানে পড়তাম দুজন। আমাদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। অবিশ্যি সেটা দুনিয়ার জন্যে নয়, দ্বীনের জন্যে। ও ছিল সম্ভ্রান্ত পরিবারের এবং খুবই ধার্মিক। কলেজজীবনে ওই একটা ছেলেকেই আমি জুব্বা পরতে দেখেছি। জুব্বা পরার জন্যে আংকেলের সাথে রীতিমতো ঝগড়া হতো ওর। একবার আংকেল কোনো এক কলিগের বিয়েতে ওকে সাথে নিতে চাইল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবাকে খুশি করানোর জন্যে রাজি হলো সে। আংকেলও বেশ খুশি। কিন্তু গণ্ডগোলটা বাঁধল জুব্বা নিয়ে। সে জুব্বা পরে বাবার সাথে যাবে বলে ঠিক করল। কিন্তু আংকেল এই পোশকে ছেলেকে নিতে নারাজ। ভদ্র সমাজে যে এ পোশাক বড়োই বেমানান! বন্ধুটি নাছোড়বান্দা। সে বলল, 'আমাকে নিতে হলে এই পোশাকেই নিতে হবে। নয়তো আমি যাব না।' শেষমেশ পিতৃস্নেহের কাছে রাগ পরাজিত হলো।

ও আর আমি থাকতাম একই মহল্লায়। আমি থাকতাম মেসে, ও বাসায়। সালাত পড়তাম একই মাসজিদে। খুব কমই ওকে জামাআত ছাড়া সালাত পড়তে দেখেছি।

বিলাসিতার মধ্যে বেড়ে ওঠার পরও দ্বীনের ভালোবাসায় সব ছেড়ে দিয়েছিল ও। ওকে দেখলে দ্বীনের ওপর চলার স্পৃহা বেড়ে যেত আমার।

ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর ফোনে অনেক দিন কথা হয়নি ওর সাথে। অবিশ্যি মাঝে মধ্যে ফেইসবুকে যোগাযোগ হতো। বছর খানিক পর একজন ওর একটা ছবি পাঠাল আমার মেসেঞ্জারে। ছবিটা দেখে তো আমি অবাক। হায় হায়, বলে কী! এটা কি সে বন্ধুর ছবি! আমি কোনোভাবেই নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না। রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল ওর দাড়িবিহীন স্টাইলিস্ট ছবিটি। ফোনে কথা বলার ট্রাই করেছিলাম সাথে সাথেই, সে ফোন ধরেনি। কিছুদিন পর সরাসরি দেখা করতে যাই তার সাথে—ওর মেডিক্যালে। হুট করে হাজির হয়েছি বলে এড়িয়ে যেতে পারেনি। অনেকক্ষণ কথা হয় তার সাথে। আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু তেমন ফায়দা হলো না। ফিরে এলাম বুকভরা কষ্ট নিয়ে। ফেরার পথে একটি কাহিনি আমাকে বারবার নাড়া দিচ্ছিল। কাহিনিটা নবি ﷺ-এর সময়কার। আমি সে কাহিনিটা একটু বলে নিতে চাচ্ছি।

নবি ﷺ-এর সময়ে আবূ মুআইত নামে একটা লোক ছিল। মক্কার অন্যান্য মুশরিকদের তুলনায় সে ছিল কিছুটা কোমল স্বভাবের। কুরাইশরা যখন কষ্টের-পর-কষ্ট দিয়ে নবিজিকে জর্জরিত করে ফেলেছিল, তখনও আবূ মুআইত তা থেকে বিরত রেখেছিল নিজেকে। ও মাঝে মধ্যে যাতায়াত করত নবিজির পাঠচক্রে। নবি ﷺ কী বলেন, সেটা বোঝার চেষ্টা করত। নবিজির কথা শুনতে শুনতে কেমন জানি একটা পরিবর্তন দেখা দিলো তার মধ্যে। ইসলামের প্রতি দুর্বল হলো তার মন। আর এ জন্যে কুরাইশরা তাকে বে-দ্বীন বলে গালি দিতে লাগল। কিন্তু আবূ মুআইত তাদের কথায় কর্ণপাত করল না।

মক্কায় তার এক প্রিয় বন্ধু ছিল। দুজনের মধ্যে ছিল গলায় গলায় ভাব। সে বন্ধুটি ব্যাবসার কাজে গিয়েছিল সিরিয়ায়। মাসখানিক পর ফিরে এসে তার স্ত্রীর কাছে নবিজির সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইল। তার স্ত্রী বলল, 'মুহাম্মাদের অবস্থান তো আগের চেয়েও আরও বেশি মজবুত হয়েছে।' এবার সে স্ত্রীকে আবূ মুআইতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। তার স্ত্রী বলল, 'আবূ মুআইত তো বে-দ্বীন হয়ে গেছে।'

স্ত্রীর কথায় প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো সে। আমার বন্ধুও কিনা শেষমেশ মুহাম্মাদের পাল্লায় পড়েছে! নাহ, এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। যে করেই হোক বন্ধুকে ফেরাতে হবে। রাতে ভালো ঘুম হলো না তার। সকাল হতে-না-হতেই সে আবূ মুয়াইতের

বাসায় হাজির। অনেকদিন পর প্রিয় বন্ধুর সাক্ষাৎ পেয়ে আবূ মুআইত তো খুশিতে আত্মহারা। বন্ধুকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাল সে, কিন্তু অভিনন্দনের কোনো জবাব এল না। আবূ মুআইত জিজ্ঞেস করল, 'বন্ধু! তোমার কী হয়েছে! অভিনন্দনের জবাব দিলে না যে?'

সে বলল, 'কীভাবে তোমার কথার জবাব দেবো। তুমি তো মুহাম্মাদের দ্বীন গ্রহণ করে বে-দ্বীন হয়ে গেছ!'

বন্ধুর কথা শুনে ঘাবড়ে গেল আবূ মুআইত। তাকে শান্ত করার জন্যে বলল, 'আচ্ছা দোস্ত, কী করলে তুমি খুশি হবে?'

বন্ধুটি মনে মনে যে ফন্দি এঁটেছিল, এবার সেটা তুলে ধরল। সে বলল, 'তুমি মুহাম্মাদের সামনে গিয়ে তার মুখে থুথু দেবে, আর তোমার জানা সবচেয়ে খারাপ একটা গালি শুনিয়ে দেবে। পারবে? যদি পারো, তবেই বুঝব তুমি আমায় ভালোবাসো।'

বন্ধুকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আবূ মুআইত সত্যি সত্যিই সে জঘন্য কাজটি করে বসল। নবি ﷺ তাকে কিছু বললেন না। যে আবূ মুআইতের বক্ষ ইসলামের জন্যে প্রশস্ত হতে শুরু করেছিল, সে-ই এমন ঘৃণ্য কাজ করল। এই পাপিষ্ঠটি বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের হাতে বন্দি হয়। নবিজির মুখে থুথু দেওয়ার অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়।[৮৩]

আবূ মুআইতের অবস্থা কেন এমন হয়েছিল?

বন্ধুর কারণে।

হ্যাঁ, খারাপ বন্ধুর কারণে।

সে তার ওই মুশরিক বন্ধুকে খুব ভালোবাসত। বন্ধুর কথা রাখতে গিয়ে নবি ﷺ-এর মুখে থুথু দেয়। শেষমেশ মুশরিক অবস্থায় বিদেয় নেয় দুনিয়া থেকে।

আবূ মুআইতের সাথে আমার বন্ধুর ঘটনা যেন হুবহু মিলে গিয়েছিল। সেকেন্ড ইয়ার থেকে কিছু খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশতে আরম্ভ করেছিল ও। আসলে খারাপ না বলে জাহিল বললে বুঝতে সুবিধে হবে। জাহিল বলতে যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধের তোয়াক্কা করে না, তাদের বোঝাচ্ছি আরকি! ও যে মেডিক্যালে ভর্তি হয়েছিল, সেখানকার দ্বীনি বন্ধুদের সাথে না মিশে জাহিলদের সাথে সখ্যতা গড়তে শুরু করেছিল। ব্যস, কেল্লা ফতে। আজ একটু, কাল একটু—এভাবে দূরে সরতে

৮৩. ইবরাহীম আলি, সীরাতুন নবি ﷺ, ১/১৬৬।

সরতে—আজ অনেকটা দূর সরে গেছে। এখন পুরোই জাহিলি জীবনের দিকে ফিরে গেছে।

কথায় আছে—'সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে'। জীবন চলার পথে যারা সঙ্গী হয়, আমাদের লাইফস্টাইলে তারা অনেক বড়ো ইফেক্ট ফেলে। আমি অনেক ছেলেকে দেখেছি, যারা স্কুল লাইফে খুব ভদ্র ও লাজুক ছিল। হিরোইন কিংবা ইয়াবা তো দূরের কথা, সিগারেটের ধোঁয়াতেও তাদের মাথা ধরত। কিন্তু কলেজ লাইফে এসে এই ছেলেগুলোই দিব্যি পার্কের কোনায় বসে ইয়াবা খেত। ছেলেগুলো নেশার পথ ধরে বন্ধুত্বের সম্পর্কের কারণে। যেসব বন্ধুদের সাথে ওরা চলাফেরা করে, তারা নেশায় আসক্ত। আজ একটু কাল একটু—এভাবে করে সেও নেশায় আসক্ত হয়ে যায়। এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম ছোটোবেলায়। অ্যাডটির কিছু ডায়লগ এখনও মনে আছে। সেখানে বলা হতো—'ছোটো খোকা বড়ো হও, বড়ো হবি না? এক টানে দুই টানে কিছু হয় না... ।' এভাবে আস্তে আস্তে একটা ভদ্র ছেলে নাম লেখায় মাদকাসক্তদের দলে। আজ একটান সিগারেট, কাল একটু ফেনসিডিল, পরশু একটা ইয়াবা—এভাবেই মানুষ ড্রাগ অ্যাডিক্টেড হয়। তাই বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্ক থাকা উচিত।

"মানুষ তার বন্ধুর রীতি-নীতির অনুসারী হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের খেয়াল রাখা উচিত—কার সাথে বন্ধুত্ব করছ।"[৮৪]

এতক্ষণ অনেক প্যাঁচাল পারলাম। এবার তোমার কথায় আসি। তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করি, ইদানীং কাদের সাথে চলো—তো কী জবাব আসবে?

আমি জানি, এই প্রশ্নের জবাব কী হবে। তোমার বন্ধুদের দেখলেই তো কেমন জানি একটা 'বাবাখোর' চেহারা ভেসে ওঠে। ওই ছেলেগুলোকে আমি সারাদিন গার্লস স্কুলের গেটের কাছে আড্ডা দিতে দেখি। সত্যিই, তুমি বাছবিচার না করেই বন্ধু বানিয়েছ। তুমি যত ভালোই হও না কেন—তোমার বন্ধু যদি খারাপ থাকে—তবে তার প্রভাব তোমার ওপরেও পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। তাই বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করাটা জরুরি। নবি ﷺ যার-তার সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন। বন্ধু বানানোর আগে যাচাই-বাছাই করতে বলেছেন।

---

৮৪. আবু দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায় : আদব, হাদীস : ৪৭৫৮; তিরমিযি, আস-সুনান, অধ্যায় : সংসারের প্রতি অনাসক্তি, হাদীস : ২৩৮১, নাবাবি, রিয়াদুস সালিহীন, অধ্যায় : বিবিধ, হাদীস : ৩৭১।

> "তুমি মুমিন ছাড়া অন্য কারও সঙ্গী হোয়ো না।"[৮৫]

কথাটা একটু ভালো করে লক্ষ করো। যে বন্ধুটা সারাদিন পপ সং কিংবা র‍্যাপ সং নিয়ে পড়ে থাকে—সে কখনোই গানের বিরুদ্ধে কথা বলবে না। যে বন্ধুটা গার্লফ্রেন্ডের সাথে অশ্লীল চ্যাট করে, সে কখনোই জিনা থেকে বেঁচে থাকতে বলবে না। যে বন্ধুটা মুভি কিংবা খেলাধুলোতে মত্ত হয়ে থাকে, সে কখনোই এসব জিনিসের সাইড ইফেক্ট নিয়ে কথা বলবে না। কোনো নেশাখোর ছেলে কি তোমায় নেশার অপকারিতার কথা জানাবে?

জানাবে না।

চলার পথে যদি এমন কোনো সঙ্গী মিলে যায়—যে দুনিয়ার তুলনায় আখিরাতকে তুচ্ছ মনে করে, সালাত-সাওম-যিকির-ঈদকে নামসর্বস্ব ইবাদাত মনে করে, গুরুত্বহীন মনে করে আল্লাহর বিধানকে, আল্লাহর দ্বীনকে মনে করে খেল-তামাশার বস্তু—তবে তাকে এভোয়েড করো। তার থেকে দূরে থাকো।

> "যারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তু বানিয়েছে আর পার্থিব জীবন যাদের প্রতারিত করেছে, তুমি তাদেরকে বর্জন করে চলবে।"[৮৬]

তুমি এ কথাগুলো জানো। তবুও কেন যে ওসব করো, আমি বুঝি না।

কেন তাদের সাথে টাইম ওয়েস্ট করো, যারা নবিজির সুন্নাহকে ব্যাকডেইটেট মনে করে?

কেন তাদের নিয়ে আড্ডাবাজি করো, যারা প্রতিনিয়ত হারামের সাগরে ডুবে থাকে?

কেন তাদের মত হতে চেষ্টা করো, যারা তাদের রবকেই ভুলে গেছে?

> "তোমরা তাদের মতো হোয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহও তাদের আত্মভোলা করে দিয়েছেন। এরাই তো পাপাচারী।"[৮৭]

আমি সবচেয়ে বেশি অবাক হই কখন জানো?

যখন কোনো অমুসলিমের সাথে গলায় গলায় ভাব জমিয়ে ওদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে

---

৮৫. তিরমিযি, আস-সুনান, অধ্যায় : সংসারের প্রতি অনাসক্তি, হাদীস : ২৩৯৮।

৮৬. সূরা আল-আনআম, (০৬) : ৭০ আয়াত।

৮৭. সূরা আল-আনআম, (৫৯) : ১৯ আয়াত।

ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে অংশগ্রহণ করতে দেখি—তখন আমি অবাক হই। বড্ড বেশি অবাক হই। তোমার কি জানা নেই, তোমার রব তাদেরকে বন্ধু বানাতে নিষেধ করেছেন?

> "হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কোরো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। আল্লাহ যালিমদের সংপথে পরিচালিত করেন না।"[৮৮]

কেন আল্লাহ ﷻ অমুসলিমদের বন্ধু বানাতে নিষেধ করেছেন, জানো?

একজন অমুসলিম কখনোই দ্বীনবিরোধী কাজে তোমায় বাধা দেবে না। তার সাথে আড্ডার-পর-আড্ডা দিয়ে সালাত মিস করলেও সে বলবে না—'দোস্ত, সালাতের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। যা, আগে সালাত পড়ে নে। এরপর না হয় গল্প করি।' ওদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিলেও সে বলবে না—'দোস্ত, আমাদের অনুষ্ঠানে অংশ নিলে তুই মুশরিক হয়ে যাবি। প্লিজ, আর আসিস না।' ওদের ধর্মকেও সত্য মনে করলে সে বলবে না—'বন্ধু, আমাদের ধর্মকে সত্য মনে করলে তুই ইসলামের গণ্ডির বাইরে চলে যাবি।' সে চাইবে—তুমি তার মতো হয়ে যাও। সে যেভাবে তার লাইফ লিড করে, তুমিও সেভাবেই তোমার লাইফ লিড করো। সে যেমন পুজোয় নারীদের সাথে নৃত্য করে, তুমিও তেমনটাই করো। সে সেভাবে বাতিল উপাস্যের কাছে মাথা নোয়ায়, তুমিও তেমন উপাস্যের কাছেই মাথা নোয়াও। সে যেমন প্রতিনিয়ত কুফরি করে, তুমিও তেমনই কুফরি করো। যাতে তুমি আর সে সমানে সমান হয়ে যাও।

> "তারা চায়—তারা যেমন কুফরি করেছে, তোমরাও তেমন কুফরি করো। যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। কাজেই তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কোরো না।"[৮৯]

আমার কথাগুলো কি বেশি রাফ হয়ে যাচ্ছে?

কী করব বলো? আমি তো আগেই বলেছি, এগুলো বলতে আমি বাধ্য। ইসলাম যে ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করেছে—সে ব্যাপারে শিথিলতা দেখাবে—এমন সাধ্যি কার আছে?

---

৮৮. সূরা আল-মাইদাহ, (০৫) : ৫১ আয়াত।

৮৯. সূরা আন-নিসা, (০৪) : ৮৯ আয়াত।

আমি জানি, কথাগুলো শোনার পরও তুমি অনেক যুক্তি দেখিয়ে এগুলো এভোয়েড করবে। আল্লাহর হুকুমকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মুশরিকদের বগলদাবা করে ঘুরে বেড়াবে। 'মানবতাই সবচেয়ে বড়ো ধর্ম' এই স্লোগান দিয়ে ওদের সাথে আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অংশ নেবে।

আচ্ছা, তুমি কি সত্যিই আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছ?

সত্য বলে মেনে নিয়েছ আল্লাহর কিতাবকে?

নাকি ঈমানের নাম দিয়ে নিজেই নিজেকে ধোঁকা দিচ্ছ?

"তারা যদি আল্লাহ, নবি এবং তাঁর প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার ওপর ঈমান আনত, তবে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না।"[১০]

পাপাচারী, আল্লাহদ্রোহী অথবা কোনো অমুসলিমকে বন্ধু বানাবার আগে আরেকবার ভাবো। তোমার রবের বাণী শোনার পরেও কি বন্ধু নির্বাচনে তোয়াক্কা করবে না? যার-তার সাথে বন্ধুত্ব করবে? যাকে তাকে বগলদাবা করে ঘুরে বেড়াবে? সালাতের সময়গুলো নষ্ট করবে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে দিতে?

বন্ধুদের মন রাখতে গিয়ে আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দেবে?

বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে যারা আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দেবে, তাদের চেয়ে হতভাগা আর কেউ নেই। তারা দুনিয়াতে আল্লাহর অভিশাপ নিয়ে বেঁচে থাকবে। আর আখিরাতে অবমাননাকর শাস্তি পাবে।

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়—আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন। এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি।"[১১]

আচ্ছা, কেন তুমি ইয়াবাখোর ছেলেটার সাথে ঘুরে বেড়াও? কেন মেয়েবাজ ছেলেটার সাথে দিনরাত দাঁড়িয়ে থাকো গলির মোড়ে? কেন পর্ন-আসক্ত ছেলেটার সাথে সময় পেলেই চ্যাট করো মেসেঞ্জারে? কেন বিজয় দশমীর নৌকোয় চড়ো অমুসলিম ছেলেটার সাথে?

---

১০. সূরা আল-মাঈদাহ, (০৫) : ৮১ আয়াত।
১১. সূরা আল-আহযাব, (৩৩) : ৫৭ আয়াত।

ওরা তোমাকে রঙিন জগতে নিয়ে যায়, তাই? ওদের দেওয়া ফ্রি ইয়াবা খেয়ে রাত জেগে গিটারে গান তোলা যায়, তাই? ওদের দেওয়া লিংক থেকে এইচডি পর্ন দেখে সেক্স ফ্যান্টাসিতে ভোগা যায়, তাই? নাকি ওদের সাথে পুজোয় গিয়ে সুন্দরী মেয়েদের দেখে জিভের জল ফেলা যায়, তাই?

কথাগুলো তোমার কাছে বাজে লাগতে পারে। কিন্তু আমি তো অবাস্তব কিছু বলিনি! আমার চোখে এমনটা পড়েছে বলেই বলছি। আমি অনেকদিন তোমায় মোড়ের চায়ের দোকানটায় বসে থাকতে দেখেছি। টি-শার্ট খুলে নাচতে দেখেছি দুর্গা পুজোয়। রঙ ছিটাতে দেখেছি হলির দিনে। পহেলা ফাল্গুনে হলদে শাড়ি পড়া কিশোরীর সাথে রিকশায় ঘুরতে দেখেছি। এই তো কালকের কথা। কাল রাতে তুমি... সেটাও আমার নজর এড়ায়নি। এগুলো কার কাছ থেকে শিখেছ? কে শিখিয়েছে এগুলো?

ওই বন্ধুগুলো, তাই না?

স্কুল লাইফে তুমি তো ভালোই ছিলে। পড়াশুনোতেও মনোযোগী ছিলে। যদ্দূর মনে পড়ে—ক্লাসে কথাবার্তাও কম বলতে। তখন তো তোমায় এতটা উশৃঙ্খল মনে হয়নি। তবে এখন কি বড়ো হয়ে গেছে? অনেক বড়ো? তাই এমনটা করছ?

তুমি কি এতটাই বড়ো হয়ে গেছ যে, আল্লাহর হুকুমকে চ্যালেঞ্জ করছ?

নবিজি ﷺ-এর সুন্নাহকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছ?

নাক সিটকাচ্ছ হুজুর দেখে?

যাদের পাল্লায় পড়ে এসব করছ, কাল তারা পাশে থাকবে তো?

> "(কিয়ামতের দিন) বন্ধু বন্ধুর খবর নেবে না। যদিও তাদেরকে পরস্পরের দৃষ্টি সীমার সামনেই রাখা হবে।"[১২]

বন্ধুদের গ্যাং আছে বলে আজ টিস্ করলে পাড়ার গরিব মেয়েটিকে। চায়ের দোকানে বসে সিগারেটের ধোঁয়া একেবারে বুড়ো মানুষটার মুখের ওপর ছাড়লে। রিকশাওয়ালার ওপর তো এমনভাবে চোখ রাঙালে, সে তোমার কাছে ভাড়াটাও চাওয়ার সাহস পেল না। যাদের কাঁধে ভর করে এসব করে বেড়াচ্ছ, কাল তারা তোমার সাথি হবে তো?

---

১২. সূরা আল-মাআরিজ, (৭০) : ১০-১৪ আয়াত।

"কাজেই আজ এখানে তার কোনো বন্ধু নেই।"[১৩]

তুমি লিটনের ফ্ল্যাটে তোমার গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে ধরা খেলে যেদিন, সেদিন তো ওরা দৌড়ে গিয়ে ছাড়িয়ে এনেছিল তোমায়। মনে আছে? একসাথে দশ বাইকে চেপে ওরা ছুটে গিয়েছিল তোমাকে বাঁচাতে। আজ তুমি বিপদে পড়লে তাদের পৌঁছতে হয়তো সময় লাগে না; কিন্তু কাল যখন বিপদে পড়বে তখন তারা আসবে তো?

"সেদিন বন্ধু বন্ধুর কোনো উপকারে আসবে না, আর তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।"[১৪]

যাদের সাথে গলায় গলায় ভাব জমিয়েছ, কাল তো তারাই তোমাকে দেখলে দৌড়ে পালাবে। যারা ড্রাগের টাকা ম্যানেজ করে দিচ্ছে, কাল তারাই দেখেও না-দেখার ভান করবে। আজ যারা তোমার বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, কাল তারাই তোমার শত্রুতে পরিণত হবে। হ্যাঁ, এমনটাই হবে।

"বন্ধুরা সেদিন হয়ে যাবে একে অপরের দুশমন, তবে মুত্তাকীরা ছাড়া।"[১৫]

বিশ্বাস হলো তো এবার?

জানি, মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এমনটাই যে হবে। ওসব বন্ধুরা শত্রুতে পরিণত হবে। আজ তাদের টাকা-পয়সা আছে, ক্ষমতা আছে, পেছনে কোনো বড়ো ভাই আছে—তাই তোমার জন্যে দৌড়ে আসছে। কিন্তু কাল তো ওসব তুলোর মতো উড়ে যাবে। তখন কী হবে? আল্লাহর মোকাবিলায় তারা তোমার কোন উপকারে আসবে শুনি?

"আল্লাহর মোকাবিলায় তারা তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না। যালিমরা একে অপরের বন্ধু, আর আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু।"[১৬]

এসব দৃশ্য দেখার পর সেদিন তোমার অবস্থা কী হবে?

সেদিনের চরম মুহূর্তে যালিমের হুঁশ থাকবে না। যখন সে দেখবে—যাদের জন্যে

---

১৩. সূরা আল-হাক্কাহ, (৬৯) : ৩৫ আয়াত।
১৪. সূরা আদ-দুখান, (৪৪) : ৪১ আয়াত।
১৫. সূরা আয-যুখরুফ, (৪৩) : ৬৭ আয়াত।
১৬. সূরা আল-জাসিয়া, (৪৫) : ১৯ আয়াত।

সে অপরাধ করতেও দ্বিধা করেনি, সেসব ক্লোজ ফ্রেন্ডগুলোই তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছে—তখন সে ভয়ে নিজের হাত কামড়াতে থাকবে। হ্যাঁ, কামড়াতে থাকবে। বিপদের মাত্রা এতটা ভয়াবহ হবে যে, নিজের হাত কামড়াতে থাকবে, টেরই পাবে না।

আমি কোন যালিমের কথা বলছি জানো?

আমি সেই যালিমের কথা বলছি, যে বন্ধুদের সাথে দিনের-পর-দিন গোনাহের সাগরে হাবুডুবু খেয়েছে, বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে অবজ্ঞা করেছে মহামহিম আল্লাহর বিধানকে, বন্ধুদের কথামতো বিসর্জন দিয়েছে নবিজির সুন্নাহকে, আর আপন করে নিয়েছে মেসি, টম ক্রুজ কিংবা হৃত্বিক রোউশানকে। সেদিন এই যালিমই নিজের হাত কামড়াতে থাকবে। নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকবে। আর আফসোস করে বলতে থাকবে—'কেন সবকিছু জানার পরও বন্ধুদের কথায় বিভ্রান্ত হলাম? হায়! আমি যদি ওদের বন্ধু না বানাতাম।'

> "অপরাধী সেদিন নিজের দু-হাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম। হায় আমার দুর্ভোগ! আমি যদি অমুককে বন্ধু না বানাতাম! আমার কাছে উপদেশ পৌঁছার পরও সে আমায় বিভ্রান্ত করেছিল।"[১৭]

দৃশ্যটা খুবই প্যাথেটিক, তাই না? একটা লোক আফসোস করতে করতে তার হাত দুটো কামড়াচ্ছে, আর নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে। নিজেকে কতটা অপরাধী মনে হলে পরে কেউ এমনটা করতে পারে। তুমি কি দৃশ্যটা একটু মনে মনে কল্পনা করবে? প্লিজ, দু-মিনিট সময় নিয়ে একটু কল্পনা করো তো। অসহায় অবস্থায় কেউ তার হাত কামড়াচ্ছে। আর বলছে, 'আমি যদি তাকে বন্ধু না বানাতাম।'

ইশ, কী ভয়াবহ দৃশ্য! আসলে এই দৃশ্যটা উপলব্ধির বিষয়। আমি লিখে তোমাকে এটার ভয়াবহতা বোঝাতে পারব না। বিষয়টাকে তুমি এড়িয়ে যেয়ো না। এটা এড়িয়ে যাওয়ার মতো বিষয় নয়। এটা একজন অপরাধীর অবস্থা, যে খারাপ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে তার রবকে ফাঁকি দিয়েছে। বন্ধুরা ব্যাকডেইটেড বলে উপহাস করবে বলে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে অবজ্ঞা করেছে। সুন্নাহ ফলো করাকে আনস্মার্টনেস মনে করেছে।

তুমিও কি এই দলের মধ্যে আছ?

---

১৭. সূরা আল-ফুরকান, (২৫) : ২৭-২৮ আয়াত।

যদি থেকে থাকো, তো এমনটাই করবে। এখন হয়তো এগুলো খুব হালকা মনে হচ্ছে, কিন্তু বিষয়টা এতটা হালকা নয়। আজ যাদের সাথে ফুর্তি করছ, যাদের সাথে বাইকে রাস্তা কাঁপাচ্ছ, যাদের নিয়ে সেন্ট মার্টিন ট্যুরে যাচ্ছ—তারা কেউই তোমার খবর নেবে না। তুমি তখন নিজের হাত কামড়াতে কামড়াতে আফসোফ করবে।

ওরা তোমাকে আনস্মার্ট বলবে ভেবে রাসূল ﷺ-এর কত সুন্নাহকেই-না অবজ্ঞা করো। দাড়ি-টুপি-লম্বা জামাকে সেকেলে বলে নাক সিটকাও! ওকে, করতে থাকো। যত পারো নাক সিকটাতে থাকো। একদিন এসব নাক সিটকানো তোমার আফসোসের কারণ হবে।

'আমি কি তা হলে কারও সাথেই বন্ধুত্ব করব না? ঘরে বসে থাকব চুড়ি পরে?'—তুমি কি এমন কথা ভাবছ?

ভাই আমার! ভুল বুঝো না। আগেই তো বলেছি, আমি চাই না তুমি সন্ন্যাসী হও। সব বাদ দিয়ে ঘরের কোণে যৌবন কাটিয়ে দাও। বন্ধুর প্রয়োজনীয়তা পাগল ছাড়া কেউ অস্বীকার করবে না। আমি চাই না, সব বন্ধু ছেড়ে দিয়ে একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে যাও। চুড়ি পড়ে ঘরে বসে থাকো। বিশ্বাস করো, আমি এমনটা চাই না। আমি কী চাই জানো?

আমি চাই, তুমি সবথেকে উত্তম বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব করো। যে তোমাকে কখনও ছেড়ে যাবে না। তোমাকে কখনও কষ্ট দেবে না। আমার চাওয়া এতটুকুই।

আমি কি তোমায় সেই বন্ধুর পরিচয় বলব?

নাহ, থাক। এটা আমি বলব না।

এমনিই তুমি আমার ওপর রেগে আছ। আর রাগাতে চাই না। চলো, এ প্রশ্নটা আমাদের রবের কাছে জিজ্ঞেস করি—'হে আমাদের রব! সত্যিকার অর্থে কে আমাদের বন্ধু? কে আমাদের সাহায্যকারী?'

> "আল্লাহ ছাড়া তোমাদের না আছে কোনো বন্ধু, আর না আছে কোনো সাহায্যকারী।"[১৮]

আল্লাহ ﷻ ছাড়া কে আছে, যে তোমাকে নিরাপত্তা দেবে? আল্লাহ ﷻ ছাড়া কে

১৮. সূরা আত-তাওবা, (০৯) : ১১৬ আয়াত।

আছে, যে তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে? আল্লাহ ﷻ ছাড়া কে আছে, যে তোমার দুঃখগুলো দূর করবে? যেদিন দুনিয়ার বন্ধুরা একে অন্যের অচেনা হয়ে যাবে (মুত্তাকীরা ছাড়া) সেদিন আল্লাহর বন্ধুরা নির্ভয়ে-নিশ্চিন্তে সময় কাটাবে।

> "জেনে রাখো—আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই, আর তারা দুঃখিতও হবে না।"[৯৯]

তুমি একাকী সময়গুলো তাঁর সাথে কাটাও। নিজের চাওয়াগুলো পেশ করো তাঁর সামনে। তাঁর কাছে খুলে বলো তোমার দুঃখের কথাগুলো। মনের কষ্টগুলো সালাতের মাধ্যমে পেশ করো তার সামনে। নবিজির রেখে যাওয়া সুন্নাহর সাথে। বন্ধুত্ব করো তাদের সাথে, যাদেরকে দেখলে রবের কথা স্মরণ হয়। যাদের জিহ্বা সর্বদা আর্দ্র থাকে আল্লাহর যিকিরে। যারা মহিমান্বিত রবের সামনে অবনত হয় সালাতের মাধ্যমে।

> "তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ; যারা সালাত কায়িম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহর কাছে অবনত হয়।"[১০০]

আচ্ছা, তুমি কি পারবে না ওই দুষ্ট ছেলেগুলোর সঙ্গ ত্যাগ করতে?

পারবে না, নবিজির সুন্নাহকে সার্বক্ষণিক সঙ্গী বানাতে?

মুমিনদের চলার সাথি বানাতে?

ভাই আমার! এই দুঃসহ জীবন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে, পরকালীন সুখের জন্যে তুমি কি এইটুকুও করতে পারবে না?

আমি জানি, তুমি পারবে। আমি তো আমার ভাইকে চিনি। আমার ভাই অবশ্যই পারবে। আমি জানি, আজকের পর তুমি মিশবে না আর ওদের সাথে। অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাবে না ওদেরকে। মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করবে না ওদের পেছনে। চলো, এখনই আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই। মন-খুলে দুআ করি। সেই দুআটিই করি, যেটি আল্লাহর নবি দাউদ ﷺ করেছিলেন :

> "হে রব আমার! আমি তোমার নিকট এমন সঙ্গী চাই—তোমাকে স্মরণ করলে যে আমায় সাহায্য করবে। আর তোমাকে ভুলে গেলে যে আমায় (তোমার কথা)

---

৯৯. সূরা ইউনুস, (১০) : ৬২ আয়াত।
১০০. সূরা আল-মাইদাহ, (০৫) : ৫৫ আয়াত।

স্মরণ করিয়ে দেবে। হে রব আমার! আমি তোমার নিকট এমন সঙ্গী থেকে আশ্রয় চাই—তোমাকে স্মরণ করলে যে আমায় সাহায্য করবে না। আর তোমাকে ভুলে গেলে যে আমায় (তোমার কথা) স্মরণ করিয়েও দেবে না।"[১০১]

১০১. আহমাদ ইবনু হাম্বাল, কিতাব আয-যুহদ (অনুবাদ : রাসূলের চোখে দুনিয়া), পৃষ্ঠা : ১৭৫।

অধ্যায়

৮

তবুও তো অনেক দেরি হয়ে যাবে

"তোমরা এগিয়ে যাও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের তরে, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের মতো। আর তা প্রস্তুত করা হয়েছে—যারা আল্লাহ ও তার রাসূলদের প্রতি ঈমান আনে তাদের জন্যে। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছে তা দান করেন। আল্লাহ বড়োই অনুগ্রহশীল।"

[সূরা আল-হাদীদ, (৫৭) : ২১ আয়াত]

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর এক বইতে বলেছিলেন—'মৃতদেহ নিয়ে যে গাড়ি যায়, সেই গাড়ির দিকে সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে তাকায়। গাড়িতে একটা লাল নিশান উড়ে। লাল নিশান মানেই শব বহনকারী গাড়ি। তবে সবাই আগ্রহ নিয়ে তাকালেও মৃতদেহের মুখ কেউ দেখতে চায় না। মৃতদেহ নিয়ে যারা যাচ্ছে, তাদেরকে দেখতে চায়। মৃত মানুষ দেখে কী হবে? মৃত মানুষের কোনো গল্প থাকে না। মানুষ গল্প চায়।'

সত্যিই, আমরা গল্প খুব পছন্দ করি। তাই জীবনের অনেকটা সময় অনর্থক গল্পগুজবের পেছনে কাটাই। যেসব গল্পে আমার জন্যে শিক্ষণীয় কিছুই নেই, বাদ দিই না সেগুলোও। যেসব গল্প সুড়সুড়ি দেয়, সেগুলোও এড়িয়ে যাই না। অথচ এমন অনেক গল্পই আছে, যা আমার হিদায়াতের কারণ হতে পারে, আমাকে আমার রবের নিকটবর্তী করে দিতে পারে।

তোমায় একটি শিক্ষণীয় গল্প বলি। তবে গল্পটা নিজের কল্পনা থেকে বানানো নয়, সত্যি গল্প, যেটা রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন।[১০২] গল্পটা সে সময়ের, যখন বিচারের মাঠ কায়েম হবে। একে একে বিচার হবে সব বান্দাদের। আর বিচারক হবেন আহকামুল হাকিমীন—আল্লাহ। স্থাপন করা হবে মিজান। মানুষের নেক ও বদ আমলকে ওজন করা হবে মিজানের পাল্লায়। যার নেকির পাল্লা ভারী হবে, সে হবে সফল। আর যার নেকির পাল্লা হালকা হবে, সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। এভাবে সব বান্দাদের বিচার শেষ হবে। জান্নাতীরা জান্নাতে চলে যাবে, আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে। এরপর আর কাউকে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হবে না, জাহান্নাম থেকে মুক্তিও দেওয়া হবে না।

একজন লোক জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যিখানে থেকে যাবে। তার চেহারা থাকবে জাহান্নামের দিকে, আর পিঠ থাকবে জান্নাতের দিকে। জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুন তার চেহারাকে ঝলসে দিবে। যন্ত্রণায় সে চিৎকার দিয়ে উঠবে। তার ঝলসানো চেহারা

---

১০২. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : আযান, হাদীস : ৭৬৯, মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : সর্বনিম্ন মর্যাদার জান্নাতবাসী, হাদীস : ৩৫৭-৩৭০।

ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আগুনের উত্তাপে তা আবার ঝলসে যাবে। এভাবে চলতে থাকবে। আগুনের উত্তাপ না সইতে পেরে লোকটি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বসবে। সে বলবে, 'হে রব আমার! জাহান্নাম হতে আমার চেহারা ফিরিয়ে দিন। এর দূষিত হাওয়া আমাকে বিষিয়ে তুলছে। এর লেলিহান শিখা আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।'

এভাবে সে বলতেই থাকবে, বলতেই থাকবে। আল্লাহ ﷻ তার ডাকে সাড়া দেবেন। তিনি লোকটিকে বলবেন, 'তোমার নিবেদন গ্রহণ করা হলে এ ছাড়া আর কিছু চাইবে না তো?'

আল্লাহর কথা শুনে লোকটি খুশি হয়ে যাবে। সাথে সাথে বলে উঠবে, 'না, আপনার ইজ্জতের শপথ! আমি আর কিছুই চাইব না।'

এই ওয়াদা দেওয়ার পর তার চেহারা ঘুরিয়ে দেওয়া হবে জান্নাতের দিকে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে সে। লোকটি যখন জান্নাতের দিকে তাকাবে, তখন জান্নাতের অপার সৌন্দর্য তার সামনে ভেসে উঠবে। জান্নাতের নয়নাভিরাম দৃশ্য তাকে আকৃষ্ট করবে। তার মনটা জান্নাতের দিকে ঝুঁকে যাবে। সে চাইবে মহামহিম আল্লাহকে কিছু বলতে, কিন্তু তার ওয়াদা তাকে বলতে বাধা দেবে।

এমন কিছু চাহিদা আছে, যা চাইলেও দমন করে রাখা যায় না। জান্নাতের চাহিদা কি সে ধরনের চাহিদার চাইতেও বেশি নয়?

আমাদের উদ্দেশ্যই তো জান্নাত। সে জন্যেই আমরা দুনিয়ায় এসেছি। সে জন্যেই এত কষ্ট করে যাচ্ছি। অন্যের টিটকারি, উপহাস চোখ বুজে সয়ে নিচ্ছি। তাই তো লোকটি আর চুপ করে থাকতে পারবে না। তার অন্তরে তোলপাড় শুরু হয়ে যাবে। সে বলে উঠবে, 'হে রব আমার! আপনি আমাকে জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছে দিন।'

আল্লাহ ﷻ তাকে পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে বলবেন, 'তুমি পূর্বে যা চেয়েছিলে তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না—এই বলে তুমি কি অঙ্গীকার আর প্রতিশ্রুতি দাওনি?'

আল্লাহ ﷻ–এর কথা শুনে লোকটি চুপ হয়ে যাবে। কিন্তু জান্নাত তাকে আকৃষ্ট করতে থাকবে। তার হৃদয় দুমড়ে-মুচড়ে যেতে থাকবে। লজ্জা ভুলে গিয়ে সে বলবে, 'হে রব আমার! আমাকে আপনার সবচেয়ে হতভাগা সৃষ্টি বানাবেন না।'

আল্লাহ ﷻ তাৎক্ষণিক জবাব দেবেন, 'তোমার এ ইচ্ছে পূর্ণ করা হলে এ ছাড়া আর

কিছু চাইবে না তো?'

সে বলবে, 'না, আপনার ইজ্জতের শপথ! এ ছাড়া আমি আর কিছুই চাইবো না।'

এভাবে সে বলতেই থাকবে। আল্লাহকে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দেবে। এরপর দয়াময় আল্লাহ তাকে জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছে দেবেন।

কিন্তু জান্নাতকে বাইরে থেকে দেখেই যে ব্যক্তি সইতে পারেনি, জান্নাতের অভ্যন্তরীণ নিয়ামাত দেখে সে কীভাবে চুপ করে থাকবে।

জান্নাতের অনাবিল সৌন্দর্য ও নির্মল পরিবেশ দেখে ঝড় বয়ে যাবে লোকটির অন্তরে। জান্নাতে প্রবেশের ইচ্ছে তার মধ্যে প্রবল হবে। কিন্তু সে পূর্বের ওয়াদার কথা মনে করে চুপ থাকবে। সে বারবার জান্নাতের দিকে তাকাবে আর ভাববে—হায়, আমিও যদি জান্নাতীদের একজন হতে পারতাম! আমিও যদি জান্নাতের নিয়ামাত ভোগ করতে পারতাম! আমিও যদি অনন্ত সুখের ভাগীদার হতে পারতাম! তার অন্তরে তোলপাড় শুরু হয়ে যাবে। একটা সময় আর নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না। চিৎকার দিয়ে বলে উঠবে, 'হে রব আমার! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন।'

লোকটির কথা শুনে মহামহিম আল্লাহ বলবেন, 'হে আদম-সন্তান! কী আশ্চর্য! তুমি কতটা ওয়াদা ভঙ্গকারী! তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না—এই বলে কি আমার সাথে অঙ্গীকার করোনি? আর প্রতিশ্রুতি দাওনি?'

সে বলবে, 'হে রব আমার! আমাকে আপনার সবচেয়ে হতভাগা সৃষ্টি বানাবেন না।'

এভাবে সে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকবে। তার কথা শুনে আল্লাহ ﷻ হেসে উঠবেন। সুবহানাল্লাহ! যে রব হাসেন, তাঁর থেকে বান্দা কল্যাণ ছাড়া আর কী আশা করতে পারে। আল্লাহ ﷻ তার প্রতি দয়া করবেন। তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেবেন। লোকটি জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর আল্লাহ ﷻ বলবেন, 'চাও।'

লোকটি একের-পর-এক তার চাওয়াগুলো পেশ করতে থাকবে। সে যা যা চাইবে, তার সবই তাকে দেওয়া হবে। এভাবে চাইতে চাইতে একসময় তার আকাঙ্ক্ষা ফুরিয়ে যাবে। আর চাওয়ার মতো কিছু খুঁজে পাবে না। তখন কী হবে জানো? স্বয়ং আল্লাহ ﷻ তাকে বিভিন্ন জিনিসের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। আর বলবেন, 'এটা চাও, ওটা চাও।'

আল্লাহু আকবার! তুমি এমন রবকে কীভাবে ভুলে যাও, যিনি তাঁর ইলম থেকে

বান্দাদেরকে সাহায্য করেন? বান্দা চাইতে চাইতে ঠিকই ক্লান্ত হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহ দিতে দিতে ক্লান্ত হন না। এমন দয়াময় রবকে কীভাবে ফাঁকি দাও? তোমার কি একটুও লজ্জা লাগে না?

এভাবে আল্লাহ ﷻ লোকটিকে স্মরণ করাতে থাকবেন, আর লোকটি চাইতে থাকবে। আল্লাহ ﷻ স্মরণ করাতে থাকবেন, আর লোকটি চাইতে থাকবে। অবশেষে আর চাওয়ার মতো কিছু থাকবে না। তখন আল্লাহ ﷻ বলবেন, 'এসব তোমার, তার সাথে আরও দশগুণ (তোমাকে দেওয়া হলো)।'

একটু ভাবো তো—আমরা যে লোকটির কাহিনি শুনছি, সে সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি। তার পরে আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করলেই যদি তাকে এত নিয়ামাত দেওয়া হয়, তা হলে যারা তারও আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের কী দেওয়া হবে? এ লোকটিই যদি তার চাওয়ার থেকে দশগুণ বেশি পায়, তা হলে তারা কতগুণ বেশি পাবে?

সুবহানাল্লাহ! জান্নাতীদের নিয়ামাত কি গুণে শেষ করা যাবে?

ভাই আমার! তুমি কি চাও না, এমন জান্নাতে প্রবেশ করতে?

তুমি কি চাও না, এই অনাবিল সুখের জায়গাতে তোমার ঠাঁই করে নিতে?

তোমার কি ইচ্ছে করে না সেই সৌভাগ্যবানদের একজন হতে, যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ মেহমানদারি করাবেন?

> "তাদের (জান্নাতীদের) গায়ে থাকবে সবুজ পাতলা রেশমি কাপড় ও নকশাকরা পুরো রেশমি কাপড়। অলংকার হিসেবে তাদের পরানো হবে রুপোর কঙ্কণ। আর তাদের প্রভু তাদেরকে বিশুদ্ধ পানীয় পান করাবেন।"[১০৩]

যদি এই লোকটির মতো বিচারকার্য শেষে তোমায় জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দেওয়া হয়, তবুও তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। তোমার আগেই অগণিত মানুষ পৌঁছে যাবে জান্নাতে। ডুবে থাকবে জান্নাতি-নিয়ামাতের সাগরে। তুমি তো পিছিয়ে পড়বে তাদের থেকে। তবে কেন সে চেষ্টা করবে না, যাতে মৃত্যুর পর পরই তোমার ঠাঁই হয় সেখানে?

---

১০৩. সূরা আল-ইনসান, (৭৬) : ২১ আয়াত।

মুশরিকরাও যাকে সত্যভাষী বলে মেনে নিয়েছিল

> "মুহাম্মাদ... মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী ছড়িয়ে দিতে যিনি সংগ্রাম করেছেন। পুরোপুরি সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করলেও তিনি সুপার হিরো হিসেবেই প্রমাণিত হন। অ্যালেকজান্ডার, ডায়োজিনিস, অ্যারিস্টটল, সেইন্ট পল ও ফ্রান্সিস—এদের সবচেয়ে সেরা গুণগুলো একত্র করেই কেবল আপনি এই মানুষটির মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন।"
>
> [বার্নাবি রজারসন, দ্য প্রফেট মুহাম্মাদ, পৃষ্ঠা : ২৩]

'সত্যবাদী যুধিষ্ঠির'। আমাদের দেশে কথাটি প্রায়ই শোনা যায়। কথায় কথায় আমরা বলে ফেলি, 'ভাব দেখে মনে হয় একেবারে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির।' ছোটোবেলায় আমি নিজেও এটা বলতাম। কথাটা আবার মনে পড়ল কিছুদিন আগে। ভাবলাম, একটু যুধিষ্ঠিরের জীবনী পড়ি। উদ্দেশ্য—যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জানা। যুধিষ্ঠিরের জীবনী পড়তে গিয়ে তো চোখ কপালে ওঠে গেল। অবিশ্যি তারও কিছু কারণ আছে। সব কারণ আজ বলব না। আজ কেবল যুধিষ্ঠিরের জন্ম সম্পর্কে কিছু বলব। *মহাভারত* সম্পর্কে তোমার আইডিয়া আছে মনে হয়। *মহাভারত* হিন্দুদের একটি ধর্মগ্রন্থ। যেখানে ধৃতরাষ্ট্রের এক শ সন্তানের সাথে পঞ্চপাণ্ডবের যুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

সেই *মহাভারত*-এর 'আদিপর্ব : অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়' মতে—একবার কিন্দম মুনি ঘুরতে যান বনে। ঘুরতে ঘুরতে দেখা পান এক হরিণীর। হরিণীর সৌন্দর্যে আকর্ষিত হয়ে হরিণের রূপ নেন তিনি। এরপর হরিণীটির সাথে মিলিত হন। ঠিক একই সময়ে পাণ্ডু মৃগয়া যাচ্ছিলেন ওই বনের পাশ দিয়ে। হরিণটিকে দেখে তাঁর খুব পছন্দ হয়। তিনি তাঁর হাতে থাকা শরটি নিক্ষেপ করেন। শরটি বিদ্ধ হয় হরিণের গায়ে। পাণ্ডু জানতেন না, হরিণটি আসলে কিন্দম। পাণ্ডুর নিক্ষিপ্ত শর যখন কিন্দমের শরীরে বিদ্ধ হয়, তখন তিনি ফিরে আসেন মানুষের রূপে। এরপর পাণ্ডুকে অভিশাপ দিয়ে বলেন, "মৃগভ্রমেই আমার উপর শর নিক্ষেপ করিয়াছ, এ নিমিত্ত তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবে না, কিন্তু সংগমসময়ে আমাকে বধ করাতে যে পাপ হইয়াছে, তাহার ফল অবশ্যই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। তুমি যে সময়ে স্ত্রীসংসর্গ করিবে, সেই সময়ে তোমার মৃত্যু হইবে। তুমি যে পত্নীর সহিত সংসর্গ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইবে, তিনি ভক্তিভাবে তোমার সহগামিনী হইবেন। হে রাজন! তুমি যেমন সুখের সময়ে আমাকে দুঃখ দিলে, সেইরূপ তোমাকেও সুখকালে দুঃখ পাইতে হইবে।"

কিন্দমের অভিশাপের ভয়ে যুধিষ্ঠিরের পিতা পাণ্ডু ও মাতা কুন্তী দুজনেই মিলন থেকে

নিজেদের দূরে রাখেন। কিন্তু সন্তান লাভের আশায় ছটফট করতে থাকে পাণ্ডুর মন। তিনি কুন্তীকে তিনজন দেবতার সাথে মিলিত হতে বলেন। প্রথমে ধর্ম দেবতার সাথে মিলিত হন কুন্তী। সেই ধর্ম দেবতার ঔরসেই যুধিষ্ঠিরের জন্ম। অবিশ্যি কিছু কিছু মহাভারত-বিশেষজ্ঞ বলেন, পাণ্ডুর ছোটোভাই ছিলেন বিদুর। তিনিই তাঁর ভাবী কুন্তির সাথে মিলিত হন। বিদুর ঔরসেই যুধিষ্ঠিরের জন্ম। এই হলো সত্যবাদী (!) যুধিষ্ঠিরের জন্ম-কাহিনি। সুযোগ পেলে অন্যদিন তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত বলব ইন শা আল্লাহ।

আমি যারপরনাই বিস্মিত হই, যখন দেখি খুব কৌশলে নবিজির সীরাত থেকে আমাদের দূরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর এ জায়গায় অন্যদের বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাসূল ﷺ যে ছিলেন সর্বাধিক সত্যবাদী, সে কথা ভুলিয়েই দেওয়া হচ্ছে। আজ তাঁর সত্যবাদীতা সম্পর্কে কিছু বলব। যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতার ইতিহাস না জানলেও চলবে। কিন্তু তাঁরটা জানতেই হবে।

১.

উম্মুল মুমিনীন[১০৪] আয়িশা রা. নবিজির সাথে সফর থেকে ফিরছিলেন। কিছুটা বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে পথিমধ্যে যাত্রাবিরতি করলেন তাঁরা। এ সময়ে আয়িশা রা. প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে চলে গেলেন কিছুটা দূরে। ফিরে এসে দেখেন গলার হার হারিয়ে গেছে। হারটি তিনি ধার এনেছিলেন তাঁর বোনের কাছ থেকে। তিনি এদিক-ওদিক খুঁজতে থাকেন হারটি। আয়িশা রা. ছিলেন অল্প-বয়স্কা। ওজন খুব বেশি ছিল না। হালকা পাতলা গড়নের ছিলেন। তাঁর হাওদা[১০৫] যারা উঠের পিঠে রেখেছিলেন তাঁরা বুঝতে পারেননি যে, ভেতরে তিনি নেই। তাই কাফেলা রওনা হয়ে যায় মদীনার পথে। তিনি এসে দেখেন সবাই চলে গেছে।

তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না কী করবেন। মনে মনে ভাবতে থাকেন, কেউ-না-কেউ অবশ্যই তাঁকে খুঁজতে আসবে। তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। অপেক্ষা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে যান। সাফওয়ান ইবনু মোয়াত্তালও পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন। আয়িশা রা.-কে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং ইন্নালিল্লাহ পড়তে থাকেন। তাঁর আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে যায় উম্মুল মুমিনীনের। সাফওয়ান আর তাঁর দিকে তাকাননি। পর্দা সহকারে উম্মুল মুমিনীন আরোহণ করেন সাফওয়ানের

১০৪. মুমিনদের মা।

১০৫. উটের পিঠে বসার আসন।

সওয়ারিতে। সাফওয়ান চুপচাপ উটের রশি ধরে এগোতে থাকেন মদীনার পথে।

তখন ছিল দুপুর। সাফওয়ান উম্মুল মুমিনীনকে নিয়ে মদীনায় পৌঁছুলে, তা আল্লাহর দুশমন আবদুল্লাহ ইবনু উবাই-এর নজরে পড়ে। অন্তরে ইসলামের প্রতি যে বিদ্বেষ ছিল, তা চাঙা হয়ে ওঠে। সে মনে মনে ভাবতে থাকে, এ-ই সুযোগ। এই নিকৃষ্ট লোকটি উম্মুল মুমিনীনের নামে অপবাদ রটাতে থাকে। সে তার চ্যালারা মিলে প্রপাগান্ডা চালায় আয়িশা ﷺ-এর বিরুদ্ধে। কিছু দিন এভাবে চলতে থাকে। আল্লাহর শত্রুরা মিলে অপবাদের পাল্লা আরও ভারী করতে থাকে। সাহাবিরা এসে ঘটনার সত্যতা জানতে চান রাসূল ﷺ-এর কাছে। কিন্তু তিনি কোনো জবাব দেননি। বেশ কদিন যাবৎ ওহি আসেনি, তাই তিনি এ ব্যাপারে নীরব থাকেন। নবি ﷺ ছিলেন মদীনার রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি চাইলে পারতেন শাস্তির ভয় দেখিয়ে আবদুল্লাহ ইবনু উবাই-সহ সব অপবাদ দানকারীদের মুখ বন্ধ করে দিতে। কিন্তু তা করেননি তিনি। অপেক্ষা করছিলেন ওহির জন্যে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ফয়সালা শোনার জন্যে।

ওদিকে সফর থেকে ফিরেই অসুস্থ হয়ে যান আয়িশা ﷺ। অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না তিনি। তবে মাঝে মাঝে ভাবতেন, নবিজি কেন তাঁর খোঁজ নিতে আসেন না? আগে তো এমনটা হয়নি। আগে অসুস্থ হওয়ার সংবাদ নবিজির কানে পৌঁছামাত্রই তিনি তাঁকে দেখতে আসতেন। তবে এবার কেন আসছেন না? তবে কি রাগ করেছেন তাঁর ওপর?

দীর্ঘ একমাস এভাবে চলে যায়। একমাস পর আয়িশা ﷺ আসল ঘটনা জানতে পারেন। ঘটনা শুনে বিস্মিত হন তিনি। চিন্তায় চিন্তায় ঘুমহীন কাটতে থাকে বেলা। অঝোরে কাঁদতে থাকেন তিনি। তাঁর কান্না শুনেও নবিজি কিছু বলছেন না দেখে, অনুমতি নিয়ে বাবার কাছে চলে যান। ওদিকে মুনাফিক ও ইয়াহূদিরা আরও সোচ্চার হতে থাকে। নবি ﷺ মাসজিদে নববিতে আসেন। পরামর্শ চান সাহাবাদের কাছে। আলি ﷺ উম্মুল মুমিনীনকে তালাক দেওয়ার পক্ষে মতামত দেন। উসামা ﷺ ও অন্যান্যরা আলি ﷺ-এর মতামতের বিরোধিতা করেন। শেষমেশ কোনো ফয়সালা ছাড়াই নবিজি মাসজিদ থেকে বেরিয়ে পড়েন।

চিন্তায় চিন্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন আয়িশা ﷺ। নবিজি কালিমা শাহাদাত পাঠ করার পর বলেন, 'হে আয়িশা! তোমার সম্পর্কে আমার কানে এ ধরনের কথা পৌঁছেছে। তুমি যদি এসব থেকে মুক্ত থাকো, তবে শীঘ্রই আল্লাহ সে কথা প্রকাশ করে দেবেন। আল্লাহ না করুন, যদি তুমি কোনো পাপ করেই থাকো তবে আল্লাহর

কাছে মাগফিরাত চাও। তাওবা করো। বান্দা যখন নিজের পাপের কথা স্বীকার করে আল্লাহর কাছে তাওবা করে, আল্লাহ সেই তাওবা কবুল করেন।'

আয়িশা ﷺ তাঁর বাবা, মা-কে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কথার জবাব দিতে বলেন। কিন্তু তাঁরা কোনো উত্তর না দিলে উম্মুল মুমিনীন বলেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি জানি, শুনতে শুনতে একথা আপনাদের মনে গেঁথে গেছে। আপনারা একথা সত্য বলেই মনে করেন। এখন যদি আমি নির্দোষ হওয়ার কথা স্বীকার করি, তা হলেও আপনারা বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যদি দোষ স্বীকার করি, তবে আপনারা সেটাই বিশ্বাস করবেন। আল্লাহ ভালোই জানেন আমি নির্দোষ। কাজেই এ অবস্থায় আমার ও আপনাদের অবস্থা হচ্ছে তেমন, যেমনটা ইউসুফ ﷺ-এর পিতা ইয়াকুব ﷺ বলেছিলেন—সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়। তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে আল্লাহই সাহায্যকারী।' এটুকু বলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়েন তিনি।

ঠিক এ সময়েই জিবরীল ﷺ আসেন ওহি নিয়ে। ওহি নাজিল হওয়ার পর নবিজি মুচকি হাসতে থাকেন। এরপর বলেন, 'হে আয়িশা! আল্লাহ তোমার নির্দোষ হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।'[১০৬]

উম্মুল মুমিনীন ছিলেন মুনাফিকদের অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। আল্লাহ ﷻ বলেন,

> "যারা এই অপবাদ রচনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল। এটাকে তোমরা তোমাদের জন্যে অনিষ্টকর মনে কোরো না। বরং এটা তো তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্যে রয়েছে তাদের পাপ কাজের ফল। এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি। এ-কথা শোনার পর মুমিন পুরুষ এবং নারীরা কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করেনি, এবং বলেনি—এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ? তাঁরা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী হাজির করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী হাজির করেনি, তাই আল্লাহর বিধান অনুসারে তারা মিথ্যাবাদী।"[১০৭]

নবি ﷺ যদি নিজ ক্ষমতাবলে আবদুল্লাহ ইবনু উবাইকে শাস্তি দিতে চাইতেন, তবে বাঁধা দেওয়ার কেউ ছিল না। আর রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ইবনু উবাইকে শাস্তি দেওয়াটাও কঠিন কিছু ছিল না তার জন্যে। কিন্তু তিনি তা করেননি। অপেক্ষা করেছেন আল্লাহর

---

১০৬. মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : তাওবা, হাদীস : ৬৭৬৫; ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কুরআনীল আযীম, ৮/৪১-৫৫।

১০৭. সূরা নূর, (২৪) : ১১-১৩ আয়াত।

ফয়সালা শোনার জন্যে। আল্লাহর ফয়সালা শোনার পর তিনি ব্যবস্থা নিয়েছেন কিন্তু মিথ্যে বা ছলনার আশ্রয় নেননি। তাঁর জায়গায় অন্য কেউ হলে কী করত?

২.

নবিজির ছেলে ইবরাহীম যেদিন মারা যান, সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়। মানুষ ভাবতে থাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পুত্র মারা যাওয়ার কারণেই সূর্যগ্রহণ হচ্ছে। অন্য কেউ হলে হয়তো এ ঘটনা থেকে ফায়দা নিতে চাইত। লোকদের কথাকে সায় দিয়ে বলত, 'হ্যাঁ, তোমরা ঠিকই বলেছ। আমার ছেলে মারা যাওয়ার জন্যেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। দেখেছ, আমি কত বড়ো বুজুর্গ! আমার শোকে প্রকৃতিও শোক প্রকাশ করে।' নবিজি এমনটা করেননি। তিনি লোকদের নিয়ে মাসজিদে যান। দীর্ঘ রুকু সিজদাহর মাধ্যমে দু-রাকাআত সালাত আদায় করেন। সালাত শেষ করে দেখেন সূর্যগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। তখন তিনি মাসজিদ থেকে বেরিয়ে খুতবাহ দেন। আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেন,

> 'সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুটো নিদর্শন। কারও জন্ম বা মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ কিংবা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে, তখন আল্লাহর কাছে দুআ করবে। তাঁর মহত্ব ঘোষণা করবে। আর সালাত আদায় করবে ও সদাকা প্রদান করবে।'[১০৮]

আচ্ছা, তাঁর জায়গায় তুমি হলে কী করতে?

৩.

মুহাম্মাদ ﷺ নবি কি না, এই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিল কুরাইশরা। তাই নযর ইবনু হারিস এবং উকবা ইবনু আবূ মুআইতকে মদীনায় পাঠাল ইয়াহূদি আলিমদের সাথে কথা বলার জন্যে। ইয়াহূদিরা ছিল আহলে কিতাব। নবিদের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা ছিল তাঁদের কিতাবে। নযর এবং উকবাহ মদীনায় পৌঁছে কথা বলল ইয়াহূদি আলিমদের সাথে। তাঁদেরকে বলল, 'আপনারা তাওরাত-গ্রন্থের অধিকারী। আপনাদের কাছে আমরা এই লোকটি (মুহাম্মাদ) সম্পর্কে জানতে এসেছি।' ইয়াহূদি আলিমরা তাদের বলল, 'তোমরা তাঁকে তিনটি প্রশ্ন করবে। যদি জবাব দিতে পারে, তবে বুঝবে সে সত্যিই নবি। আর জবাব দিতে না পারলে তাঁকে মিথ্যেবাদী মনে

---

১০৮. মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : সূর্যগ্রহণ, হাদীস : ৯৮৭।

করবে।'

ইয়াহূদিদের কথা শুনে মক্কায় ফিরে এল তারা। এসে বলল, 'হে কুরাইশরা! আমরা তোমাদের ও মুহাম্মাদের মধ্যে বিরোধ মিমাংসা করার ব্যবস্থা নিয়ে এসেছি।'

কুরাইশরা বলল, 'কী সেই ব্যবস্থা?'

তাঁরা বলল, 'ইয়াহূদি আলিমরা মুহাম্মাদকে তিনটি প্রশ্ন করতে বলেছেন। মুহাম্মাদ কী জবাব দেন, সেটাও তাদের জানাতে বলেছেন।'

কুরাইশরা ভাবল, এবার তো মুহাম্মাদকে মিথ্যেবাদী প্রমাণ করেই ছাড়ব! নবি ﷺ-এর সাথে কথা বলতে গেল তারা। গিয়ে বলল, 'তুমি নবি কি না, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আমরা তোমায় কিছু প্রশ্ন করতে চাই।' নবিজি প্রশ্ন করার অনুমতি দিলেন। ঝটপট ইয়াহূদিদের শেখানো প্রশ্ন তিনটি করে ফেলল তারা। প্রশ্নগুলো ছিল—প্রাচীনকালের সেই যুবকদের কাহিনি আমাদের শোনাও, যারা দেশ ছেড়ে দূরে চলে গিয়েছিল। সেই লোক কে, যিনি মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত সফর করেছিলেন? রুহ কী জিনিস?

তাঁদের প্রশ্ন শুনে তিনি বললেন, 'আমি আগামীকাল তোমাদের প্রশ্নের জবাব দেবো।' কিন্তু ইন শা আল্লাহ বলতে ভুলে গেলেন তিনি। বিষয়টা কতটা গুরুতর। নবিজির কাছে যদি এই প্রশ্নের উত্তর না পায়, তবে তাঁকে মিথ্যেবাদী বলবে তারা। হাসি-তামাশা করবে তাঁকে নিয়ে। চলো দেখি, এ অবস্থায় তিনি কী করেন?

পরের দিন তারা নবিজির দরবারে গেল। কিন্তু তিনি প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। নবিজি অপেক্ষা করছিলেন ওহির জন্যে। কিন্তু ওহি আসেনি। তাই উত্তর না দিয়ে চুপ থাকলেন তিনি। কুরাইশরা খুশিতে নেচে উঠল। নবিজির বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে থাকল মক্কার অলিতে-গলিতে। উপহাস করতে থাকল সাহাবিদের নিয়ে। একদিন, দুদিন নয়, গোটা পনেরো দিন। তবুও নবি ﷺ কিছু বললেন না। তিনি চাইলে বানিয়ে বানিয়ে তাঁদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন। যেহেতু এটা মান-সম্মানের প্রশ্ন। কিন্তু যিনি 'আস-সাদিক', তিনি কীভাবে মিথ্যের আশ্রয় নিতে পারেন। কীভাবে আন্দাজে ঢিল ছুড়তে পারেন। মিথ্যের আশ্রয় নেওয়া নববি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয়। তাই তিনি চোখ বুজে কুরাইশদের অত্যাচার, ঠাট্টা-মশকরা সহ্য করলেন। অবশেষে জিবরীল ﷺ প্রশ্নগুলোর জবাব নিয়ে এলেন। এরপর নবি ﷺ তাদের জবাব দিলেন।[১০১]

---

১০১. ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কুরআনীল আযীম, ৬/৪০০-৪০১।

যদিও নবিজি ছিলেন মুশরিকদের প্রধান শত্রু—যাকে ওরা প্রতিদিন অত্যাচারে জর্জরিত করেছে, যার অনুসারীদের ধরে ধরে নির্মম শাস্তি দিয়েছে; তবুও ওরা নবিজির ওপর মিথ্যেবাদীতার অপবাদ লাগাতে পারেনি।

৪.

নবি ﷺ হেঁটে যাচ্ছিলেন মক্কার গলি দিয়ে। পথিমধ্যে আবূ জাহলের সাথে তাঁর দেখা। আবূ জাহলকে দেখে তিনি বললেন, 'হে আবুল হাকাম! আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এগিয়ে আসুন। আমি আপনাকে আল্লাহর পথে আসতে আহ্বান জানাচ্ছি।'

আবূ জাহল অস্বীকার করল তাঁর দাওয়াত। কিন্তু নবিজি চলে যাওয়ার পর আবূ জাহল বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চিত জানি, সে যা বলছে তা সত্য। তবে কিছু ব্যাপার (গৌরব, মর্যাদা, ক্ষমতা ইত্যাদি) আছে, যেগুলো আমাকে তাঁর অনুসরণ করতে বাধা দিচ্ছে।'[১১০]

আবূ সুফইয়ান যখন মুশরিক ছিলেন, তখনকার ঘটনা। সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবূ সুফইয়ানের কাছে নবি ﷺ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। তিনি আবূ সুফইয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মুহাম্মাদ যেসব কথা বলে, সেসব কথা বলার আগে তোমরা তাঁকে মিথ্যে বলার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলে কি না?'

জবাবে আবূ সুফইয়ান বলেছিল, 'না।'[১১১]

ইনিই সেই নবি, যাকে মুশরিকরাও এক-বাক্যে সত্যভাষী বলে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তাঁর পরেও তাঁরা তাঁকে অনুসরণ করেনি।

ভাই আমার! তুমি তো মুশরিক নও। তোমার জন্ম তো আবূ জাহেলের ঘরে হয়নি। তা হলে কেন তাঁর সুন্নাহকে মেনে নিতে পারছ না? তুমি তো তাঁর আনীত দ্বীনের ওপর ঈমান এনেছ। নিজ মুখে ঘোষণা করেছ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।[১১২] তবুও কেন তাঁকে অনুসরণ করছ না? তুমি যদি তাঁর অনুসরণ না-ই করো, তা হলে তোমার আর মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

---

১১০. ইবনু কাসীর, বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/১২৯।
১১১. শফিউর রহমান, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃষ্ঠা : ৫২৭।
১১২. 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর নবি'

অধ্যায়

১০

স্বাধীনতার সুখ

"প্রকৃত স্বাধীনতা হলো অন্তরের স্বাধীনতা। আর দাসত্ব হলো অন্তরের দাসত্ব।"

[ইবনু তাইমিয়্যা, আল-উবুদিয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ৯০]

আমাদের বাড়ির পাশে বিশাল এক শিমুল তুলোর গাছ ছিল। অনেকগুলো টিয়ে পাখির বাসা ছিল সেখানে। বড়ো বড়ো কিছু কোটর ছিল শিমুল গাছে। টিয়েগুলো ওখানেই থাকত। চাচ্চু একবার প্ল্যান করল টিয়ে ধরার। আমি তখন খুব ছোটো। ক্লাস ফাইভে পড়ি। বেশ আগ্রহ নিয়ে টিয়ে ধরার দৃশ্য দেখছি। প্রথমে একগুচ্ছ খড় লাগানো হলো লম্বা বাঁশের মাথায়। এরপর একটি কোটর সোজা করে বসানো হলো ওই বাঁশটি। যেই টিয়ে কোটরে ঢুকল, ওমনিই সেটা বন্ধ করে দেওয়া হলো খড় লাগানো বাঁশটি দিয়ে। এরপর একজনকে গাছে তুলে দেওয়া হলো। অল্প সময় পর একটি টিয়ে সাথে করে নেমে এল লোকটি।

হাতের কাছে পাখি পেয়ে আমি তো খুশিতে আত্মহারা। খুব আগ্রহ নিয়ে আমি ওর পরিচর্যা করতে লাগলাম। টিয়ে পাখি নাকি মরিচ খেতে বেশি পছন্দ করে, তাই আব্বুকে দিয়ে লাল মরিচ কিনিয়ে আনলাম। মরিচগুলো খাওয়াতে লাগলাম খাঁচার ফাঁক দিয়ে দিয়ে। প্রথম প্রথম ও খুব ডাকাডাকি করত। কিন্তু আস্তে আস্তে কেন জানি ডাকাডাকি বন্ধ করে দিলো। যে মরিচ ছিল তার প্রিয় খাবার, সেটি খেতেও অনীহা দেখা গেল ওর মধ্যে। চাচ্চু ওর জন্যে বড়ো খাঁচার ব্যবস্থা করলেন। চাচ্চু ভেবেছিলেন—হয়তো বড়ো খাঁচা পেলে ও সব কষ্ট ভুলে যাবে। কিন্তু বড়ো খাঁচা আর লাল টকটকে মরিচ টিয়েকে সুখ দিতে পারল না। ক্রমাগত নিস্তেজ হতে লাগল টিয়েটি।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি খাঁচা খালি। আমি পুরোই থ খেয়ে গেলাম! কী ব্যাপার! টিয়ে কোথায়। দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আম্মুকে। আম্মু বললেন, ভোরে টিয়েকে মুক্ত করে দিয়েছেন। আমি কান্না শুরু করলাম। মা বোঝালেন। তিনি বললেন, পাখিরা খাঁচায় থাকতে পছন্দ করে না। খাঁচায় আটকিয়ে পাখিকে যতই আদর-যত্ন করা হোক না কেন, লাভ নেই। বন্দি খাঁচায় বসে লাল মরিচ খাওয়ার মধ্যে কোনো সুখ নেই। মুক্ত বাতাসে উড়ে বেড়ানোর মধ্যেই ওদের সুখ।

সত্যিই, মা এক বিন্দুও মিথ্যে বলেননি। ছোটোবেলায় আমরা ভাব সম্প্রসারণ পড়েছিলাম—'বন্যেরা বন্যে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।' সোনার খাঁচায়ও যদি পাখিদের আটকে রাখা হয়, তবুও ওরা তৃপ্তি অনুভব করে না। ওদের তৃপ্তি মুক্ত বাতাসে। নীল আকাশে।

রুমান সেনাপতি রুস্তমের নাম কে না জানে?

ইতিহাসে যে-কজন সাহসী যোদ্ধার নাম পাওয়া যায়, রুস্তম তাদেরই একজন। যেমন ছিল তার শক্তি, তেমন ছিল তার বীরত্ব। সেই রুস্তমের সাথে একবার যুদ্ধ হলো সাহাবিদের। ইতিহাস সে যুদ্ধকে কাদেসিয়ার যুদ্ধ নামেই চেনে। সাহাবিদের মোকাবিলা করার জন্যে রুস্তম তার বাহিনী প্রস্তুত করল। দু-বাহিনী মিলিত হলো কাদেসিয়ার প্রান্তরে। মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হলেন সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ﵁, আর পারস্যের সেনাপতিত্ব রুস্তম নিজেই গ্রহণ করল।

মুসলিমরা কেন পারস্যের মতো সুপার পাওয়ারের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছে, তাদের উদ্দেশ্য কী, পারস্যের সাথে মোকাবিলা করার মতো সাহস তারা পেল কোথায়—এসব প্রশ্নের উত্তর জানার জন্যে একজন প্রতিনিধি পাঠাতে বলল রুস্তম। রিবিয়ি ইবনু আমির ﵁ মুসলিম বাহিনীর প্রতিনিধি নিযুক্ত হলেন। হালকা পাতলা গড়নের একটি ঘোড়ায় চড়ে রুস্তমের রাজদরবারে পৌঁছুলেন তিনি। গায়ে কমদামি পোশাক দেখে রক্ষীরা তাঁকে আটকে দিলো ফটকে। তারা বলল 'তুমি কার সাথে দেখা করতে এসেছ, জানো? এই পোশাকে তোমাকে আমরা ভেতরে যাবার অনুমতি দিতে পারি না। যাও, পোশাক পাল্টে স্মার্ট হয়ে এসো।'

রিবিয়ি কর্ণপাত করলেন না তাদের কথায়। পোশাকের মধ্যে কোনো সম্মান নেই, সম্মান হলো তাকওয়ার মধ্যে—এই শিক্ষাই নবিজি তাঁদের দিয়েছেন। তাই তিনি বললেন, 'আমি স্বেচ্ছায় এখানে আসিনি। তোমাদের সেনাপতি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। যদি এভাবেই যেতে দাও তো যাব, নয়তো ফিরে যাব আমাদের শিবিরে।'

নতিস্বীকার করল দ্বাররক্ষীরা। তাঁকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হলো। তবে শর্ত হলো তলোয়ার জমা দিতে হবে। রিবিয়ি এবারও তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। রক্ষীরা পড়ল মহা-যন্ত্রণায়। এই লোকটা তাদের মুখের ওপর কথা বলছে। লোকটা কি জানে না, তারা সুপার পাওয়ার পারস্যসম্রাটের লোক? লোকটা কি জানে না, যে-কোনো সময় তার গর্দান চলে যেতে পারে? তা হলে? এত সাহস কোথায় পেয়েছে এই বেদুইন?

শেষমেশ ওরা হার মেনে নিল রিবিয়ি-র দৃঢ়তার সামনে। ঘোড়ায় চড়েই রুস্তমের দরবারে প্রবেশ করলেন তিনি। রুস্তমের লাল গালিচা ছিঁড়ে গেল ঘোড়ার খুরের আঘাতে। উপস্থিত লোকেরা অবাক হলো এই দৃশ্য দেখে। এই লোকটার আগে রুস্তমের সামনে কেউই এমনটা করতে সাহস পায়নি। রিবিয়ি যখন তলোয়ার দিয়ে কার্পেট ছিদ্র করে নিজের ঘোড়া বাঁধলেন, তখন তাদের চোখ যেন কপালে উঠে গেল। উঠবেই-বা না কেন। আজ যদি কেউ হোয়াইট হাউজে গিয়ে এমনটা করে, তো লোকজন তাকে দেখে অবাক হবে না? অবশ্যই হবে। সে সময়কার রুস্তমের রাজপ্রাসাদ আজকের হোয়াইট হাউজ থেকে কম কীসে।

রুস্তম বলল, 'আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে তোমাদের কে পাঠিয়েছে?'

রিবিয়ি নির্ভয়ে জবাব দিলেন, 'আল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে এখানে আসার নির্দেশ দিয়েছেন।'

উত্তর শুনে ভুরু কুঁচকে গেল রুস্তমের। সে বলল, 'কী উদ্দেশ্য নিয়ে তোমরা এসেছ এখানে?'

তিনি বললেন, 'আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে স্বাধীন করে এক আল্লাহর দাসত্বে নিয়োজিত করার জন্যে। সংকীর্ণ পৃথিবীর মোহ থেকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। খ্রিষ্টধর্মের অত্যাচার থেকে ন্যায় ও ইনসাফের ধর্ম ইসলামের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমরা এখানে এসেছি।'[১১৩]

রিবিয়ি-র কাহিনিটা আপাতত এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। এখন একটু অন্য প্রসঙ্গে কথা বলব আমরা। তার আগে একটা জিজ্ঞাসা—

স্বাধীনতা জিনিসটা কী?

নিজ মাতৃভূমিকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করা—তাই তো বলবে তুমি?

কিন্তু এটাকেই কি প্রকৃত স্বাধীনতা বলা যায়?

প্রকৃত স্বাধীনতা তো অন্তরের স্বাধীনতা। চিন্তার স্বাধীনতা।

আজকাল তো তুমি আটকে গেছ মানসিক দাসত্বের জালে। তোমার জীবনকে উলট-পালট করে দিচ্ছে ডাগর-চোখা কোনো ললনার বাঁকা চাহনি। তার হাসি, চুল, হাঁটার

---

১১৩. ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, উমার ইবনুল খাত্তাব, ২/২৯৭-২৯৮।

স্পন্দিত ভঙ্গি—সব মোহগ্রস্ত করে ফেলছে তোমাকে। সে হাসলে তুমি হাসো, সে কাঁদলে তুমি কাঁদো। সে যদি দাঁড়িয়ে থাকতে বলে, তো তুমি পার্কের কোণে দাঁড়িয়ে থাকো স্ট্যাচুর মতো। রাত তিনটেয় ও যদি তোমার সাথে কথা বলার শিডিউল দেয়, তবে বিছানায় ছটফট করতে থাকো ওর কলের অপেক্ষায়। ও যদি বলে আজই দেখা করতে হবে, তো ফাইনাল পরীক্ষার আগেও তুমি চলে যাও নিশির গোপন অভিসারে। যে তুমি দু-লাইনও লিখতে পারতে না ভালো করে, সে তোমার ডায়ারিটাই ভরে যায় প্রেমের কবিতা দিয়ে।

কদম ফুলের মালিকা লয়ে হাতে
বাদল-দিনে আমার প্রিয়ার সাথে
গাইব গান দুজনে বরিষে ভিজে
গগন যবে চমকিবে মেঘের তেজে

এমন কবিতাই-না চুপিচুপি লিখছিলে সেদিন?

সত্যি কথা কি জানো?

তুমি দিনে দিনে ওই মানসসুন্দরীর দাসে পরিণত হয়েছ।

কথাটা হয়তো শক্ত মনে হতে পারে। কিন্তু এইটেই বাস্তব।

ওকে ছাড়া নিজেকে কল্পনা করতে পারবে?

পারবে না। সে সাহস তোমার নেই। তোমার জীবনটা এখন তার শাসনের অধীনে পরিচালিত হয়। ওই মানবী তোমার হৃদয়রাজ্যের মনিব, আর তুমি তার আজ্ঞাবহ দাস। ইবনু তাইমিয়্যা ﵀ কিছু কথা মনে হয় তোমার জন্যেই বলেছেন,

> "যখন কারও অন্তর কোনো নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়... তার অন্তর তখন সেই নারীর খাঁচায় বন্দি হয়ে যায়। সেই নারী তার মধ্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতে শুরু করে। যেভাবে খুশি সেভাবে তার ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করতে থাকে।... সেই নারী তার ওপর এমনভাবে শাসন চালাতে থাকে, যেমনিভাবে অত্যাচারী প্রতাপশালী বাদশাহ্ তার অধীনস্থ প্রজাদের ওপর শাসন চালায়... তবে নারীর শাসন রাজার শাসনের চেয়েও ভয়াবহ। কারণ, অন্তরের বন্দিদশা দেহের বন্দিদশার থেকে গুরুতর। অন্তরের গোলামি দেহের গোলামি থেকে

বড়ো।"[১১৪]

তোমার দাসত্বের আরেকটা জগৎ আছে, যে জগতে ইসলামকে অচল মনে করো তুমি...

চট করে বোলো না আবার—না, আমি তো ইসলামকে অচল মনে করি না। প্রতি সপ্তাহে নিয়ম করে মাসজিদে যাই জুমুআর দিনে। মিলাদের জিলাপি সবার আগে নিই কাড়াকাড়ি করে। কেউ মারা গেলে জানাযার নামাজ পড়ি। তবে আমায় কেন এই অপবাদ দেওয়া হচ্ছে?

আরে ভাই, বলে শেষ করতে দাও আগে। তারপর নাহয় মন্তব্য করো।

বড়ো দাড়ি রেখে, প্যান্টটা গোড়ালির ওপরে পরে, ঢিলেঢালা পোশাক গায়ে দিয়ে বন্ধুদের সামনে যেতে পারবে তুমি?

একটু একটু লজ্জা লাগবে, তাই না?

আচ্ছা, এগুলো ছাড়ো। কাজের কথায় আসি এবার।

তুমি কি পশ্চিমা সভ্যতার ফ্যাশান-স্টাইল একেবারে চিরদিনের মতো ছেড়ে দিতে পারবে? পারবে ওদের তৈরি করা তারকাদের বাদ দিয়ে আল্লাহর নির্বাচিত তারকাদের স্টাইল অনুসরণ করতে? বুক ফুলিয়ে একথা বলতে পারবে—ইসলামে ক্যাপিটালিজম, ন্যাশনালিজমের কোনো স্থান নেই, স্থান নেই সেক্যুলারিজমের?

আমি জানি, কোনো জবাব দিতে পারবে না তুমি।

তুমি তো পশ্চিমাদের তৈরি করা আদর্শের তল্পিবাহক। ওদের তৈরি করা বাউন্ডারির বাইরে পা ফেলার সামর্থ্য নেই তোমার। তোমার মন-মগজ পুরোটাই ফিরিঙ্গিরা নিয়ন্ত্রণ করছে সুদূর দূরে বসেই। পশ্চিমা (অ) সভ্যতার চোখ ধাঁধানো আলো রঙিন করে দিয়েছে তোমার চোখকে। সে চোখ দিয়ে ইসলামের বিধি-বিধান আর জুতসই মনে হয় না তোমার কাছে। এখন কেবল নামেই মুসলিম আছ, কিন্তু মন-মগজ পুরোটাই সঁপে দিয়েছ সাদা চামড়ার ফিরিঙ্গিদের হাতে।

তুমি যে জুমুআর সালাত, জানাযা, মিলাদের কথা বললে না, ওটা ফিরিঙ্গিদের বানানো 'ইজলাম'-এর কিছু আচার-আনুষ্ঠানিকতামাত্র। তাই সেটা পালনে আপত্তি

---

১১৪. ইবনু তাইমিয়্যা, আল উবুদিয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ৮৯।

নেই তোমার। কিন্তু যদি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর নাযিল-হওয়া 'ইসলাম' তোমায় মেনে চলতে বলি, তবে তো এখনই মুখ বাঁকা করে উঠে যাবে আমার সামনে থেকে।

বিশ্বাস হচ্ছে না?

আচ্ছা, চলো টেস্ট করি তা হলে।

ফিরিঙ্গিরা বলছে : মুসলিম হওয়া ভালো। না হলেও তেমন সমস্যা নেই। মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেই যদি সৎ থাকে, ভালো কাজ করে, তো এটাই তার পারলৌকিক মুক্তির জন্যে যথেষ্ট হবে। অমুসলিমরা সবাই জাহান্নামে যাবে, এটা কেবল র‍্যাডিক্যাল মুসলিমদের ধারণামাত্র।

তুমি বলছ : একদম ঠিক। ধর্মের নামে অযথা মানুষগুলোকে ভাগ করা দরকার কী। আমি যদি মুসলিম হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিই, তো মাত্র দেড় শ কোটি মানুষকে সাথে পাব। আর যদি মানুষ বলে পরিচয় দিই, তবে তো সাড়ে সাত শ কোটিকে একসাথে পাব! এটাই ভালো। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'।

ইসলাম কী বলছে এ ব্যাপারে?

মহান আল্লাহ্ বলছেন :

> "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করবে, (সে যত ভালো কাজই করুক না কেন) আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।"[১১৫]

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলছেন :

> "আর এটা সত্য যে, জান্নাতে কেবল মুসলিমরাই প্রবেশ করতে পারবে।"[১১৬]

ওদের বুদ্ধিজীবীরা বলছে : সমকামিতা তো খারাপ কিছু না। এটা একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। পার্সোনাল ফ্রিডমের অংশ। আর কারও পার্সোনাল ফ্রিডমে হস্তক্ষেপ করাটা বেআইনি। বর্তমানে সমকামীরা একটা অপ্রেসড জনগোষ্ঠী। তাই সমকামিতার ব্যাপারে আরও লিবারেল হওয়া দরকার মুসলিমদের।

---

১১৫. সূরা আল-মাঈদাহ, (০৫) : ৭২ আয়াত।

১১৬. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : কোমল হওয়া, হাদীস : ৬০৮৪।

তুমিও ওদের সুরে সুর মিলিয়ে বলছ : হ্যাঁ, একদম ঠিক। সমকামীরা তো সমাজের কোনো ক্ষতি করছে না। আর একজন মানুষ কাউকে ক্ষতি না করে নিজের মনোমতো জীবন চালাতেই পারে। অযথাই হুজুররা এইগুলা নিয়া হাউকাউ করে।

অথচ ইসলামের বার্তাবাহক নবি মুহাম্মাদ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন :

> "তোমরা যে ব্যক্তিকে লূত-সম্প্রদায়ের মতো কুকর্মে (সমকামিতায়) লিপ্ত দেখবে, তাদের উভয়কে হত্যা করবে।"[১১৭]

ফিরিঙ্গি ফেমিনিস্টরা বলছে : নারী-পুরুষের মেলামেশার ব্যাপারে ইসলামের বিধান একেবারেই সেকেলে। ইসলাম অনেক কড়াকড়ি আরোপ করছে ফ্রি মিক্সিং বিষয়ে। একজন ম্যাচুউর ছেলে আরেকজন ম্যাচুউর মেয়ে পারস্পরিক যোগাযোগ রাখতেই পারে। বিয়ের পূর্বে নিজেদের মধ্যে ভালো একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হতেই পারে দুজনের মধ্যে। এটা তো আহামরি কোনো অপরাধ না। এ নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করে মৌলবাদীরা।

তুমি মনে মনে বলছ : আরে, এভাবে তো ভেবে দেখিনি।

অপরদিকে আল্লাহ ﷻ বলছেন :

> "মুমিন পুরুষদের বলো—তারা যেন দৃষ্টিকে অবনমিত করে, এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে... আর মুমিন নারীদের বলো—তারা যেন দৃষ্টিকে অবনমিত করে, এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে...।"[১১৮]

ওরা বলছে : মেয়েদের পুরো শরীর ঢেকে রাখতে হবে, পরপুরুষের সামনে পর্দা করতে হবে—এসব তো রক্ষণশীল সমাজের বৈশিষ্ট্য। অনেক পুরোনো ধ্যান-ধারণা এগুলো। আধুনিক মুসলিম নারীদের ওসব অবরোধপ্রথা দূরে ঠেলে প্রগতিশীলতার চর্চা করা উচিত।

তুমি বলছ : পর্দার বিধান! অফ, যেন জীবন্ত তাঁবু!

অথচ ইসলামের রব বলছেন :

---

১১৭. আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস : ৪৪৬২, তিরমিযি, আস-সুনান, হাদীস : ১৪৫৬।
১১৮. সূরা আন-নূর, (২৪) : ৩১-৩২ আয়াত।

"জাহিলি যুগের মতো (নারীরা) নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না।"[১১৯]

"হে নবি! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে ও কন্যাদেরকে এবং মুমিন নারীদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"[১২০]

ইউরোপীয় বাবুরা বলছে : কেবল ইসলামই গ্রহণযোগ্য দ্বীন আর সব বাতিল, এটা কেবল কট্টরপন্থীরাই বলতে পারে। সব ধর্মই ভালো কথা বলে। ভালো কাজের উৎসাহ দেয়। তাই যে-কোনো একটা মানলেই হলো। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক না। 'লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন'।

তুমি এ কথা শুনে 'হীরক রাজার দেশে' উপন্যাসের রাজার বাধ্যগত পুতুল কর্মচারীদের মতো 'ঠিক, ঠিক, ঠিক' বলে মাথা ঝাঁকাচ্ছ।

অথচ আল্লাহ ﷻ সাফ-সাফ জানিয়ে দিয়েছেন :

"এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"[১২১]

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন অবলম্বন করতে চাইবে, তার থেকে কিছুতেই তা গ্রহণ করা হবে না। আর আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[১২২]

আরও বলব?

নাহ থাক। নিজের কাছেই ভালো লাগছে না বলতে।

প্রতিটি উত্তর কি এটাই ইঙ্গিত করছে না—নব্য ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে গড়ে ওঠা পশ্চিমা (অ)সভ্যতার একজন তল্পিবাহক বাঙালি দাস তুমি!

আজ যদি ওরা বলে—তালি দেওয়া প্যান্টটা ওভারস্মার্টদের পোশাক; তো তালি দেওয়া প্যান্টের জন্যে তাগাদা দেবে দোকানিকে। ওদের স্টাররা ডাবল স্পাইক কাটিং

---

১১৯. সূরা আহযাব, (৩৩) : ৩৩ আয়াত।
১২০. সূরা আহযাব, (৩৩) : ৫৯ আয়াত।
১২১. সূরা আল-মায়িদাহ, (০৫) : ০৩ আয়াত।
১২২. সূরা আ ল ইমরান, (০৩) : ৮৫ আয়াত।

দেবে চুলে, তো তুমিও চুলগুলো দুপাশে খাটো করে মাঝ বরাবর ওপরের দিকে তুলে দেবে। হলিউডের নায়ক যদি বালবো-কাটিং দাড়ি রাখে, তো হুবহু সে কাটটাই নকল করবে তুমি। ওরা বলবে, বিয়েটা মধ্যযুগীয় কালচার, কিন্তু 'লিভ টুগেদার' হলো আলট্রামডার্ন। সাথে সাথে লিটনের ফ্ল্যাটে উঠে যাবে গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে। ওরা বলবে সমকামিতা স্মার্টনেস; তো দৌড়ে গিয়ে কোনো বয়ফ্রেন্ড জোগাড় করে ফেইসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে বলবে—Feeling lovely. তোমার প্রবৃত্তি যখন যেটার দিকে আকর্ষণ অনুভব করবে সেটা পাওয়ার জন্যেই ব্যকুল হবে তুমি, তাই তো? একজন আলিম খুব সুন্দর করে বলেছেন,

> "এরা আসলে আল্লাহপূজারি নয়, প্রবৃত্তিপূজারি। দুনিয়ায় যদি মূর্তিপূজার আধিক্য দেখা দেয়, তো এরা নিশ্চিতভাবে মূর্তিপূজা শুরু করবে। দুনিয়ায় যদি নগ্নতার প্রচলন দেখা দেয়, তো এরা অবশ্যই পরিধেয় বস্ত্র খুলে ফেলবে। দুনিয়ায় যদি অপবিত্র বস্তু খাওয়া শুরু হয়, তো এরা নিঃসন্দেহে অপবিত্রতাকে বলবে পবিত্রতা, আর পবিত্রতাকে অপবিত্রতা। এদের মন-মগজ হচ্ছে (পশ্চিমাদের) গোলাম, তাই এরা গোলামির জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। এদের জীবনে ফিরিঙ্গিপনার প্রাবল্য রয়েছে। এজন্যে—নিজেদের গোপন থেকে প্রকাশ্য—প্রতিটি ক্ষেত্রেই এরা ফিরিঙ্গি হতে ইচ্ছুক। আবার কাল যদি (আফ্রিকার কালো) হাবশিদের প্রাধান্য দেখা যায়, তা হলে অবশ্যই এরা হাবশি হবার প্রয়াসে নিজেদের মুখমণ্ডলে কালি মেখে নেবে। ঠোঁটগুলো মোটা করে ফেলবে। মাথার চুল হাবশিদের মতো কোঁকড়ানো করবে। এবং (পশ্চিম থেকে আগত জিনিসের মতো) হাবশিদের কাছ থেকে আগত প্রতিটি জিনিসেরও পূজা শুরু করবে।"[১২৩]

একবারও কি ভেবেছিলে, কেন আল্লাহর দেওয়া ফুরকান[১২৪] বাদ দিয়ে ওদের তৈরিকৃত স্ট্যান্ডার্ডের মাধ্যমে বিবেচনা করতে হবে সবকিছুকে?

পুরো বিশ্বকে দূরে ঠেলে কেবল ফিরিঙ্গিদের তৈরি করা ভালো-মন্দের কনসেপ্ট দিয়েই কেন মাপতে হবে আমাদের কর্মগুলোকে?

কেন ইসলামি আদর্শ দূরে ঠেলে, পশ্চিমা লুটেরাদের সফেদ-জলে ধুয়েমুছে শুভ্র করে ফেলতে হবে মানুষের চিন্তা-চেতনাকে?

ওদের দেওয়া মাপকাঠিকেই কেন 'চূড়ান্ত সত্য' বলে মনে করতে হবে?

---

১২৩. ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান অনূদিত, পৃষ্ঠা : ১৬৪-৬৫।
১২৪. কুরআনের আরেক নাম হলো 'ফুরকান', ইংরেজিতে যাকে বলে 'দ্য স্ট্যান্ডার্ড'।

ওরা কি তোমার রব?

তুমি কি ওদের দাস?

Thomas Babington Macaulay একসময় দম্ভ করে বলেছিল, আমরা এমন ইন্ডিয়ান তৈরি করব যারা দেখতে-শুনতে ইন্ডিয়ান হবে বটে, কিন্তু তাদের আদর্শ-চিন্তা-চেতনা, নীতি-নৈতিকতা সবটাই হবে ব্রিটিশদের আদলে-গড়া।

> "We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect."[১২৫]

আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি Macaulay-র সে দাম্ভিকতাকে সত্যে প্রমাণিত করেছ।

যদি ক্ষমতাধর সভ্যতাকেই লাইফস্টাইলের মাপকাঠি হিসেবে ধরতে হয়, তবে নবিদের কেন পাঠানো হয়েছিল? কেন আসমানি সমাধান দিয়ে বারবার যমীনে পাঠানো হয়েছিল জিবরীলকে? প্রিয় চাচার খণ্ড-বিখণ্ড দেহ কোলে নিয়ে কেন বাচ্চা শিশুর মতো কাঁদতে হয়েছিল ধরণির শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে?

তুমি যদি আল্লাহর বিধান মানতে না চাও, অসুবিধে নেই। সাড়ে সাত শ কোটি মানুষের মধ্যে ছয় শ কোটিকে যদি ইসলাম তার তালিকা থেকে বাদ দিতে পারে, তবে তোমার মতো একটা লোক ইসলামে না থাকলে আল্লাহর দ্বীনের কোনোই ক্ষতি হবে না। তোমার কাছে যদি মনে হয়—ইসলামের অনেক রুলস-রেগুলাশানে বাড়াবাড়ি (!) আছে, ওগুলোর সংস্কার প্রয়োজন; তবে আমি বলব : ইসলামের প্রাসাদে ঠাঁই নেওয়ার জন্যে কে জোরজবরদস্তি করছে তোমাকে? তোমার কাছে ইসলামের প্রাসাদটা যদি জীর্ণশীর্ণ (!) মনে হয়, তবে অযথা কেন আটকে থাকতে চাও এখানে? সেক্যুলারিজমের চোখ ধাঁধানো প্রাসাদের দরজা তো খোলাই আছে তোমার জন্যে। জামাই-আদর করে তোমায় বরণ করে নেওয়ার মতো লোকজনও অপেক্ষা করছে ওখানে। সেখানে গিয়ে ঠাঁই নাও না। অযথা এই জরাজীর্ণ (!) প্রাসাদ ধরে টানাটানি করছ কেন? এটা আঁকড়ে ধরে আমাদেরকে বাঁচতে দাও। এই প্রাসাদকে আমরা নতুনভাবে রাঙাতে চাই না। এমনকি প্রাসাদের একেকটি ইটের বদলায় ইটালিয়ান মার্বেল পাথরও বসাতে রাজি নই আমরা। কারণ আমরা বিশ্বাস করি—আমাদের

---

১২৫. "Macaulay's Minute on Indian Education". University of California, Santa Barbara. http://oldsite.english.ucsb.edu/faculty/rraley/research/english/macaulay.html

সম্মান-স্বাধীনতা-সফলতা, সব এখানেই। সাড়ে চৌদ্দ শ বছর আগে নির্মিত এই জীর্ণশীর্ণ (!) প্রাসাদের মধ্যেই। এই প্রাসাদ ছেড়ে আমরা হোয়াইট হাউজেও উঠতে রাজি নই।

> "একসময় আমরা অসহায়-তুচ্ছ ও লাঞ্ছিত ছিলাম। তারপর আল্লাহ আমাদের সম্মানিত করেছেন ইসলামের মাধ্যমে। এরপর যদি আল্লাহর পথ ব্যতীত অন্য কোনো পথে ইজ্জত ও সম্মান লাভের চেষ্টা করি, তবে আল্লাহ পুনরায় আমাদের লাঞ্ছিত করবেন।"[১২৬]

প্রবল বাতাসে উড়ে-যাওয়া ধুলোকণা, পানির স্রোতে ভেসে-যাওয়া খড়কুটো কিংবা ক্ষণে ক্ষণে রঙ পাল্টানো মনুষ্যগিরগিটিদের জন্যে আল্লাহ ﷻ কুরআন অবতীর্ণ করেননি। মানসিক দাসত্ববরণকারী কোনো তল্পিদার-ভীরু-কাপুরুষের জন্যে আল্লাহর বিধান নাযিল হয়নি। এটা তাদের জন্যে, যারা অসভ্যতার কালবোশেখী ঝড়ের সাথে লড়াই করতে করতে ঝড়ের গতিপথকেই পাল্টে দিতে পারবে প্রবল বিক্রমে। এটা নাযিল হয়েছে স্বাধীনচেতা, আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষদের জন্যে। যে-সময়ে যামানা যে রঙ ধারণ করে, সে রঙে রাঙার জন্যে আল্লাহ মুসলিমদের নির্বাচিত করেননি। বরং প্রত্যেক যামানাকে ইসলামের রঙে রাঙানোর জন্যেই আল্লাহ তাদের নির্বাচিত বান্দা বানিয়েছেন।

'The right to do or say what you want without anyone stopping you'—নাম দিয়ে উপনিবেশবাদী অসভ্য লুটেরাদের তৈরি করা লাইফস্টাইল-ইডিওলজিকে চোখ বুজে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেওয়ার নাম স্বাধীনতা নয়। বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টির গোলামি থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর বান্দা হয়ে যাওয়ার নামই স্বাধীনতা। আর এর জন্যে যে যুদ্ধ, সেটাই স্বাধীনতাযুদ্ধ। এর দিকে আহ্বান করার জন্যেই রিবিয়ি ইবনু আমির-রা ছুটে গিয়েছিলেন রুস্তমদের দরবারে। এটাই প্রকৃত বিপ্লব।

চে গুয়েভারার ছবিযুক্ত টি শার্ট গায়ে দেওয়ার জন্যে যেদিন বকেছিলাম তোমায়, সেদিন তুমি বিপ্লবের কথা শুনিয়েছিলে। মনে আছে?

সময় ছিল না বলে সেদিন আর কিছু বলতে পারিনি। আজ বলছি—বিপ্লবের সংজ্ঞা জানো তুমি?

---

১২৬ এ কথাগুলো উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ আবূ উবাইদা ﷺ-কে লক্ষ করে বলেছিলেন। [ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/১১৪-১১৫]

দিনরাত গাঁজা খেয়ে দেয়ালে দেয়ালে 'বিপ্লব নয়তো মৃত্যু' লেখা, কিংবা চারুকলার কজন মাতালকে সাথে নিয়ে শাহবাগে ব্যাঙের মতো ঘ্যাকর-ঘ্যাকর করার নাম বিপ্লব নয়। চে গুয়েভারা কিংবা ল্যানিনের টি-শার্ট গায়ে দিলেই তাকে বিপ্লবী বলে না। বাহাত্তুরে লোকদের দ্বারা বিপ্লব পরিচালিত হয়নি কখনও। যাদের নিজস্ব কোনো আদর্শ নেই, দুনিয়ার আরাম-আয়েশই যাদের একমাত্র লক্ষ্য, প্রতিকূলতা মোকাবিলা করার মুরোদ নেই যাদের, যারা ক্ষণে ক্ষণে রঙ পাল্টানো সভ্যতার পুজো করে—তারা বিপ্লবী হতে পারে না। নির্বোধ-কাপুরুষরা বিপ্লব করতে পারে না। যারা যুগের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার আলোকে পরিচালিত না হয়ে, যুগের চেহারাকেই রাঙিয়ে দেয় নিজের আদর্শ দিয়ে—তাদেরকেই বিপ্লবী বলে। এসব বীরপুরুষরাই প্রকৃত স্বাধীন ব্যক্তি।

ছোটোবেলায় 'স্বাধীনতার সুখ' নামে একটা কবিতা পড়েছিলে, মনে আছে? আমি একটু পড়ি?

বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই,
'কুঁড়ে ঘরে থাকি করো শিল্পের বড়াই,
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা পরে
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে।'
বাবুই হাসিয়া কহে, 'সন্দেহ কি তায়?
কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায়।
পাকা হোক, তবু ভাই, পরের ও বাসা
নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর, খাসা।'

চড়ুই পাখি প্যারাসাইট-এর মতো বাসা বাঁধে অন্যের ঘরে। অন্যের অট্টালিকা থেকে সুবিধে নেয়। কিন্তু বাবুই তা করে না। গোলামির জীবনের মধ্যে যে কোনো সুখ নেই, বাবুই এটা বুঝতে পারে। তাই সে বাসা বুনে নিজ হাতে। স্বাধীনচিত্তে ওই বাসায় অবস্থান করে। জীবনযাপন করে। অট্টালিকার ওপর থেকে চড়ুই হয়তো অহমিকা দেখাতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতার সুখ উপলব্ধি করতে পারে না পুরোপুরিভাবে। বাবুই ওর চেয়ে ঢের বেশি গুণে স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করে।

আমি তোমাকে চড়ুই না হয়ে বাবুই হতে বলছি।

টিয়ে পাখিটিকে বড়ো খাঁচায় রেখে লাল মরিচ খাইয়েও সুখী করতে পারিনি। কারণ ওর সুখ মুক্ত বাতাসের মধ্যে, বড়ো খাঁচার মধ্যে নয়। তেমনই, মানুষের সুখ স্বাধীন হওয়ার মধ্যে। মানসিকভাবে দাসত্বের জীবন পরিচালনা করে মানুষ কখনও সুখ পেতে পারে না। প্রশান্তি কেবল তখনই আসতে পারে, যখন মানুষ শত ইলাহের গোলামি থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র মাথা অবনত করবে অপরাজেয় রব্বুল আলামীনের সামনে। এটাই প্রকৃত স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে স্বর্গসুখ। আছে হৃদয়ের প্রশান্তি।

প্রবঞ্চনা কোরো না নিজের সাথে

"সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পরিবার পরিজন, ধন-সম্পদ ও সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হই।"

[বুখারি, আস-সহীহ, ১/১৩,১৪]

'আমি নবিজির জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত'—তোমার মুখ থেকে এই কথাটা আমি বহুবার শুনেছি। যতবারই শুনেছি, ততবারই একটি প্রশ্ন মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে। প্রশ্নটি করতে চেয়েও করতে পারিনি। আজ করছি। তুমি সত্যিই নবিজির জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত? রাগ কোরো না। রাগানোর জন্যে প্রশ্নটা করিনি। কেবল জানতে চাচ্ছি—তুমি সত্যিই নবি ﷺ-এর জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত তো?

হুট করে প্রশ্নটার জবাব দিতে হবে না, ভেবেচিন্তে দাও।

তোমার জন্যে একটা হিন্ট হচ্ছে—'নবিজিকে তোমার জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসো তো?' আগের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে এই হিন্টটা একটু মাথায় রেখো। আমি কিছুক্ষণ পরই তোমার উত্তরটা শুনব। তুমি মনে মনে উত্তরটা ঠিক করো। তবে উত্তরটা শোনার আগে আমার কিছু কথা বলার আছে, আগে সেগুলো বলে নিই।

১.

নবি ﷺ ও আবূ বাকর رضي الله عنه খুব দ্রুত হাঁটছেন। পেছনে আসছে শত্রুবাহিনী। শত্রুরা তাঁদেরকে পেলেই হত্যা করবে। ইতোমধ্যেই ওয়ারেন্ট জারি হয়ে গেছে তাঁদের নামে। নবিজি ও আবূ বাকরকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'টপ মোস্ট টেরোরিস্ট' হিসেবে। নবিজির মাথার দামও ঘোষণা করা হয়েছে। প্রেস ব্রিফিং-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে—'মুহাম্মাদকে জীবিত বা মৃত যে হাজির করতে পারবে, তাকে এক শ উট পুরস্কার দেওয়া হবে।'

পুরস্কারের আশায় লোকজন তাঁদের খুঁজতে লেগে গেছে। ওই সময় কাউকে ট্রেস করার পদ্ধতি ছিল 'পায়ের ছাপ'। ওরা পায়ের ছাপ ধরেই তাঁদের খোঁজাখুঁজি করছে। পায়ের ছাপ যাতে না পড়ে, সেজন্যে নবিজি আঙুলের ওপর ভর দিয়ে হাঁটছেন। তাঁর পা রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে। তবুও সামনে এগোচ্ছেন খুব দ্রুততার সাথে। আবূ বাকর رضي الله عنه

কিছুক্ষণ নবিজির সামনে হাঁটছেন, কিছুক্ষণ পেছনে। এভাবে পথ চলতে দেখে নবি ﷺ বললেন, 'আবূ বাকর, তোমার কী হলো? তুমি কিছুক্ষণ আমার সামনে হাঁটছ, আবার কিছুক্ষণ পেছনে। (ব্যাপার কী?)'

তিনি জবাব দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে ধরার জন্যে কেউ পেছন থেকে আসছে কি না, এ কথা মনে হলে পেছনে চলে যাই। আবার (সামনে থেকে আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে) কেউ ওত পেতে আছে কি না, এ কথা মনে হলে সামনে চলে যাই।'

নবিজি জিজ্ঞেস করলেন, 'আবূ বাকর! এমন কোনো বিষয় আছে কি, যা তুমি চাও আমাকে নয় বরং তোমাকে স্পর্শ করুক?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন। ছোটোখাটো এমন কোনো ক্ষতি নেই, যার ব্যাপারে আমি মনে করি না যে, তা আপনাকে নয় বরং আমাকেই স্পর্শ করুক।'[১২৭]

আমি এখানে একটু থামব। আবূ বাকর رضي الله عنه-এর অবস্থা নিয়ে কিছু কথা বলব। চরম পরিস্থিতিতে নবিজি ও আবূ বাকর পথ চলছেন। শত্রুরা দুজনকেই খুঁজছে। ধরতে পারলে নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ড। আবূ বাকর এ কথাগুলো জানেন। জানার পরও তিনি নিজেকে নিয়ে মোটেই চিন্তিত নন। চিন্তা করছেন নবিজিকে নিয়ে। তাই একবার সামনে হাঁটছেন, আরেকবার পেছনে। তিনি চাচ্ছেন, নবিজির ওপর যেন আঘাত না আসে। যতক্ষণ তিনি জীবিত আছেন, ততক্ষণ কেউ যেন তাঁকে হামলা না করে। ছোটো-বড়ো ক্ষতি যা-ই হোক না কেন, তাঁর হোক। নবিজি নিরাপদ থাকুক। প্রয়োজন হলে জীবন যায়, যাক; আপত্তি নেই।

এই হলো ভালোবাসা। সত্যিকার ভালোবাসা। যে ভালোবাসার দাবি পূরণের জন্যে আবূ বাকর رضي الله عنه নিজের জীবনকে তুচ্ছ মনে করছেন।

তাঁরা একটি গুহার কাছে পৌঁছুলেন। অনেকটা পথ পায়ে হেঁটে দুজনেই ক্লান্ত। সিদ্ধান্ত নিলেন সামনের গুহায় একটু জিরিয়ে নেবেন। নবিজি গুহায় প্রবেশ করতে যাবেন এমন সময় আবূ বাকর رضي الله عنه বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার জায়গায় থাকুন। আমি আপনার জন্যে গুহাটিকে পরিষ্কার ও নিরাপদ করে দিচ্ছি (এরপর

---

১২৭. ইবনু কায়্যিম, যাদুল মাআদ, ২/১৭১-১৭২, শফিউর রহমান, আর রাহীকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা : ১৮৭, ইবরাহীম আলি, সীরাতুন নবি ﷺ, পৃষ্ঠা : ২৪৩-২৪৪, সীরাহ মুহাম্মাদ ﷺ, সম্পাদক : জিম তানভীর, ১/২০৮।

আপনি প্রবেশ করুন)।'

নবিজি গুহার বাইরে দাঁড়ালেন আর তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন। গুহাটি পরিষ্কার করে ওপরে উঠে এলেন। ওপরে উঠেই তাঁর মনে হলো, একটি গর্ত পরিষ্কার করা হয়নি। দ্রুত গুহায় ঢুকলেন। গর্তটি বন্ধ করে এরপর বেরোলেন। বেরিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এবার নামুন।'

নবিজি গুহায় নামলেন। ক্লান্ত দেহে তিনি আবূ বকর ﵁-এর কোলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আবূ বকর ﵁ দেখলেন গুহায় দুটো গর্ত রয়েছে। এর আগে এগুলো তাঁর নজরে পড়েনি। গর্তে হয়তো কোনো কীট-পতঙ্গ লুকিয়ে থাকতে পারে, তাই তিনি নিজের পা-কে একটু সামনে নিয়ে গর্ত দুটো বন্ধ করে রাখলেন। ইতোমধ্যেই তাকে কীসে যেন কামড়ে দিল। নবিজির ঘুম ভেঙে যাবে দেখে তিনি নড়াচড়া করলেন না। বরং নবিজির মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। তাঁর ভালোবাসার মানুষটি ঘুমোচ্ছেন, তিনি সেটা প্রাণ ভরে দেখছেন। কিন্তু বিষের ব্যথা ক্রমেই বাড়তে লাগল। ব্যথায় তাঁর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। চোখের জল নবি ﷺ-এর গায়ে পড়তেই তিনি জেগে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, '(আবূ বাকর! কাঁদছ কেন?) তোমার কী হয়েছে?'

আবূ বাকর ﵁ বললেন, 'আমার মা বাবা আপনার ওপর কোরবান হোক। কীসে যেন আমায় কামড়েছে। (এর ব্যথায় চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। ক্লান্ত দেহে আপনি ঘুমোচ্ছেন বলে নড়াচড়া করে বিরক্ত করতে চাইনি।)'

নবিজি তার দিকে তাকালেন। তিনি এমন সাথিকে দেখছিলেন, যিনি তাঁর জীবনের চেয়েও তাঁকে বেশি ভালোবাসেন। যিনি যে-কোনো বিপদ মাথায় নিতে প্রস্তুত রয়েছেন তাঁর জন্যে। তাঁর সেইফটির সামনে নিজের জীবনকে তুচ্ছ মনে করছেন যিনি। নবি ﷺ সন্তুষ্ট হলেন আবূ বাকর ﵁-এর ওপর। নিজের থুতু লাগিয়ে দিলেন তাঁর পায়ে।[১২৮]

উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ এ দিনটির কথা স্মরণ করে কাঁদতেন। মনে মনে বলতেন, 'ইশ, যদি আমি আবূ বাকরের জায়গায় হতাম।' উমারের শাসনামলে কিছু লোক তাঁকে আবূ বাকরের ওপর প্রাধান্য দিতে লাগল। তখন উমার এই দিনের কথা উল্লেখ করে বললেন, 'আবূ বাকরের একটি দিন উমারের পরিবারের চেয়েও অধিক উত্তম।'[১২৯]

আবূ বাকরের কথা যখন এসেছে, তখন তাঁর আরেকটি ঘটনার কথা বলি। সময়টা

---

১২৮. শফিউর রহমান, আর রাহীকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা : ১৮৮।

১২৯. ইবরাহীম আলি, সীরাতুন নবি ﷺ, পৃষ্ঠা : ২৪৩।

নবম হিজরির। প্রচণ্ড গরম ছিল সে সময়। কিছু মানুষ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল। এরই মধ্যে তাবুক যুদ্ধের ঘোষণা এল। নবিজি ও তাঁর সাহাবিরা প্রস্তুতি নিলেন। সাহাবিরা যুদ্ধের জন্যে দান-সদাকা করতে লাগলেন সর্বোচ্চ পরিমাণে। উসমান দিলেন নয় শ উট, এক শ ঘোড়া। আবদুর রহমান ইবনু আউফ দিলেন সাড়ে উনত্রিশ কিলো সোনা। উমার মনে মনে ভাবতে থাকেন—এই সুযোগ। আবূ বাকর-এর ঘরে তেমন সম্পদ নেই। এবার আবূ বাকর-কে ঠিক পেছনে ফেলে দেবো। তো যে কথা সেই কাজ। অর্ধেক সম্পদ নিয়ে হাজির হলেন উমার। নবি ﷺ উমারের দান দেখে সন্তুষ্ট হলেন। এবার উমার অপেক্ষা করছেন আবূ বাকর কী আনেন, সেটা দেখার জন্যে। কিছুক্ষণ পর আবূ বাকর এলেন। পুরোনো কাপড়ে বাঁধা পুঁটলিটা মাথা থেকে নামালেন। উমার-এর দৃষ্টি পুঁটলির দিকে। আবূ বাকর সেটা খুললেন। তাঁর যত সম্পদ ছিল, সবই ওই কাপড়ে বেঁধে এনেছেন। নবি ﷺ তাঁর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'বাসার সবই কি নিয়ে এসেছ?'

আবূ বাকর মাথা নেড়ে বললেন, 'সবই নিয়ে এসেছি, কিন্তু ঘর খালি করে আসিনি।'

উমার জিজ্ঞেস করলেন, 'কীভাবে? এখানে তো আপনার সব জিনিসপত্র দেখা যাচ্ছে।'

আবূ বাকর মুচকি হেসে বললেন, 'ঘরে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।'[১০০]

সাহাবিরা যারপরনাই বিস্মিত হলেন তাঁর কথা শুনে। নবিজিকে ভালোবেসে যে যার সাধ্যমতো দান করেছেন, কিন্তু সম্পদের সবটা দান করেননি কেউই। একমাত্র তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনিই সে ব্যক্তি, যিনি নবিজির ভালোবাসায় সবকিছু উজাড় করে দিয়েছেন। নবিজির ভালোবাসার সামনে তুচ্ছ মনে করেছেন সমস্ত ধন-সম্পদকে। তাই তো নবি ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ দিয়ে, সাহচর্য দিয়ে আমার ওপর সবচেয়ে বেশি ইহসান করেছে, সে ব্যক্তি হলো আবূ বাকর।'[১০১]

তুমি আবূ বাকর ﷺ-এর মতো নবিজিকে ভালোবাসো কি না, কখনও টেস্ট করেছিলে?

---

১০০. শফিউর রহমান, আর রাহীকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা : ৪৬৭।

১০১. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : আম্বিয়া কিরাম, হাদীস : ৩০৯২।

২.

'আহাদ'[১৩২] 'আহাদ' বলে একটি লোক মৃদু শব্দ করছেন। তীব্র অত্যাচারের কারণে তিনি নড়াচড়া করতেও কষ্ট পাচ্ছেন। যারা অত্যাচার করছিল তারাও শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়েছে। কিন্তু লোকটির মুখ থেকে 'আহাদ' শব্দটি দূর করতে পারেনি। রাগে ক্ষোভে ওরা লোকটির গলায় রশি বেঁধে গরু-ছাগলের মতো টানাটানি করছে। টানতে টানতে হাঁপিয়ে উঠেছে। কিন্তু তবুও লোকটি 'আহাদ' 'আহাদ' বলেই যাচ্ছেন। ওদের রাগ এবার আরও বেড়ে গেল। ছোটোছোটো ছেলেমেয়ের হাতে রশি দিয়ে দিলো। ওরা ইচ্ছেমতো লোকটিকে নিয়ে টানাটানি করল। টানাটানির পালা এক সময় শেষ হলো। এবার নতুন কিছু লোকটির জন্যে অপেক্ষা করছে। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে লোকটিকে নিয়ে যাওয়া হলো। পাথর চাপা দিয়ে রাখা হলো বুকের ওপর। সূর্যের উত্তাপ এতটাই বেশি যে, বালি গরম হয়ে লোকটির শরীর পুড়তে লাগল কিন্তু তবুও তিনি বিচলিত হলেন না। তাঁর মুখ দিয়ে কেবল একটাই শব্দ বেরোচ্ছে—'আহাদ'।

এই লোকটি নবিজিকে ভালোবেসেছিলেন। তাঁর ভালোবাসা এতটাই নিখাদ ছিল যে, অত্যাচারের-পর-অত্যাচার তাঁকে টলাতে পারেনি। যত অত্যাচার করা হয়েছে, তাঁর ভালোবাসা আরও বেড়েছে। তিনি তাঁর ভালোবাসার দাবিকে সত্যে পরিণত করেছিলেন।[১৩৩]

নবি ﷺ একদিন দুনিয়া থেকে বিদেয় নিলেন। তাঁর অন্যান্য সাথিদের মতো এই লোকটিও সবচেয়ে কাছের মানুষটিকে হারিয়ে পাগলপারা হয়ে গেলেন। লোকটি ছিলেন মাসজিদে নববির মুয়াজ্জিন। কিন্তু নবিজি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর আযান দেওয়া বন্ধ করে দিলেন তিনি।

লোকটি অন্তর থেকে নবিজির শূন্যতা অনুভব করতেন। তাই তাকিয়ে থাকতেন নবিজির ঘরের দিকে, যেখানে তিনি শুয়ে আছেন। তাকাতেন আর ভাবতেন, নবি ﷺ যদি এসে বলতেন—'কী ব্যাপার, বসে আছ কেন? সালাতের সময় হয়েছে। আযান দাও। আযান দিয়ে আমাদের তৃপ্ত করো'—কতই-না ভালো হতো। কিন্তু তিনি তো চলে গেছেন। চলে গেছেন না ফেরার দেশে। লোকটি এ কথাগুলো ভাবতেন, আর ঝড় বয়ে যেত তাঁর অন্তরে। বারবার মনে হতো নবিজির সাথে কাটানো দিনগুলোর

---

১৩২. 'আল্লাহ এক'।

১৩৩. ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মাআদ, ২/১৪৬, শফিউর রহমান, আর রাহীকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা : ১১২, ইবরাহীম আলি, সীরাতুন নবি ﷺ, ১/১৪১।

কথা। শেষমেশ বিরহ সইতে না পেরে তিনি পাড়ি জমালেন সিরিয়ার পথে।

১৭ হিজরির শেষের দিকের কথা। উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ তখন আমিরুল মুমিনীন। গুরুত্বপূর্ণ কাজে সিরিয়ায় গেলেন তিনি। অনেক সাহাবা জড়ো হলেন সেখানে। পুরোনো বন্ধুরা এক জায়গায় জড়ো হয়েছেন কতদিন পর, একজন অপরজনের সাথে কুশলাদি বিনিময় করছেন। চোখের জল ফেলছেন বুকে জড়িয়ে ধরে। এমন সময় সালাতের ওয়াক্ত হলো। সাহাবিরা লোকটিকে আযান দিতে অনুরোধ করলেন। রাজি হলেন না তিনি। বারবার অনুরোধ করেও রাজি করানো গেলো না তাঁকে। শেষমেষ আমিরুল মুমিনীন অনুরোধ করলেন। এবার রাজি হলেন তিনি। দাঁড়িয়ে গেলেন আযানের জন্যে। শুরু হলো আযান। সে আযান শুনে কান্নার রোল পড়ে গেল সাহাবাদের মধ্যে। উমার ﷺ বাচ্চা শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন।

তাঁদের মনে হতে লাগল সেই দিনগুলোর কথা, যখন নবি ﷺ জীবিত ছিলেন। আর এই লোকটি সে সময় আযান দিতেন। সাহাবাদের চোখে ভেসে উঠল সেই দৃশ্যগুলো। তাঁরা কেঁদে চোখ ভাসালেন। লোকটি যখন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'[১০৪] পর্যন্ত পৌঁছুলেন, তাঁর পক্ষে আর আযান দেওয়া সম্ভব হলো না। তিনিও কাঁদতে লাগলেন। চোখ ঝাপসা হয়ে গেল তাঁর। অন্তর দিয়ে সেই মানুষটিকে অনুভব করলেন, যাকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছেন।[১০৫]

লোকটি যেদিন মারা যাচ্ছেন সেদিন তাঁর স্ত্রী বলছিল, 'হায়, আজ কী দুঃখের দিন! আজ কী কষ্টের দিন! আমার স্বামী আজ দুনিয়া থেকে বিদেয় নিচ্ছেন।'

তখন লোকটি বলছিলেন, 'না, আজ আমার সুখের দিন। আজ আনন্দের দিন। কাল আমি সেই মানুষটির সাথে থাকব, যাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি।'

জানো, সে লোকটি কে? কী তাঁর নাম?

না, আমি বলব না। এটা তোমার জন্যে 'কুইক কুইজ'।

তবে আমি একটা হিন্ট দিতে পারি। নবিজি মিরাজের রাত্রিতে লোকটির পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন।

তুমি কি এই লোকটির মতো নবিজিকে ভালোবাসো?

---

১০৪. 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল'।
১০৫. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/১৪৯।

৩.

বদরেরর ময়দান। নবি ﷺ চিন্তিত হয়ে পায়চারি করছেন। সাহাবিরা যুদ্ধের জন্যে ময়দানে আসেননি, এসেছিলেন কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করার জন্যে। কিন্তু এখন যুদ্ধের দামামা বেজে গেছে। পিছু হটার উপায় নেই। নবিজি ভাবছেন—সাহাবিরা কি যুদ্ধ করার জন্যে রাজি হবে? মুহাজিররা না হয় রাজি হলো, কিন্তু আনসাররা? তাঁরা তো মদীনার বাইরে আমাকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়নি, তা হলে? ওঁরা যদি যুদ্ধ না করে চলে যায়!

নবিজি সাহাবাদের ডাকলেন। পরামর্শ চাইলেন তাঁদের কাছে। আবূ বাকর ও উমার যুদ্ধ করার পক্ষে মত দিলেন। নবিজি চাচ্ছিলেন আনসার সাহাবিরা মতামত দিক। আনসাররাই সংখ্যায় বেশি। এই মুহূর্তে তাঁদের মতামত জানাটা খুব জরুরি। আনসারদের পতাকাবাহী সাদ ইবনু মাআজ ﷺ নবিজির মনোভাব বুঝতে পারলেন। তিনি দৃঢ়চিত্ত কণ্ঠে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের মতামত জানতে চান?'

নবি ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।'

ইবনু মাআজ বললেন, 'আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি। আপনাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি। আপনার কথা শুনব ও মানব বলে ওয়াদা করেছি। আপনি আমাদের নিয়ে মোটেও চিন্তিত হবেন না। আমরা ভীরু ও কাপুরুষ নই। আমাদের ধন-সম্পদ আপনার জন্যে, যত প্রয়োজন হয় খরচ করুন। যেদিকে খুশি, আমাদেরকে নিয়ে চলুন। আল্লাহর শপথ! আমরা একজনও পেছনে পড়ে থাকব না। ইন শা আল্লাহ শত্রুর মোকাবিলায় আমাদের যোগ্যতা ও কৃতিত্ব দেখে আপনার চোখ জুড়োবে। আল্লাহর শপথ! আপনি যদি আমাদের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন, আমরা তা-ই করব। আপনি যদি আমাদের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন, আমরা সেটাও পালন করব। আমাদের নিয়ে সামনে বাড়ুন।'[১০৬]

তুমি কি ইবনু মাআজ ﷺ-এর কথাগুলো মন দিয়ে শুনেছ? তাঁর কথামালা থেকে তুমি কী বুঝতে পারলে।

জবাবটা আমিই দিচ্ছি, তুমি মিলিয়ে নাও।

---

১০৬. ইবনু কায়্যিম, যাদুল মাআদ, ২/২৫৩, ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/৪৬২; শফিউর রহমান, আর রাহীকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা : ২৩২-২৩৩।

নবিজির ভালোবাসার সামনে সাহাবিরা তুচ্ছ মনে করতেন নিজের জীবন-সম্পদ-ক্যারিয়ারকে। নিজেদের ভালোলাগার ওপরে প্রাধান্য দিতেন নবিজির ভালোলাগাকে। নিজেদের বিলিয়ে দিতেন তাঁর যে-কোনো সিদ্ধান্তের সামনে। অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন তাঁর প্রতিটি কথা। তাঁরা সব সময় ভাবতেন—জীবন যায় যাক, আপত্তি নেই। ধনসম্পদ শেষ হয় হোক, কোনো পরোয়া নেই। সবার আগে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। নবি ﷺ যদি বলেন আগুনে ঝাঁপ দিতে, আমরা নির্দ্বিধায় ঝাঁপ দেব। তিনি যদি বলেন সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে, বিনা বাক্যে সেটা মেনে নেব। তাঁর ভালোবাসার সামনে যে-কোনো ত্যাগ স্বীকার করব।

একবার এক সাহাবি কিয়ামাত সম্পর্কে জানার জন্যে নবিজির কাছে এল। তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। সালাত শেষ করে নবি ﷺ বললেন, 'কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী লোকটি কোথায়?'

সে সাহাবি বলল, 'এই যে আমি।'

-'তুমি কিয়ামাতের জন্যে কী প্রস্তুতি নিয়েছ?'

-'হে আল্লাহর রাসূল! বেশি বেশি সালাত কিংবা সাওম নিয়ে আমি এর জন্যে -প্রস্তুত হতে পারিনি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি।'

-'যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে, সে তার সাথেই জান্নাতে থাকবে। তুমিও যাকে ভালোবাসো, তার সাথেই থাকবে।'[১৩৭]

সাহাবিরা সব সময় ভাবতেন—একদিন আমরা মারা যাব, নবিজিও মারা যাবেন। তিনি থাকবেন জান্নাতের অনেক উঁচু স্তরে। আর আমরা যদি জান্নাতে যাইও, তবে আমাদের স্তর কখনোই তাঁর সমান হবে না। কিন্তু সে জান্নাত কী করে জান্নাত হতে পারে, যেখানে তিনি আমাদের পাশে নেই? সে সুখ কীভাবে প্রকৃত সুখ হতে পারে, যে সময়ে তিনি আমাদের কাছে নেই?

তাঁরা যখন জানতে পারলেন—মানুষ তার ভালোবাসার মানুষের সাথে জান্নাতে থাকবে—তখন তাঁদের অন্তর তৃপ্ত হলো। হোক না তাঁদের আমল নবিজির চেয়ে কম, কিন্তু তাঁকে ভালোবাসার কারণে তাঁরা নবি ﷺ-এর সাথেই জান্নাতে থাকবেন। আনাস رضي الله عنه বলেন, 'এই হাদীস শোনার পর মুসলিমরা এত আনন্দিত হয়েছিল যে,

১৩৭. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : আম্বিয়া কিরাম, হাদীস : ৩৪২৩; তিরমিযি, আস-সুনান, অধ্যায় : কিতাবুয যুহদ, হাদীস : ২৩৮৮। ইমাম তিরমিযি رحمه الله হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ইসলামে আসার পর আর কোনো বিষয়ে তাঁদের এতটা আনন্দিত হতে দেখিনি।'[১৩৮]

নবিজিকে সাহাবিরা এমনভাবে ভালোবেসেছেন, কাফিররা তা দেখে অবাক হয়েছে। এমন ভালোবাসার নজির এর আগে তারা দেখেনি। এটা আমার মৌখিক কোনো দাবি নয়, সত্যি। হুদায়বিয়ার সন্ধির কথা হয়তো তোমার মনে আছে। সে সময়কার একটি ঘটনা শোনালে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

হুদায়বিয়ার দিন কুরাইশরা নবি ﷺ-এর সাথে কথা বলার জন্যে বুদায়লকে পাঠাল। নবিজি বুদায়লকে সন্ধি করার প্রস্তাব জানালেন। নবিজি রাজি হলেন। বুদায়ল সন্ধির প্রস্তাব পৌঁছে দিল কুরাইশদের কাছে। বুদাইলের থেকেও প্রবীণ কাউকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল কুরাইশরা। উরওয়া ইবনু মাসউদ ছিল ওদের মধ্যে প্রবীণ, কুরাইশরা তাকেই পাঠাল। উরওয়া দেখা করতে এল নবি ﷺ-এর সাথে। সে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি কি আপনার জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান? আপনি কি এর আগে এমন কাউকে দেখেছিলেন, যে তার জাতিকে সমূলে উৎপাটন করতে উদ্যত হয়েছিল? আল্লাহর শপথ! আমি আপনার পাশে এমন কিছু লোক দেখতে পাচ্ছি—যারা যুদ্ধ শুরু হলে আপনাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে।'

উরওয়ার কথা শুনে সাহাবিরা অবাক হলেন। এই নির্বোধটা বলে কী? ও কি দেখেনি, মক্কায় শত অত্যাচারের মধ্যেও নবিজির সাথিরা তাঁকে কীভাবে আগলে রেখেছিল? ও কি দেখেনি, বদরের যুদ্ধে তাঁর সাথিরা কেমন বীরত্ব দেখিয়েছিল? ও কি ভুলে গেছে, উহুদের যুদ্ধে সাহাবিরা কীভাবে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে নবিজিকে রক্ষা করেছিল? তা হলে? এমন কথা কীভাবে বলল সে? আবূ বাকর رضي الله عنه রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'যাও ভাগো। গিয়ে লাত ও উযযার লজ্জাস্থান চুষো।'

উরওয়া বলল, 'এই লোকটি কে?'

নবি ﷺ বললেন, 'আবূ বাকর।'

উরওয়া আবার কথা বলতে আরম্ভ করল। কথার ফাঁকে ফাঁকে সে নবিজির দাড়িতে হাত দিচ্ছিল। তখন মুগীরা ইবনু শুবা একটি তলোয়ার দিয়ে মৃদু আঘাত করে উরওয়ার হাত নামিয়ে দিলেন। মুগীরা ইবনু শুবা رضي الله عنه বললেন, 'রাসূলের দাড়ি থেকে তোমার হাত সরিয়ে নাও।'

---

১৩৮ বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : আম্বিয়া কিরাম, হাদীস : ৩৪২৩; তিরমিযি, আস-সুনান, অধ্যায় : কিতাবুয যুহদ, হাদীস : ২৩৮৮।

উরওয়া বলল, 'এ কে?'

নবি ﷺ বললেন, 'সে মুগীরা ইবনু শুবা।'

কথা শেষ হলে কিছুক্ষণ আড়চোখে সাহাবাদের পর্যবেক্ষণ করল উরওয়া। কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, 'হে আমার জাতি! আল্লাহর শপথ! আমি পারস্য ও আবিসিনিয়ায় দূত হিসেবে গিয়েছি, কিন্তু কোনো রাজা-বাদশাহকেই মুহাম্মাদের অনুসারীদের মতো এতটা ভালোবাসতে দেখিনি। আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদ যদি থুতু ফেলেন, তবে সাথে সাথে তাঁর সাথিরা তা গায়ে ও মুখে মেখে নেয়। তিনি যখন ওজু করেন, তখন ওজু থেকে গড়িয়ে পড়া পানি নিয়ে তাঁর সাথিরা প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়। তিনি যখন কোনো আদেশ দেন, তখন তাঁর সাথিরা তা পালনের জন্যে অস্থির হয়ে যায়। তিনি যখন কথা বলেন, তাঁর সাথিরা তখন তা কান লাগিয়ে শোনে। কথা শোনার সময় কেউ তাঁর দিকে চোখ তুলেও তাকায় না। হে কুরাইশরা! তোমরা মুহাম্মাদের কথা মেনে নাও।'[১৩৯]

কী, এবার আমার কথা বিশ্বাস হলো তো?

এই হলো সত্যিকার ভালোবাসা, যার নজির সাহাবিরা আমাদের সামনে রেখে গেছেন। তাঁরা নবিজিকে এমনভাবে ভালোবেসেছেন, যা দেখে কাফিররা যারপরনাই বিস্মিত হয়েছে। বিশ্ব সারপ্রাইজড় হতে বাধ্য হয়েছে তাদের ভালোবাসা দেখে। একেই বলে সত্যিকার ভালোবাসা। এটা ক্লোজ-আপের কাছে আসার অ্যাড নয়। রিয়েল লাভ।

ভাই আমার! সততার সাথে বলো তো, তুমিও কি সাহাবিদের মতো নবিজিকে ভালোবাসতে পেরেছ?

৪.

মসজিদে নববি। নবিজির খুতবাহ শোনার জন্যে অপেক্ষা করছেন সাহাবিরা। নবি ﷺ এলেন। খুতবাহ দেওয়ার জন্যে দাঁড়ালেন। খুতবাহ আরম্ভ করতে যাবেন এমন সময় এক আনসারি মহিলা বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্যে একটি মিম্বর তৈরি করে দিই?'

তিনি বললেন, 'তোমাদের ইচ্ছে হলে দিতে পারো।'

---

১৩৯. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : শর্তাবলী, হাদীস : ২৫৪৭; ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/৩২২-২৩২; ইবনু কায়্যিম, যাদুল মাআদ, ২/৩৪৮, শফিউর রহমান, আর রাহীকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা : ৩৬৬।

পরবর্তী সময়ে একটি মিম্বর তৈরি করা হলো। মসজিদে নববিতে একটি খেজুর গাছের গুঁড়ি ছিল, ক্লান্ত হলে নবিজি গুঁড়িটির সাথে হেলান দিয়ে খুতবাহ দিতেন। গুঁড়িটি সরিয়ে সে জায়গায় বসানো হলো নতুন মিম্বর। তিনি খুতবাহ দেওয়ার জন্যে নতুন মিম্বরে দাঁড়ালেন। এমন সময় সাহাবিরা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। কিন্তু সাহাবাদের কেউই তো কাঁদছে না, তা হলে কে? কে কাঁদছে?

কাঁদছিল ওই গুঁড়িটি, যার ওপর ভর দিয়ে এত দিন নবিজি খুতবাহ দিতেন। গুঁড়িটি এত জোরে কাঁদছিল যে, সাহাবিরা সে শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন। কান্না শুনে নবি ﷺ নেমে এলেন মিম্বর থেকে। জড়িয়ে ধরলেন গুঁড়িটিকে। আবেগাপ্লুত হয়ে সেটি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। গুঁড়িটিকে হাত বুলিয়ে আদর করলেন তিনি। কান্না বন্ধ হলো তার।[১৪০]

গুঁড়িটি কেন কাঁদছিল জানো?

নবিজির বিরহে।

নবিজির বিরহে সেটি বাচ্চা শিশুর মতো কাঁদছিল। এতদিন নবি ﷺ তার ওপর ভর দিয়ে খুতবাহ দিয়েছেন, কিন্তু আজ তিনি তার কাছ থেকে সরে গেছেন দূরে—এ বিরহে সে কাঁদছিল। সামান্য গুঁড়ি, যে নবিজিকে ভালোবাসতে বাধ্য নয়; সেও নবিজির বিরহে কাঁদে। আবগাপ্লুত হয় তাঁর জন্যে। আর তুমি?

বলো তো, শেষ কবে তাঁর জন্যে চোখের জল ফেলেছিলে?

আমি জানি না, আর কত ইতিহাস শুনলে তোমার বোধোদয় হবে।

এতক্ষণ তুমি তাঁদের কাহিনি শুনেছ, যারা নবিজিকে তাঁদের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবেসেছিল। এবার অন্য কাহিনি বলি। নবি ﷺ তাঁর উম্মাহকে কতটা ভালোবাসতেন, সে কাহিনি। খবরদার! কোথাও যাবে না। এটুকু অবশ্যই পড়ে শেষ করবে। এরপর তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবে। মনে আছে, কোন প্রশ্নটা? মনে রেখো, ভুলে যেয়ো না যেন!

উম্মুল মুমিনীন একবার নবি ﷺ-এর সাথে বসে আছেন। নবিজি হাসিমুখো হয়ে কথা বলছেন তাঁর সাথে। কথার ফাঁকে আয়িশা ؓ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্যে আল্লাহর কাছে দুআ করুন।'

নবিজি বললেন, 'হে আল্লাহ! আয়িশার অতীত ও ভবিষ্যতের সব গোনাহ মাফ করে

১৪০. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : আম্বিয়া কিরাম, হাদীস : ৩৩৩০-৩৩৩২।

দিন। ওসব গোনাহ মাফ করে দিন, যা সে প্রকাশ্যে করেছে। ওসব গোনাহও মাফ করে দিন, যা সে গোপনে করেছে।'

উম্মুল মুমিনীনের চোখেমুখে আনন্দের ঝিলিক ফুটে উঠল। নবিজির দুআ শুনে তিনি এতটাই আনন্দিত হলেন যে, তাঁর মাথা কোলের সাথে লেগে গেল। নবি ﷺ তাঁকে বললেন, 'আমার দুআ কি তোমায় সন্তুষ্ট করেছে?'

তিনি বললেন, 'এই দুআ শুনে কেউ সন্তুষ্ট না হয়ে পারে?'

তাঁর আনন্দিত অবস্থা দেখে নবি ﷺ বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি প্রত্যেক সালাতের মধ্যে আমার উম্মতের জন্যে এই দুআ করি।'[১৪১]

সুবহানাল্লাহ! একবারও কি চিন্তা করেছ—নবিজি তোমায় কতটা ভালোবাসতেন, কতটা আপন ভাবতেন! তিনি তোমাকে দেখেননি, তবুও তোমার জন্যে দুআ করেছেন। চোখের পানি ফেলেছেন। আর তুমি?

শেষ কবে তাঁর ওপর সালাত ও তাসলীম পাঠ করেছিলে?

নবি ﷺ একদিন সাহাবাদের বললেন—'আমার বড়ো ইচ্ছে হয় আমার ভাইদেরকে দেখি।' সাহাবিরা বুঝতে পারছিলেন না, তিনি কাদের ভাই বলে সম্বোধন করছেন। কাদের দেখার জন্যে ব্যাকুল হচ্ছেন। আগ্রহভরে তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই?'

তিনি জবাব দিলেন, '(আরে না), তোমরা তো আমার সাহাবি।'

-'তা হলে ভাই কারা?'

-'এখনও যারা পৃথিবীতে আসেনি (তারা আমার ভাই)।'

-'আপনি তাদের কীভাবে চিনবেন?'

-'ধরো কোনো ব্যক্তির সাদা কপাল ও সাদা হাত-পা-বিশিষ্ট একটি ঘোড়া আছে। সে ঘোড়াটি যদি কালো ঘোড়ার মধ্যে মিশে যায়, তবে লোকটি কি তার ঘোড়াকে আলাদা করতে পারবে?'

-'হ্যাঁ, অবশ্যই পারবে।'

---

১৪১. হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১/৩১০।

-'আমার ভাইয়েরা সেদিন (কিয়ামাতের দিন) এমন অবস্থায় আসবে, যখন তাদের চেহারা নূরানি হবে। হাত-পা ঝলঝল করতে থাকবে। (এগুলো দেখেই আমি তাদের চিনে নেব)।'[১৪২]

যে রাসূল ﷺ তোমায় ভাই বলে সম্মানিত করলেন, তাঁর জন্যে কি অন্তরে একটুও ভালোবাসা জন্মে না? কখনও কি মুখ ফসকেও এ কথা বেরোয় না—'হে প্রিয় নবি, আমি আপনাকে খুব মিস করি। আপনাকে এক নজর দেখার জন্যে ব্যাকুল থাকি। জান্নাতে আপনার সাথি হওয়ার জন্যে গোপনে চোখের জল ফেলি।' বলো এগুলো?

আর কত নিজেকে ফাঁকি দেবে?

আর কত অন্ধকারে সাঁতরে বেড়াবে?

আর কত তাঁর সুন্নাহ থেকে দূরে থাকবে?

একদিন এই পৃথিবী ধ্বংস হবে। রঙিন স্বপ্নগুলো শেষ হয়ে যাবে। ধন-সম্পদ তুলোর মতো উড়ে যাবে। নিঃস্ব অবস্থায় মানুষ কিয়ামাতের মাঠে একত্র হবে। সেদিন সূর্য থাকবে খুবই কাছে। সূর্যের উত্তাপে শরীর পুড়ে যাবে। ঘামের সাগরে মানুষ হাবুডুবু খাবে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো একদিক থেকে আরেকদিকে ছুটোছুটি করবে। মানুষ চাইবে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে, কিন্তু কেউই আল্লাহর কাছে কিছু বলার সাহস পাবে না। সবাই মিলে নবিদের কাছে দৌড়ুবে। তারা প্রথম আদম ﷺ-এর কাছে যাবে। তাঁকে বলবে, 'আপনি আবুল বাশার। আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর রুহ আপনার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন। ফেরেশতাদের দিয়ে আপনাকে সাজদা করিয়েছেন। আল্লাহর কাছে আপনি অনেক সম্মানিত। আজ আমাদের জন্যে একটু সুপারিশ করুন না।'

আদম ﷺ কিছুতেই রাজি হবেন না। তখন লোকেরা বলবে, 'আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে আছি? আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী কষ্টের মধ্যে আছি? আপনি আমাদের ওপর দয়া করুন। আমাদের জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করুন।'

তখন তিনি বলবেন, 'আজ আমার রব আমার ওপর এতটা রাগান্বিত হয়েছেন, যার আগে কোনোদিন এত রাগ করেননি। তিনি আমাকে একটি গাছের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি সে নিষেধ অমান্য করেছি। তোমরা অন্য কারও কাছে

১৪২. মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : তাহারাহ, হাদীস : ৪৭৭।

যাও। নাফসী, নাফসী। (আমি তো নিজেই আজ সাহায্যপ্রার্থী)'

লোকেরা বলবে, 'হে আমাদের পিতা! আমরা কার কাছে যাব?'

তিনি জবাব দেবেন, 'নূহ-এর কাছে যাও।'

মানুষ দৌড়ে নূহ ﷺ-কে খুঁজে বের করবে। এরপর বলবে, 'হে নূহ! আপনি প্রথম রাসূল। আল্লাহ আপনাকে পরম কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আজ আপনি আমাদের জন্যে একটু সুপারিশ করুন।'

জবাবে তিনি বলবেন, 'আমার রব আমার ওপর আজকের তুলনায় বেশি রাগ আর কোনোদিন করেননি। আমার একটি গ্রহণীয় দুআ ছিল, আমি সেটা দুনিয়ায় করে ফেলেছি। নাফসী, নাফসী। তোমরা ইবরাহীম-এর কাছে যাও।'

মানুষ ইবরাহীম ﷺ-কে রিকুয়েস্ট করবে। কিন্তু তিনি বলবেন, 'আজ আমার রব আমার ওপর যতটা রাগান্বিত হয়েছেন, এর আগে কোনোদিন এত রাগ করেননি। নাফসী, নাফসী। তোমরা মূসা-এর কাছে যাও।'

মানুষ দৌড়ে গিয়ে মূসা ﷺ-কে খুঁজে বের করবে। অনেক অনুনয় করে বলবে, 'হে মূসা! আল্লাহ আপনাকে রিসালাত দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আপনার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। আপনি আমাদের জন্যে একটু সুপারিশ করুন না।'

তিনি বলবেন, 'আমার রব আমার ওপর আজকের তুলনায় বেশি রাগ আর কোনোদিন করেননি। আমি ভুলে এক লোককে মেরে ফেলেছিলাম। অথচ তাকে মারার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়নি। নাফসী, নাফসী। তোমরা ঈসা-এর কাছে যাও।'

মানুষ ঈসা ﷺ-কে গিয়ে বলবে, 'আপনি আল্লাহর রাসূল। আপনি শিশুকালেই মানুষের সাথে কথা বলেছেন। আপনি কি আমাদের বিপদ দেখছেন না? দয়া করে আমাদের জন্যে একটু সুপারিশ করুন।'

তিনিও ঠিক একই কথা বলবেন, যা অন্যান্য নবিরা বলেছিলেন। তখন মানুষের আর্তচিৎকারে পরিবেশ ভারী হবে। তিনি এই অবস্থা দেখে বলবেন, 'তোমরা দ্রুত মুহাম্মাদ-এর কাছে যাও।' মানুষ দৌড়ুতে দৌড়ুতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে পৌঁছুবে। এরপর সবাই মিলে তাঁকে সুপারিশ করার জন্যে অনুরোধ করবে। তারা বলবে, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর শেষ নবি। আল্লাহ আপনার আগের ও পরের সব গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী ভয়ানক বিপদের মধ্যে

আছি? আপনি আমাদের জন্যে একটু সুপারিশ করুন না।'

লোকদের কথা শুনে নবি ﷺ আরশের নিচে সাজদা'য় পড়ে যাবেন। তিনি সাজদায় আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করবেন। আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁর মুখ দিয়ে এমন প্রশংসা বের হবে, যা এর আগে অন্য কেউ করেনি। এভাবে দীর্ঘ সময় সাজদায় পড়ে থাকবেন। তাঁর সাজদা ও প্রশংসা শুনে আল্লাহ ﷻ সন্তুষ্ট হয়ে বলবেন, 'হে মুহাম্মাদ! তোমার মাথা ওঠাও। তুমি যা (চাওয়ার) চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। তুমি (যত ইচ্ছে) সুপারিশ করো, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে।'[১৪৩]

তখন তিনি কী বলবেন, জানো?

তিনি কী বলবেন, সেটা জানার আগে কিয়ামাতের অবস্থাটা একটু উপলব্ধি করার চেষ্টা করো। কিয়ামাতের দিন সব নবিরা চুপ। কেউ কিছু বলার মতো সাহস পাচ্ছেন না। সবাই আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে আছেন। সব নবি তাঁর নিজের অবস্থা নিয়ে চিন্তায় পড়ে আছেন। মানুষ দৌড়ে গিয়ে তাঁদেরকে সুপারিশ করার অনুরোধ করছে, কিন্তু তাঁরা রাজি হচ্ছেন না। তাঁদের প্রত্যেকের মুখ দিয়ে কেবল একটি শব্দই বের হচ্ছে—'নাফসি, নাফসি'। সে দিনটা এত ভয়াবহ হবে যে—মা তার সন্তানকে ভুলে যাবে, বাবা তার কন্যাকে ভুলে যাবে, স্বামী তার স্ত্রীকে ভুলে যাবে, গার্লফ্রেন্ড তার বয়ফ্রেন্ড থেকে দূরে সরে যাবে, নবিরা পর্যন্ত 'নাফসী, নাফসী' করতে থাকবেন। সেদিন মুহাম্মাদ ﷺ সাজদা থেকে মাথা উঠিয়েই বলবেন, 'হে রব আমার! আমার উম্মাহ, আমার উম্মাহ!'[১৪৪]

এই হলো নবি ﷺ-এর ভালোবাসা, তাঁর উম্মাহর প্রতি।

কিয়ামাতের কঠিন মুহূর্তে যে নবি তোমায় নিয়ে চিন্তিত থাকবেন, তোমার জন্যে চোখের জল ফেলবেন, তোমার মুক্তির জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন—সে নবিজিকে কীভাবে ভুলে যাচ্ছ? কীভাবে তাঁকে কষ্ট দিচ্ছ? কীভাবে দিনরাত তাঁর সুন্নাহকে অবহেলা করছ?

একদিন নবিজি কুরআনের দুটো আয়াত[১৪৫] পড়ে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আমার উম্মাহ, আমার উম্মাহ।' আল্লাহ ﷻ যদিও সবকিছুই জানেন,

১৪৩. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : তাফসীর, হাদীস : ৪৩৫৩, অধ্যায় : তাওহীদ, হাদীস : ৬৯০৬, ৬৯৩২।
১৪৪. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : তাফসীর, হাদীস : ৪৩৫৩, অধ্যায় : তাওহীদ, হাদীস : ৬৯০৬, ৬৯৩২।
১৪৫. আয়াত দুটো হলো : সূরা ইবরাহীম (১৪)-এর ৩৬ আয়াত এবং সূরা আল-মায়িদাহ (০৫)-এর ১১৮ আয়াত।

তবুও তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে জিবরীল ﷺ-কে পাঠালেন। তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কাঁদছেন কেন?'

নবি ﷺ বললেন, 'আমার উম্মাহর ব্যাপারে কী ফয়সালা করা হবে?'

তাঁর কথা শুনে জিবরীল ﷺ আল্লাহর কাছে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, "আমাকে আপনার রব বলেছেন—'হে জিবরীল! তুমি মুহাম্মাদের কাছে যাও। আর তাঁকে বলো, অচিরেই আপনার উম্মাহর ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব, অসন্তুষ্ট করব না'।"[১৪৮]

ইনিই মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ, যিনি প্রতি মুহূর্তে তাঁর উম্মাহকে নিয়ে চিন্তিত থাকতেন। উম্মাহর জন্যে চোখের পানি ঝরাতেন। উম্মাহর মাগফিরাতের জন্যে রহমানের কাছে দুআ করতেন। ইনিই তোমার নবি। এরপরেও কি তাঁকে ভালোবাসার জন্যে পাগলপারা হবে না?

আবু বাকর যদি তাঁকে ভালোবেসে সমস্ত ধন-সম্পদ উজাড় করে দিতে পারে, বিলাল যদি উত্তপ্ত বালুতে নিজের শরীরে ফোস্কা ফেলতে পারে তাঁকে ভালোবেসে, খাব্বাব যদি তাঁর ভালোবাসায় জ্বলন্ত কয়লায় দগ্ধ হতে পারে, খুবাইব যদি তাঁকে ভালোবেসে হাসিমুখে শূলিতে চড়তে পারে, সুমাইয়া যদি শহীদি মৃত্যুকে বরণ করতে পারে তাঁকে ভালোবেসে, মুসআব যদি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে দিতে পারে তাঁর ভালোবাসায়, আবু তালহা যদি তাঁকে ভালোবেসে তিরের আঘাত বুক পেতে সয়ে নিতে পারে, আবদুর রহমান ইবনু আউফ যদি তাঁর ভালোবাসায় নিজের চেহারাকে ক্ষতবিক্ষত করতে পারে, তবে তুমি কেন পেছনে পড়ে থাকবে? তুমি কেন ভীরু-কাপুরুষের মতো নিজেকে ঘরের কোণে লুকিয়ে রাখবে?

ভাই আমার! নিজের দাবির সাথে প্রবঞ্চনা কোরো না। নিজেকে মিথ্যে ধোঁকা দিয়ো না। ভুলে যেয়ো না—তুমি যিশু, কৃষ্ণ, গণেশ কিংবা রামের উম্মাহ নও। তুমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাহ। যে উম্মাহকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করা হয়েছে। যে উম্মাহর জন্যে মাগফিরাত ও নাজাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। জান্নাতীদের ম্যাক্সিমাম এই উম্মাহ হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

> "যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমি আশা করি, তোমরা (যারা আমার উম্মাহর অংশ) সমস্ত জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে। তোমরা তো অন্যান্য

১৪৮. মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : উম্মাহর জন্যে নবি ﷺ-এর দুআ, হাদীস : ৩১৩।

মানুষের তুলনায় এমন, কালো ষাঁড়ের দেহে কটি সাদা পশম যেমন।"[১৪৭]

রূহের জগতে আল্লাহ সব নবিকে একত্র করেছেন। এরপর প্রত্যেক নবির কাছ থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন—যদি মুহাম্মাদ ﷺ-কে তাঁদের সময়ে পাঠানো হয়—তো প্রত্যেকেই তাঁর ওপর ঈমান আনবে, তাঁকে মেনে চলবে, তাঁকে সাহায্য করবে। সকল নবিরা এ ওয়াদা একবাক্যে মেনে নিয়েছেন। আর স্বয়ং রহমানুর রাহীম এ ওয়াদার ব্যাপারে সাক্ষী হয়ে আছেন।

"(স্মরণ করো) যখন আল্লাহ নবিদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান দান করার পর তোমাদের সাথে যা আছে তার সত্যতা প্রত্যয়নকারী একজন রাসূল আগমন করবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে ও তাকে সাহায্য করবে। তিনি (আল্লাহ) আরও বলেছিলেন, 'তোমরা কি এতে স্বীকৃত হলে ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলে?' তারা (নবিরা) বলেছিল, 'আমরা স্বীকার করলাম।' তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'তোমরা সাক্ষী থেকো এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী হয়ে থাকলাম।'"[১৪৮]

ইনিই সে নবি, যার ওপর ঈমান আনাকে ওয়াজিব করা হয়েছে সমস্ত নবির জন্যে। যাকে সাহায্য করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে প্রত্যেক নবির কাছ থেকে। যাকে ভালোবাসতে মহান রবের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইনিই সে নবি, যাকে পিতা-সন্তান-ভাই-স্ত্রী-বংশ-সম্পদ-ক্যারিয়ার থেকেও তাঁকে বেশি প্রিয় হিসেবে গ্রহণ না করলে কঠিন আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে।

"বলো, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তানেরা, তোমাদের ভাইয়েরা, তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদের স্বগোত্রের লোকেরা, আর ওই ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর ওই ব্যাবসা যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশঙ্কা করো, আর ওই বাসস্থান যেখানে অতি আনন্দে বসবাস করছ—আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর বিধান (শাস্তি) নিয়ে আসেন। আর আল্লাহ অবাধ্য আচরণকারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"[১৪৯]

---

১৪৭. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : আম্বিয়া কিরাম, হাদীস : ৩১১১; মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : বেহেশবাসীর অর্ধেক হবে উম্মাতে মুহাম্মাদি, হাদীস : ৪২২-৪২৫, ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, অধ্যায় : যুহদ, হাদীস : ৪২৮৩।

১৪৮. সূরা আ ল ইমরান, (০৩) : ৮১ আয়াত।

১৪৯. সূরা তাওবা, (০৯) : ২৪ আয়াত।

তাঁর জন্যে প্রতিনিয়ত মাগফিরাত কামনা করে যাচ্ছে রহমতের ফেরেশতারা। রহমানের পক্ষ থেকে অনবরত দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে তাঁর ওপর।

> "আল্লাহ নবির প্রতি অনুগ্রহ করেন, আর তাঁর ফেরেশতারাও নবির জন্যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবির জন্যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করো এবং যথাযথভাবে সালাম জানাও।"[১৫০]

আমি যদি এভাবে বলতে থাকি, তো অনেক বলা যাবে। পুরো কুরআন থেকে এমন অসংখ্য আয়াত দেখানো যাবে, যেখানে আল্লাহ ﷻ তাঁর রাসূল ﷺ-এর সম্মান ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দেখিয়ে কী লাভ হবে বলো। তুমি তো তাঁকে মানতেই প্রস্তুত নও। আর মানলেও পুরোপুরি মানার জন্যে প্রস্তুত নও। তা হলে তোমাকে এসব শুনিয়ে কোনো ফায়দা আছে কি?

ভাই আমার! বিশ্বাস করো, 'আমি রাসূলের জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত'—এসব মৌখিক দাবির কোনো মূল্য নেই, যদি-না তা বাস্তবে রূপায়িত হয়। এমন কথা মুখে সবাই বলতে পারে, কিন্তু বাস্তবে তা খুব কম লোকই রূপায়িত করতে পারে। শুধুশুধু মিথ্যে কথার খই ফুটিয়ে নবিজিকে ভালোবাসা প্রমাণ করা যায় না। নবিজির জায়গায় ফিল্ম স্টারদের বসিয়ে—আমি রাসূলের জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত—এমন দাবি করাটা বড্ডই বেমানান। অনুগ্রহ করে নিজের দাবির ব্যাপারে সৎ হও। রাসূল ﷺ-এর জন্যে জীবন দিয়ে দেবে—এ কথা চিন্তা করা আগে একাকী নিজেকে প্রশ্ন করো, 'আমি আমার জীবনের তুলনায় নবিজিকে বেশি ভালোবাসি তো?'

---

১৫০. সূরা আল-আহযাব, (৩৩) : ৫৬ আয়াত।

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে

"এটা যদি তুমি বিশ্বাস করো যে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন না, তবে তুমি কত বড়ো কুফরীতে লিপ্ত! আর আল্লাহ দেখছেন এ বিশ্বাস নিয়ে যদি তুমি গোনাহে লিপ্ত হও, তবে কত কঠিন তোমার অবাধ্যতা, কত বড়ো তোমার হঠকারিতা! তুমি কত বড়ো অবাধ্য! কত বড়ো নির্লজ্জ!"

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ

উপন্যাস-গল্প-কাব্যে অন্যতম অনুষঙ্গ হলো চাঁদ। চাঁদকে নিয়ে লেখা হয়েছে অগণিত কবিতা, গান। প্রায়শই চাঁদের সাথে তুলনা দেওয়া হয় প্রিয় মানুষটিকে। নবি ﷺ-কে চাঁদের সাথে তুলনা করে নজরুল লিখেছেন,

(ওরে) ও চাঁদ! উদয় হলি কোন জোছনা দিতে!
(দেয়) অনেক বেশি আলো আমার নবির পেশানীতে
(ওরে) রবি! আলোক দিস যতো তুই দগ্ধ করিস ততো,
আমার নবি স্নিগ্ধ শীতল কোটি চাঁদের মতো।[১৫১]

আবার চাঁদের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো।
পাগল হাওয়া বুঝতে নারে, ডাক পড়েছে কোথায় তারে—
ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো।[১৫২]

মজার কথা হলো, সৌরজগতে আরও চাঁদ থাকলেও রুপোলি জোছনা ছড়িয়ে দেওয়া চাঁদ একটিই। পৃথিবীর যে চাঁদ, সেটিই কেবল মায়াবী জোছনায় আকৃষ্ট করতে পারে। কিন্তু শুধু জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দেওয়াই চাঁদের মুখ্য কাজ নয়, বরং প্রাণের বিকাশের জন্যে এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীকে নিজ অক্ষের ওপর ২৩০ ডিগ্রি কোণে হেলে থাকতে সাহায্য করে চাঁদ। পাশাপাশি পৃথিবীর ঘূর্ণনের হার কমিয়ে দেয় এবং জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি করে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, পৃথিবীকে

---

১৫১. নজরুল-রচনাবলী, বাংলা একাডেমি সম্পাদিত, ৭/৯১।
১৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, পৃষ্ঠা : ৩০৮।

২৩০ ডিগ্রি কোণে হেলে থাকতে সাহায্য করা। এটা না হলে পৃথিবীর তাপমাত্রা এমন সংকটময় হয়ে পড়ত যে, প্রাণের বিকাশ সম্ভব হতো না। জ্যোতির্বিদ জ্যাকুয়েস লাস্কার-এর মাধ্যমে জানা যায়—আমাদের জলবায়ুর স্থিতিশীলতার জন্য আমরা এক ব্যতিক্রমী ঘটনার কাছে ঋণী, আর তা হলো চাঁদের উপস্থিতি। তা ছাড়া প্রফেসর পিটার ওয়ার্ড-এর মতে, চাঁদ পৃথিবী থেকে যে দূরত্বে অবস্থিত তার থেকে আরেকটু নিকটে চলে এলে ভূপৃষ্ঠে ঘর্ষণের কারণে এমন তাপ উৎপন্ন হতো যে, ভূপৃষ্ঠই গলে যেত।[১২৩]

এবার আমাদের পৃথিবীর কথা বলি। পৃথিবী প্রতিনিয়ত তার নিজ অক্ষের ওপর ঘুরে। ফলে চব্বিশ ঘণ্টাই পৃথিবীর কোথাও-না-কোথাও রাত থাকে। একে বলে আহ্নিক গতি। এই আহ্নিক গতি যদি না থাকত, তা হলে পৃথিবীর একপাশে ছয় মাস সূর্যের আলো থাকত, অন্যপাশে থাকত অন্ধকার। আহ্নিক গতির কারণে সূর্যতাপের পর অন্ধকারের আগমন ঘটে। ফলে সালোক সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে যায়, শ্বসন প্রক্রিয়া শুরু হয়—যাতে কার্বন ডাই অক্সাইড-এর অভাব না হয় এবং অক্সিজেন কমে না যায়। আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে এ দুটির ভারসাম্য প্রয়োজন। যদি পুরো পৃথিবীতে ছমাস রাত আর ছমাস দিন থাকত, তা হলে সালোক সংশ্লেষণ আর শ্বসনের ভারসাম্য থাকত না। বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ত মানুষের জন্যে।[১২৪]

এই পৃথিবীটাই শুধু মানুষ বসবাসের জন্যে উপযোগী। আর কোনো গ্রহেই মানুষ বেঁচে থাকার মতো পরিবেশ নেই। না মঙ্গলে, না শুক্রে। কোথাও নেই। এই বসুধায় আল্লাহ ﷻ এমন বায়ুমণ্ডল দিয়েছেন, যাতে রয়েছে পর্যাপ্ত অক্সিজেন। এর পরিমাণ এত বেশি নয় যে, অন্যান্য গ্যাসের কার্যক্রমে বাধা দান করবে। বরং এটাকে রাখা হয়েছে একটা পরিমিত পর্যায়ে। আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর মাত্রা এমন রাখা হয়েছে, যাতে কোনো প্রাণের শ্বাস-প্রশ্বাস হুমকির মুখে না পড়ে যায়। অন্যদিকে এই পৃথিবী-নামক গ্রহটাকে বহিরাগত ক্ষয়ক্ষতি থেকে মুক্ত রাখার জন্যে দেওয়া হয়েছে ওজোন স্তর। এটা অনেকটা ছাঁকনির মতো কাজ করে।

পৃথিবী যদি সূর্যের আরেকটু কাছে থাকত, তা হলে তার অবস্থা হতো শুক্রের মতো। ধরণিকে মনে হতো যেন আগুনে সেঁকা বস্তু। আবার যদি এরে চেয়ে সামান্য কিছুটা দূরেও থাকত, তা হলে বরফে ঢেকে যেত গোটা দুনিয়া। অবস্থা হতো ঠিক মঙ্গল গ্রহের মতো। কোনো প্রাণিই আর বেঁচে থাকতে পারত না। পৃথিবী থেকে সূর্যের

---

১২৩. ডা. রাফান আহমেদ, অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়, পৃষ্ঠা : ৭৫-৭৬।

১২৪. জাকারিয়া মাসুদ, সংবিৎ পৃষ্ঠা : ২০৫-২০৬।

দূরত্বটাও একেবারে নিখুঁত। সূর্য আর পৃথিবীর দূরত্ব একেবারে খাপে-খাপ হওয়ার কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা খুব গরমও না, আবার অতি ঠান্ডাও না। যার কারণে পানি তরল অবস্থায় থাকতে পারে। আর যদি পানি তরল অবস্থায় না থাকতে পারত, তবে কোনো প্রাণ টিকে থাকতে পারত না। আবার গ্যালাক্সির দিক থেকে বিবেচনা করলে পৃথিবীটা একেবারে যথাযথ অবস্থানে রয়েছে। কারণ এটা অবস্থান করছে সর্পিলাকার গ্যালাক্সিতে। এটা যদি সর্পিলাকার গ্যালাক্সিতে না হয়ে উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সিতে অবস্থান করত, তবে পৃথিবী আদৌ পূর্ণতা পেত কি না, সন্দেহ আছে।[১৫৫]

"আসলে তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে অবশ্যই তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে।"[১৫৬]

পৃথিবী, পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ, সূর্য-সহ সবকিছুর অবস্থান এতটাই নিখুঁত রাখা রয়েছে যে, এর চেয়ে সামান্য উনিশবিশ হলেই সমস্যায় পড়তে হতো মানুষকে। জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ত। সৌরজগতের সবকিছুকে আল্লাহ এমন অবস্থানে রেখে সৃষ্টি করেছেন, যাতে পৃথিবীতে মানুষ টিকে থাকতে পারে। প্রাণ খুলে নিশ্বাস নিতে পারে। আমরা হয়তো দামও দিই না, অথচ এমন জিনিসও নিযুক্ত করে রেখেছেন আমাদের কল্যাণের জন্যে। এভাবেই আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহ ও দয়া নিয়ে এই পৃথিবী তার ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান টিকিয়ে রেখেছে। আর এই পৃথিবীর ওপর ভিত্তি করেই টিকে আছে মানবসভ্যতা।

যে আল্লাহ এতটা অনুগ্রহ দিয়ে, দয়া দিয়ে, নিয়ামাত দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন তোমাকে, আমাকে, আমাদের সবাইকে; সে আল্লাহর জন্যে কী করেছ?

আল্লাহর বিধানের ওপর বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছু করেছ কি তুমি?

দিওয়ালির দিন হিন্দু মেয়েটার সাথে আবির-রাঙা চেহারার সেলফিটা আপলোড করে Feeling crazy... স্ট্যাটাসটা যখন দিয়েছিলে, স্যাড রিয়েক্ট ছাড়া অন্য কিছু দেওয়ার মতো সাহস হয়নি আমার। আল্লাহর যমীনে থেকে, আল্লাহর নিয়ামাত ভোগ করে, আল্লাহর হুকুমবিরোধী কাজটা এভাবে বুক ফুলিয়ে জানান দিচ্ছ মানুষকে! এটা তোমার কেমন উন্মাদনা! পাপ করার পর সেটা আবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে

১৫৫. ডা. রাফান আহমেদ, অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়, পৃষ্ঠা : ৭৫।
১৫৬. সূরা আল-বাকারাহ, (০২) : ১৬৪ আয়াত।

ছড়িয়ে দেওয়াটা যে কত বড়ো ধৃষ্টতা, তা তোমায় বলে বোঝাতে পারব না আমি।

> "আমার সকল উম্মাত ক্ষমা পাবে, (তবে নিজের পাপের কথা) প্রকাশকারী ব্যতীত। আর নিশ্চয়ই এটা অনেক বড়ো ধৃষ্টতা যে, কোনো ব্যক্তি রাতে অপরাধ করল—যা আল্লাহ (মানুষের কাছ থেকে) গোপন করে রাখলেন—কিন্তু ভোর হলে সে বলে বেড়াতে লাগল—হে অমুক! আমি আজ রাতে এমন কর্ম করে ফেলেছি।... আল্লাহ তার কর্ম (-এর ওপর পর্দা দিয়ে তা) গোপন রেখেছিলেন, আর ভোরে ওঠে সে তার ওপর থেকে আল্লাহর দেওয়া পর্দা খুলে ফেলল।"

সেদিন বন্ধুদের সাথে বসে 'জাস্ট ফ্রেন্ড' নামের একটা মেয়ের দেহ নিয়ে অশ্লীল সব মন্তব্য করছিলে আর হাসাহাসি করছিলে, মনে আছে? লজ্জায় সেখান থেকে উঠে গেছিলাম আমি। কিন্তু তুমি বলেই চলছিলে... গত পরশু তো ব্লু ফ্লিম দেখছিলে ক্লাসে বসে, হঠাৎ স্যার ধরে ফেললেন তোমায়। দূর থেকে আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম, আর তুমি খিকিখিক করে হাসছিলে! আসলে অনবরত পাপ করতে থাকলে এমনই হয়—মানুষ লজ্জাহীন হয়ে পড়ে। ইবনু কায়্যিম ﵀ বলেছেন,

> "গুনাহ বান্দার লজ্জাকে দুর্বল করে ফেলে এমনকি তার অন্তর থেকে (লজ্জাকে) প্রায় সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করে ফেলে। মানুষ তার খারাপ অবস্থা জেনে ফেলবে—সে এটার পরোয়াই করে না। তারা তার ব্যাপারে (কে কী ভাবছে, সে বিষয়ে) সচেতনও হয় না... যখন বান্দা এরকম অবস্থায় পৌঁছে যায় তার মধ্যে আর সংশোধনের আকাঙ্ক্ষা জাগে না।"[১৫৭]

গোনাহ্ মানুষের অন্তরে কালো দাগ সৃষ্টি করে।[১৫৮] একের-পর-এক গোনাহ্ করতে থাকলে অন্তর এমন কলুষিত হয়ে যায় যে, বড়ো বড়ো পাপকেও খুব হালকা মনে হয়। পাপাচারটাই যখন নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন কবীরা গোনাহ হয়ে যায় পান্তাভাতের মতো। ক্রমাগত পাপ করতে থাকলে পাপাচারী মুমিন থেকে আস্তে আস্তে আল্লাহদ্রোহী হয়ে যায় অনেক মানুষ। একটা সময় সে আর কোনো গুনাহকেই খারাপ মনে করে না। বরং সবচেয়ে নিকৃষ্ট অপরাধ করার পরেও লাইভে এসে বুক ফুলিয়ে বলে—'মুসলিম হয়েও এটা করা যায়। নো প্রবলেম!'

---

১৫৭. ইবনু কায়্যিম, আল জাওয়াবুল কাফী, পৃষ্ঠা : ৬৯

১৫৮. "বান্দা যখন কোনো গোনাহ করে, তখন তার হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। কিন্তু সে যদি গোনাহ থেকে বিরত থাকে, ক্ষমাপ্রার্থনা করে এবং তাওবা করে, তবে তার (সে দাগ-পড়া) হৃদয় উজ্জ্বল হয়ে যায়। কিন্তু সে যদি (গোনাহের) পুনরাবৃত্তি করে, তবে কালো দাগ বেড়ে যায়। এমনকি সেটা তার পুরো হৃদয়ের ওপর প্রবল হয়ে ওঠে।" [তিরমিযি, আস-সুনান, অধ্যায় : কুরআনের তাফসীর, হাদীস : ৩৩৩৪]

একটা বাস্তব ঘটনা বলি। ইউকে-তে থাকা এক বাঙালি ছেলে বিয়ে করেছে সাদা চামড়ার এক ফিরিঙ্গি পুরুষকে। বিয়ের ভিডিও অনলাইনেও ছেড়েছে ওরা। বাঙালি কুলাঙ্গারটা সাক্ষাৎকারে বলেছে, 'সে দেখিয়ে দিয়েছে—মুসলিম হয়েও সমকামী হওয়া যায়।' কত বড়ো স্পর্ধা তার! সমকামিতার মতো নিকৃষ্ট একটা কাজ করার পরও বলছে, মুসলিম হয়ে এটা করা যায়! নো প্রবলেম!

অনবরত পাপকাজ এভাবেই শেষ করে দেয় লজ্জাকে। অন্তরকে করে দেয় কলুষিত। সে অন্তর দিয়ে মন্দকে আর মন্দ বলে উপলব্ধি করা যায় না। ফলে লজ্জার কাজটাও নির্লজ্জের মতো করে ফেলে মানুষ।

একদিন হয়তো দেখব তুমিও নুডিস্টদের মতো কক্সবাজার সৈকতে ন্যাংটো হয়ে সমুদ্রস্নান করার জন্যে আন্দোলন শুরু করবে শাহবাগে। নয়তো সমকামিতা বৈধ করার জন্যে রঙধনু পতাকা নিয়ে বৈশাখী শোভাযাত্রায় শরিক হবে কোনো বয়ফ্রেন্ডের হাত ধরে। গার্লস স্কুলের রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার সময় সিগারেটে সুখটান দিয়ে মজা পাবে অনেক বেশি গুণে। কে কী বলল না বলল, সেটা নিয়ে থোড়াই কেয়ার করবে। ক্রমাগত অবাধ্যতা, পাপাচার, অশ্লীলতা তোমার মুখ দিয়েও হয়তো একসময় বের করবে—'মুসলিম হয়েও লিভ টুগেদার করা যায়, নো প্রব্লেম।'

একজন ব্যক্তির কথা কল্পনা করো। সে তার অফিসের বসকে চেনে। এও জানে, তার চাকরি থাকা না-থাকাটা ওই বসের ইচ্ছের ওপর নির্ভরশীল। কিছু বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে এই অফিস ছাড়া অন্য কোথাও চাকরি করার মতো সুযোগ নেই তার। এরপরও সে কারণে-অকারণে অবাধ্য হয় বসের। বস যদি ডানদিকে যেতে বলে, তো বামদিকে যায়। আবার যদি বামদিকে যেতে বলে তো ডানদিকে যায়। আচ্ছা, এই লোকটাকে তুমি কী নামে ডাকবে?

—নির্বোধ।

আরেকজন ব্যক্তি, যে জানে : আল্লাহই হচ্ছেন তার স্রষ্টা, আল্লাহর হুকুমেই সেল ডিভিশন প্রক্রিয়ায় জাইগোট থেকে তার জন্ম হয়েছে। তার যত শক্তি, ক্ষমতা, প্রাচুর্য—সব আল্লাহই তাকে দান করেছেন। সে এও জানে, আল্লাহ যদি না চান, তবে আর কেউই তাকে পরকালে মুক্তি দিতে পারবে না। কিন্তু এরপরও সে আল্লাহর অবাধ্য হয়। অন্যায়-অবিচার-অশ্লীলতায় জড়ায় প্রতিনিয়ত। আবার এসব পাপাচারকে জাস্টিফাই করে নিজের মনগড়া বহুবিধ যুক্তি দিয়ে। এই লোকটাকে তা হলে কী বলে ডাকা যায়?

—নির্বোধ।

—না, এই লোকটা শুধু নির্বোধ নয়। এই ব্যাটা একদিকে নির্বোধ, আরেকদিকে বড়ো যালিম।

—যালিম কেন?

—কারণ, সে জুলুম করেছে।

—জুলুম কী?

—জুলুম হলো কোনো জিনিসকে দিয়ে তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ (ফিতরাতবিরুদ্ধ) কাজ করিয়ে নেওয়া।

প্রত্যেকটি মানুষকে আল্লাহ ﷻ ইসলামি ফিতরাত দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।[১৫৯] প্রতিটি কোষকে তৈরি করেছেন মুসলিম হিসেবে। আর কোটি কোটি কোষের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে মানবদেহের প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তাই প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করতে চায়—এটিই তাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি। কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তি বড়াই দেখিয়ে আল্লাহর হুকুমকে লঙ্ঘন করে, সে তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে তাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ করতে বাধ্য করে। অথচ দেহের একটি কোষও আল্লাহর হুকুমের বাইরে কাজ করতে রাজি নয়। তো যে ব্যক্তি প্রতিটি ক্ষণে নিজের অস্তিত্বের ওপর ক্রমাগত এমন জুলুম করে যাচ্ছে, তার চেয়ে বড়ো যালিম আর কে হবে বলো?

"আর যারা আল্লাহর আইনসমূহ লঙ্ঘন করে, তারাই যালিম।"[১৬০]

এই লোকটা নিমকহারামও বটে।

—নিমকহারাম কেন?

—দাঁড়াও, বুঝিয়ে বলছি সেটা।

যদি কেউ বৃদ্ধ বাবা-মা'র ভরণপোষণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তো সবাই তাকে নিমকহারাম বলে গালি দেয়। কারণ, পিতা-মাতার আদর-যত্ন-ভালোবাসা পেয়েই সে বেড়ে উঠেছে। বাবা-মা ওকে আগলে রাখার কারণেই ওর সুস্থ মানসিক বিকাশ হয়েছে। আর আজ সে বাবা-মা'র দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। নিমকহারাম সে

---

১৫৯. নবি ﷺ বলেছেন, "প্রতিটি মানব-শিশুই ফিতরাত (ইসলাম)-এর ওপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদি, নাসারা অথবা অগ্নিপূজক বানায়।" [বুখারি, আস সহীহ, হাদিস : ১৪৪]

১৬০. সূরা আল-বাকারাহ, (০২) : ২২৯ আয়াত।

তো বটেই। তবে সে সত্তার হুকুমকে অগ্রাহ্য করলে তাকে কী অভিধায় অভিহিত করা হবে, যে সত্তা ওই বাবা-মা'র হৃদয়ে ভালোবাসা সঞ্চার করেছিলেন আর সে ভালোবাসা পেয়েই সন্তানকে বুকে আগলে রেখেছিল দুজনে? সে মহান রবের বিরোধিতা করলে তাকে কী নামে ডাকা হবে, যে প্রতিপালক প্রতিটা মুহূর্তে অক্সিজেন-সহ দামি-দামি সব নিয়ামাত বিনামূল্যে সরবারোহ করে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন? যিনি কখনও রোদ্দুর, কখনও বর্ষণ, কখনও শীতের পরশ, কখনও-বা বসন্ত দিয়ে জীবনধারণের উপযোগী করে রেখেছেন এ ধরণিকে, তাঁর হুকুম অগ্রাহ্যকারীকে নিমকহারাম ছাড়া তাকে আর কীই-বা উপাধি দেওয়া যেতে পারে?

আর যে ব্যক্তি এর চেয়েও একধাপ এগিয়ে গিয়ে—আল্লাহর দেওয়া নিয়ামাতগুলোকে আল্লাহরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করা শুরু করে, আল্লাহর দেওয়া আইন মানতে অস্বীকৃতিজ্ঞাপন করে, তবে তাকে কোন ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হবে? কোনো রাষ্ট্রের আইন মেনে চলতে কেউ অস্বীকৃতি জানলে তাকে যদি রাজদ্রোহী হিসেবে গণ্য করা হয়; তবে সে প্রতাপশালী বাদশাহর আইন মানতে যদি কেউ অস্বীকার করে—যিনি আসমান-যমীন-জান্নাত-জাহান্নাম-আরশ-কুরসি-সহ সবকিছু বানিয়েছেন—তবে তাকে কী নামে ডাকা হবে?

এই উত্তরের অপশনটা তোমার জন্যে ফাঁকা রাখলাম।

যে লোক আল্লাহর হুকুম-আহকামের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের জীবন পরিচালনা করে, সে শুধু সমাজেরই ক্ষতি করে না, নিজেরও ধ্বংস ডেকে আনে। একদিকে সমাজের মধ্যে অশ্লীলতা-অন্যায়-পাপাচার ছড়িয়ে দেওয়ার কারণে মানুষ যেমন তাকে বদদুআ দেয়, তেমনই তার দেহের ওপর জুলুম করার কারণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও তার প্রতি অভিযোগ করতে থাকে। এ অবস্থায় দিন কাটাতে কাটাতে যখন সে আখিরাতে উপস্থিত হবে, তখন দেহের প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর আদালতে তাকে বিদ্রোহী সাব্যস্ত করবে। তারা বলবে—'হে আল্লাহ! এই নিমকহারাম লোকটি আমাদের দিয়ে আমাদের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ করিয়ে নিয়েছে। আমাদের ফিতরাতের বাইরে গিয়ে জুলুম করেছে আমাদের সাথে। সে তোমার দ্রোহী কাজে আমাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক সাহায্য নিয়েছে। আজ তাঁর বিচার করো।'

> "শেষ পর্যন্ত যখন তারা জাহান্নামের নিকট পৌঁছুবে, তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের ত্বককে বলবে, 'আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিচ্ছ?' উত্তরে তারা বলবে, 'যিনি সবকিছুকে

কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও (আজ) কথা বলার শক্তি দান করেছেন।'"[১৬১]

কোনো কাজে আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার আগে বিষয়গুলো একটু স্মরণে রেখো। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি আছে বলে হারামের মধ্যে ডুবে দুনিয়া কাঁপিয়ো না আপন-মনে; স্টেরয়েড নিয়ে ট্রাইসেপস্ ফুলিয়েছ বলে তা দেখিয়ে বেরিয়ো না টি-শার্ট ভাজ করে; ললনাদের আকৃষ্ট করতে উল্কি এঁকো না দেহে। আল্লাহর দেওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর হুকুমের বাইরে কাজ করিয়ে, ক্রমাগত জুলুম কোরো না ওদের ওপর। আল্লাহর শপথ! কাল এ দেহের প্রতিটা সেল তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। প্রকাশ করে দেবে তোমার গোনাহগুলো। আল্লাহর আদালতে দাঁড়িয়ে এক এক করে সব বলে দেবে ওরা।

"(দুনিয়ায়) তোমরা এই ভেবে কিছু গোপন করতে না যে, তোমাদের কান, চোখ, ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না! তোমরা তো মনে করতে—তোমার যা করো, তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। তোমাদের এই (ভুল) ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনে দিয়েছে।"[১৬২]

তুমি কখনোই চাইবে না, মাস্টারবেশানরত অবস্থায় তোমার বাবা তোমায় দেখে ফেলুক। কারণ বাবার সামনে ন্যাংটো হওয়াটা যে সরমের কাজ, তা তুমি ঠিকই বোঝো। তবে কেন এটা বুঝো না যে, পর্ন দেখতে দেখতে আল্লাহর সামনে ন্যাংটো হয়ে মাস্টারবেশান করাটা আরও সরমের কাজ?

সবাইকে ফাঁকি দিয়ে হয়তো দরজার ওপাশে গোনাহ করতে পারবে ইচ্ছেমতো; কিন্তু আল্লাহর নজরকে ফাঁকি দেবে কীভাবে? কীভাবে আল্লাহর চোখ থেকে আড়াল করবে নিজেকে? এমন কোনো জায়গা কি তুমি খুঁজে পাবে, যেটা আল্লাহর দৃষ্টিসীমার বাইরে?

"কোনো দৃষ্টি তাঁর নাগাল পায় না বরং তিনিই সব দৃষ্টি নাগালে রাখেন। আর তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।"

কোনো জায়গা তো দূরে থাক, তোমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষাও আল্লাহর আওতার বাইরে নয়। অন্তর দিয়ে যা কিছুই কল্পনা করো না কেন, সেটাও আল্লাহ জানেন।

---

১৬১. সূরা ফুসসিলাত/হা-মীম-সিজদাহ, (৪১) : ২০-২১ আয়াত।
১৬২. সূরা ফুসসিলাত/হা-মীম-সিজদাহ, (৪১) : ২২-২৩ আয়াত।

"আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি, আর তার মন তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয়, তাও আমি জানি।"[১৬৩]

ভাই আমার! নিজের প্রবৃত্তি যখন গোনাহ্ করতে চায়, তখন আল্লাহর দৃষ্টির কথা স্মরণ করো। তোমার দৃষ্টি যতদিকে আপতিত হয়, তার মধ্যে আল্লাহর দৃষ্টিকে তুচ্ছ মনে কোরো না। ঘুণাক্ষরেও এটা ভেবো না, আল্লাহ তোমাকে পর্যবেক্ষণ করছেন না। দেখছেন না কিছু।

"অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের পর্যবেক্ষণে রেখেছেন।"[১৬৪]

"তিনি তার বান্দাদের সব খবর রাখেন, সবকিছু দেখেন।"[১৬৫]

আল্লাহ সহনশীল, তাই সব দেখার পরও সহ্য করছেন। তাই তাঁর সহনশীলতা আর মহানুভবতার কারণে ধোঁকা খেয়ো না। ক্রমাগত পাপ করতে থাকার পরও যদি উন্নতির শিখরে পৌঁছে যাও, তবুও আত্মপ্রবঞ্চিত হোয়ো না। মনে রেখো, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে দেওয়া সামান্য অবকাশমাত্র।

"তোমরা কখনও মনে কোরো না যে, যালিমরা যা করে আল্লাহ সে ব্যাপারে উদাসীন, আসলে তিনি তাদেরকে সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন, যে দিন (ভয়ে-আতঙ্কে) তাদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে।"[১৬৬]

"আমি তাদেরকে শুধু এই জন্যে অবকাশ দিচ্ছি—যাতে তাদের পাপের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়, আর তাদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।"[১৬৭]

এই অবকাশের সময়টা পেরিয়ে গেলে ঠিক আগুনের শেকল দিয়ে পাকড়াও করা হবে। সে দিনটি এত ভীতিকর হবে যে, আতঙ্কে বাচ্চা শিশুটিও বুড়ো মানুষের মতো হয়ে যাবে। মমতাময়ী মা ভুলে যাবে তার ছোট্ট সোনামণিকে। মানুষগুলো ক্রমাগত মাতলামো করতে থাকবে আযাবের তীব্রতা দেখে।

"সেদিন তুমি দেখবে প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী (মা) তার দুধের শিশুর কথা ভুলে যাবে

১৬৩. সূরা কাফ, (৫০) : ১৬ আয়াত।
১৬৪. সূরা নিসা, (০৪) : ১ আয়াত।
১৬৫. সূরা বানী ইসরাঈল, (১৭) : ৯৬ আয়াত।
১৬৬. সূরা ইবরাহীম, (১৪) : ৪২ আয়াত।
১৬৭. সূরা আ ল ইমরান, (০৩) : ১৭৮ আয়াত।

> এবং প্রত্যেক গর্ভবতী (নারী) গর্ভপাত করে ফেলবে; আর মানুষকে দেখবে মাতালের মতো, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহর আযাব বড়োই কঠিন (যার জন্যে তাদের এমন অবস্থা হবে)।"[১৬৮]

হে মিসকিন! সেদিন তোমার অবস্থা কী হবে?

প্রিয় ভাই আমার, বন্ধু হে আমার!
কেন পাপের পথে, ভ্রান্ত রথে, জীবন করিছ পার?
যিনি পাঠালেন তোমায়, এই বসুধায়, নিজ খলিফা করে,
কেন ভুলিয়াছ তাঁকে, জীবনের বাঁকে, চিরজনমের তরে?
কোন সাহসে, অনায়েশে, অবাধ্য হইছ তাঁর—
যার হুকুমে সৃজিয়াছে এই বিশ্বপরাপার?
প্রিয় ভাই আমার, বন্ধু হে আমার!
রবের পথে ফিরতে যদি দেখাও অহংকার,
হৃদয়মাঝে বাড়বে কেবল ব্যথা-বেদনার ভার।
শান্তি খুঁজে পাবে নাকো জগৎসংসারকাজে
সব পেয়েও ভবে, নিজেরে স্মরিবে, সবহারাদের মাঝে
কেন চলার পথে আনিছ ডাকিয়া নিকষকালো আঁধার?
দুঃখ ভোলাও, আলোক জ্বালাও—সজলআলোকধার।
প্রিয় ভাই আমার, বন্ধু হে আমার!
নীমিলিত যদি করিতে চাও তব হিয়াখানি,
বিশ্ববিধাতার হুকুম যত মাথা পেতে নাও মানি।
অন্তর তব পরিশুদ্ধ করো পুণ্যপরশলোকে,
দূর করো জমানো কালিমা আর শয়তানি ভাবনাকে।
প্রভু তোমার, দয়ার আঁধার, চিরনিবিড়উদার,

---

১৬৮. সূরা হাজ্জ, (২২) : ২ আয়াত।

হাত বাড়াও, ঠাঁই করে নাও, জান্নাতে আপনার
প্রিয় ভাই আমার, বন্ধু হে আমার!

অধ্যায়

১৩

সময়ের ভ্রান্তিতে টলো না, লড়াইটা কখনোই ভুলো না

“কিয়ামাতের দিন আল্লাহ আকাশমণ্ডলী গুটিয়ে নেবেন। অতঃপর আকাশমণ্ডলীকে তিনি ডান হাতে ধরে বলবেন, ‘আমিই বাদশাহ। কোথায় প্রতাপশালী লোকেরা, কোথায় অহংকারীরা?’ এরপর তিনি বাম হাতে সমস্ত যমীন গুটিয়ে নেবেন এবং বলবেন, ‘আমিই বাদশাহ। প্রতাপশালী লোকেরা কোথায়? কোথায় অহংকারীরা?’”

[মুসলিম, আস-সহীহ, হাদিস : ৬৭৯৪]

'ইসলামোফোবিয়া'—অতি পরিচিত একটা শব্দ। তবে এর বিষয়বস্তু অনেক পুরোনো। যেদিন থেকে নবি ﷺ সত্যের বাণী প্রচার করা শুরু করেছিলেন, সেদিন থেকেই তার সূত্রপাত। নবিজির সত্যের দাওয়াতকে মুশরিকরা যখন বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন থেকেই ওরা ইসলামোফোবিয়া ছড়িয়েছে। আসলে মিথ্যের যে পাহাড়ের ওপর তারা রাষ্ট্রের ভীত স্থাপন করেছিল, মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাওয়াত তাতে ঝাঁকুনি দিয়েছিল প্রবলভাবে। নীতিহীন সমাজব্যবস্থার যে ছক তারা জিইয়ে রেখেছিল বছরের-পর-বছর ধরে, ন্যায় ও ইনসাফের ধর্ম ইসলাম এসে সে ছককে কুটিকুটি করে দিয়েছিল একেবারে। কুরআন এসে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল ওদের কাব্যসাহিত্যের অহমিকাকে। ইসলাম নিয়ে ওদের গা-জ্বালাটা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। শত বাধা-বিপত্তি, মাত্রাহীন নিপীড়ন আর অবর্ণনীয় অত্যাচার সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল ﷺ ও তাঁর সাথিদের যখন সত্যের আদর্শ থেকে সরাতে ব্যর্থ হলো তারা, তখন থেকেই 'ইসলামোফোবিয়া' ছড়াতে আরম্ভ করল। 'মুহাম্মাদের অনুসারীরা টেরোরিস্ট, ওরা শান্তিপূর্ণ সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়, ঘরের কোণে বন্দি করে রাখতে চায় নারীদের, কুরআন মুহাম্মাদের বানানো কিতাব, ইসলামের রীতিনীতিগুলো বর্বর'—এগুলো নতুন কোনো কথা নয়। সবই মক্কার পৌত্তলিক কুরাইশদের বুলি।

একবিংশ শতাব্দীতে এসে কুরাইশদের আদর্শিক উত্তরসূরিরা সে পুরোনা-পন্থারই পুনরাবৃত্তি ঘটাতে শুরু করেছে। অবিশ্যি তারও কিছু কারণ আছে। একমাত্র ইসলামি ভাবাদর্শই যে পাশ্চাত্যের সাথে টেক্কা দিয়ে বিজয়ী হওয়ার যোগ্যতা রাখে, সেটা আমরা না জানলেও ওরা ভালোভাবেই জানে। ওদের মাথাচিকন বুদ্ধিজীবী স্যামুয়েল সায়েব অনেক আগেই বলেছেন :

"ইসলামি মৌলবাদ পশ্চিমাদের জন্যে মূল সমস্যা নয়; বরং সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন

সভ্যতার ধারক হওয়ার কারণে পুরো ইসলামটাই তাদের কাছে সমস্যার।"[১৬৯]

এ শতাব্দীর কুরাইশদের আদর্শ যখন আল্লাহর দ্বীনের সাথে টক্কর দিতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন তারাও এর বিরুদ্ধে একত্র হয়ে মাঠে নেমেছে। সম্মুখ সমরে তো বটেই, লড়াই করে যাচ্ছে পর্দার আড়াল থেকেও। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে এর পেছনে। যুক্তরাষ্ট্রের Center for American Progress-এর একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ২০০১-২০০৯ পর্যন্ত ইসলামোফোবিয়া ছড়ানোতে নিয়োজিত দলগুলো ৪২.৬ মিলিয়ন ডলারের বেশি অনুদান পেয়েছে।[১৭০]

টাকায় নিলে সংখ্যাটা কত দাঁড়াবে?

প্রায় সাড়ে তিন শ কোটি।

সম্প্রতি আরও বেড়েছে এ অনুদানের পরিমাণ। ২০১৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Berkeley Center for Race & Gender এবং CAIR-এর একটি যৌথ গবেষণায় দেখা যায়, ২০০৮-২০১৩ পর্যন্ত ইসলামোফোবিয়া ছড়ানোতে নিয়োজিত দলগুলো অনুদান পেয়েছে ২০৫ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি।[১৭১] এগুলো ব্যয় করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের 'ইসলামোফোবিয়া' নেটওয়ার্কের মাধ্যমে, যাদের মূল কাজই হলো বিশ্বে 'ইসলামভীতি' ছড়িয়ে দেওয়া।[১৭২] এটি যদি শুধু যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যান হয়, তা হলে গোটা বিশ্বে কী পরিমাণ নেটওয়ার্ক ইসলামবিদ্বেষ ছড়ানোর কাজে যুক্ত আছে?

এ তো গেল পর্দার আড়ালের কথা। সম্মুখ সমরের অবস্থা তো আরও ভয়াবহ। Brown University's Watson Institute of International and Public Affairs-এর একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, অ্যামেরিকা 'war on terror'-র পেছনে এ যাবৎ ব্যয় করেছে ৫.৯ বিলিয়ন ডলার। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ Joseph E. Stiglitz এবং হার্ভার্ড-এর লেকচারার Linda J. Bilmes এর মতে—শুধুমাত্র ইরাক যুদ্ধে ২ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি খরচ বহন করতে হয়েছে অ্যামেরিকাকে।[১৭৩] এ যুদ্ধে

১৬৯. Samuel P Huntington, The Clash of Civilizations, pp.217-218

১৭০. https://www.americanprogress.org/issues/religion/report/2011/08/26/10165/fear-inc/

১৭১. https://www.theguardian.com/us-news/2016/jun/20/islamophobia-funding-cair-berkeley-report

১৭২. https://www.theguardian.com/us-news/2016/jun/20/islamophobia-funding-cair-berkeley-report

১৭৩. https://www.reuters.com/article/us-iraq-war-anniversary/iraq-war-costs-u-s-more-than-2-trillion-study-idUSBRE92D0PG20130314

প্রতিদিনের ব্যয় ছিল ৭২০ মিলিয়ন ডলার।[১৭৪] ইরাক, আফগান, পাকিস্তান-সহ গড়পড়তায় ৭৬টি দেশ আক্রমণ চালিয়ে প্রায় ৬ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে ওরা। যাদের বেশিরভাগই সিভিলিয়ান।[১৭৫]

শান্তির ফেরিওয়ালা অ্যামেরিকার এই রূপটা হয়তো তুমি খুঁজে দেখোনি কোনোদিন। শান্তিকামী অশান্ত অপরাধী এই দেশটি শুধুমাত্র ২০১৬ সালে মুসলিমবিশ্বে ফেলেছে ২৬ হাজারের বেশি বোমা।[১৭৬] কিন্তু মেইনস্ট্রিম মিডিয়াতে হাইলাইড হয়নি নিউজগুলো। অথচ পান থেকে চুন খসলেই মুসলিমদের দিকে তেড়ে আসে অশান্ত অপরাধীর মিডিয়াদালালরা। ১০ লাখ উইঘুর মুসলিমকে কনসট্রাকশান ক্যাম্পে রেখে জোর করে সমাজতন্ত্র শেখানো হচ্ছে চীনে, শোকর খাওয়ানো হচ্ছে, রেইপ করা হচ্ছে নারীদের—কিন্তু এটা নিয়ে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য নেই। অথচ কয়েক হাজার শিয়াকে বাঁচাতে একের-পর-এক বোমা ফেলে মসূল থেকে রাক্কা সমান করে দেওয়া হয়েছে। এখানে কিন্তু মিডিয়াদালালরা নির্বাক। নিশ্চুপ।

কেন?

কারণ ইসলামোফোবিয়া।

তুমি হয়তো শুনে অবাক হবে—যে ইসলামের বিরুদ্ধে তারা এত চক্রান্ত করছে, সে ইসলামই তাদের দেশগুলোতে সর্বাধিক বর্ধিষ্ণু ধর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রতি বছর শত শত অমুসলিম ইসলামে প্রবেশ করছে নিজের ইচ্ছায়। 'Islam is the fastest-growing religion in Europe' নামে প্রতিবেদন ছাপিয়েছে Pew Research Center. তারা বলছে—১৯৯০ সালে ইউরোপে (তুরস্ক বাদে) মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ৩০ মিলিয়ন, যা ২০১০ সালে ৪৪ মিলিয়নে রূপান্তরিত হয়। এ সংখ্যাটা বাড়তে বাড়তে ২০৩০ সালে ৫৮ মিলিয়ন অতিক্রম করবে (ইন শা

---

১৭৪. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/09/21/AR2007092102074.html

১৭৫. https://www.businessinsider.com/the-war-on-terror-has-cost-the-us-nearly-6-trillion-2018-11

https://www.aljazeera.com/news/2018/11/wars-terror-killed-million-people-study-181109080620011.html

১৭৬. https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/09/america-dropped-26171-bombs-2016-obama-legacy

আল্লাহ)।[১৭৭]

যেদিন থেকে মুহাম্মাদ ﷺ এ দ্বীনের প্রচার শুরু করেছেন, সেদিন থেকেই চক্রান্ত চলছে ইসলামের বিরুদ্ধে। ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করা হচ্ছে ইসলামের নাম নিশানা দুনিয়া থেকে মুছে ফেলার জন্যে। ছাপানো হচ্ছে হাজার হাজার পৃষ্ঠার ইসলামবিরোধী বই। ভাড়া করা হচ্ছে মুসলিম নামধারী গাদ্দারদের (যাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ইসলামি বটে কিন্তু মন-মগজ পুরোটাই ফিরিঙ্গিদের দখলে)। এসব গাদ্দারদের দিয়ে ইসলামের এমন রূপরেখা সমাজে প্রচার করা হচ্ছে, যার সাথে আল্লাহ-প্রদত্ত ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলামের বদলে ওরা 'ইজলাম' প্রচার করছে। শত শত অর্গানাইজেশান বিশ্বব্যাপী ইসলামবিদ্বেষী প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে নানাবিধ কৌশলে। পাথেয়, মুভ, রূপবান, কিংবা রংধনু নাম দিয়ে চাতুরতার সাথে ঢুকে যাচ্ছে আমাদের সমাজে।

কিন্তু বুমেরাং হয়ে যাচ্ছে ওদের সব পরিকল্পনা। অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ব্যবহার করেও এই উম্মাহর ওপর জয়ী হতে পারেনি সাম্রাজ্যবাদী লুটেরার দল। ফিরিঙ্গিরা একসময় দাম্ভিকতা করে বলত—The sun never sits in the British empire. ওদের এই দাম্ভিকতার পরাজয় হয়েছে। ভেঙে খান-খান হয়ে গেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। কিন্তু আরশে আজীমের অধিপতি মহান আল্লাহর সাম্রাজ্যে বিন্দুপরিমাণও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি। আর সে মহান আল্লাহই হচ্ছেন ইসলামের রব, যিনি এ দ্বীনকে বিজয়ী করার ওয়াদা করেছেন।

> "তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে—সকল দ্বীনের ওপর তা বিজয়ী করার জন্যে, যদিও মুশরিকরা সেটি অপছন্দ করে।"[১৭৮]

ওদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে ইসলাম ঠিকই ওদের কান বরাবর প্রতিদিন পাঁচবার 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে। আসলে কাফিররা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, আল্লাহর সামনে মাছির ডানার সমানও নয়। ওদের

১৭৭. "The future of the global muslim population – Europe (excluding however Turkey and including Siberian Russia)" Pew Research Center. January 27, 2011.

http://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe/

১৭৮. সূরা আস-সফ, (৬১) : ৮-৯ আয়াত।

চক্রান্তগুলো মহাপ্রতাপশালী রবের কৌশলের সামনে তাসের ঘরের মতোই ক্ষণস্থায়ী। নাহ, বরং আরও দুর্বল!

> "তাদের অবস্থা হলো মাকড়সার মতো। সে ঘর বানায়, আর ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো সবচেয়ে দুর্বল; যদি তারা জানত।"[১৭৯]

যুগে যুগে ওরা চক্রান্ত করেছে, সামনে আরও করবে। কিন্তু শত চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দিয়ে ইসলাম ঠিকই এগিয়ে যাবে সম্মুখ পানে। আহমাদ দিদাত ﷺ বলতেন,

> 'তোমাকে ছাড়াই ইসলাম বিজয়ী হবে। কিন্তু ইসলাম ছাড়া তুমি হেরে যাবে, হারিয়ে যাবে।'

আল্লাহর শপথ! তিনি এক বিন্দুও মিথ্যে বলেননি। ইসলাম এমন দ্বীন, যার ওপর তুমি জন্মগ্রহণ করেছিলে।[১৮০] তোমার শান্তি-কামিয়াবি-সফলতা সব ইসলামের মধ্যে। তোমাকে অবশ্যই শেকড়ের দিকে ফিরে আসতে হবে। একেবারে মূলে। যেহেতু ফিরতেই হবে, তাই গড়িমসি করে লাভ নেই কোনো। সময়ের ভ্রান্তিতে পড়ে নিজেকে আর আত্মপ্রবঞ্চিত কোরো না। দেয়ালে লেখা একটি স্লোগান মনে ধরেছিল খুব, তাই মুঠোফোনে ক্যামেরাবন্দি করেছিলাম সাথে সাথে। আমার খুব ইচ্ছে করছে সেটা তোমায় বলি :

সময়ের ভ্রান্তিতে টলো না
লড়াইটা কখনোই ভুলো না

আল্লাহ ﷻ কিয়ামাতের ময়দানে প্রতিটি মানুষকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন, যার একটি প্রশ্ন হবে—'যৌবন কোন কাজে ব্যয় হয়েছে?' কাবার রবের শপথ! ওই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া কেউ এক-পা সামনে এগোতে পারবে না।

> "কিয়ামাত-দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা হওয়ার আগপর্যন্ত আদম-সন্তান দু-পা আল্লাহর সামনে থেকে সরাতে পারবে না—(যার একটি প্রশ্ন হলো) যৌবন কীভাবে অতিবাহিত করেছে?"[১৮১]

---

১৭৯. সূরা আনকাবূত, (২৯) : ৪১ আয়াত।

১৮০. নবিজি বলেছেন, "প্রতিটি মানব-শিশুই ফিতরাত (ইসলাম)-এর ওপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদি, নাসারা অথবা অগ্নিপূজক বানায়।" [বুখারি, আস সহীহ, হাদীস : ১৪৪]

১৮১. তিরমিযি, আস সুনান, হাদীস : ২৪১৬, আলবানি, আস সহীহা, হাদীস : ৯৪৬।

যদি যৌবনের সবটা সময় ক্যারিয়ারের পেছনেই ব্যয় হয়ে থাকে, তো কী জবাব দেবে সেদিন? কোন মুখ নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে তুমি?

কিয়ামাতের সে ভয়াবহ মুহূর্তে সাত প্রকার মানুষকে আল্লাহ ﷻ আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন[১৮২] :

১) ন্যায়পরায়ণ শাসক।

২) যে যুবক যৌবনে আল্লাহর ইবাদাতে নিমগ্ন থাকে।

৩) যার অন্তর সম্পৃক্ত থাকে মাসজিদের সাথে।

৪) যে দুই ব্যক্তি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই পরস্পর মহব্বত রাখে।

৫) সুন্দরী নারী অবৈধ মিলনের জন্যে ডাকলে যে ব্যক্তি বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।'

৬) যে ব্যক্তি গোপনে সদাকা করে।

৭) যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে নির্জনে চোখের জল ফেলে।

এই সাত প্রকারের ব্যক্তিরা কোনো ঝুটঝামেলার মুখোমুখি হবে না। হাউজে কাওসার পান করতে থাকবে নিশ্চিন্তমনে। সুবহানাল্লাহ! এই সাতটি বৈশিষ্ট্যই তোমার দ্বারা পূর্ণ করা সম্ভব। কিন্তু সে চেষ্টা কি আর করবে তুমি!

তুমি একবারও ভাবো না—তেজদীপ্ত যৌবন একদিন হার মানবে বয়সের ভারের কাছে?

একটা সময়ে শরীরের শক্তি কমে যাবে এলাকার সবচেয়ে দুষ্ট ডানপিটে ছেলেটার। হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে-পারা ব্যক্তিটাও মুটিয়ে যাবে বৃদ্ধকালে। রাতের-পর-রাত জেগে কাটানো ছেলেটা বার্ধ্যকে এসে বারবার ঢলে পড়বে ঘুমের-ঘোরে। বাহারি রঙের খাবার খেতে খেতে রেস্টুরেন্টের খাবার-তালিকা মুখস্থ করে ফেলেছিল যে কিশোর, তার পাকস্থলীও একটা সময় জাংফুড হজম করতে হিমশিম খাবে। একদিন সবাই হার মানবে বয়সের ভারের কাছে। তাই তো নবি ﷺ বলেছেন,

> "পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটি বস্তু আসার পূর্বেই গনীমাত মনে করে মূল্যায়ন করো : বার্ধ্যকের পূর্বে যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, দারিদ্রের পূর্বে প্রাচুর্যকে,

---

১৮২. বুখারি, আস সহীহ, হাদীস : ১৩৪০।

ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে।"[১৮৩]

তুমি যুবক, অথচ অধিকাংশ সময়ই কাটিয়ে দিচ্ছ আল্লাহদ্রোহীতায়। বড়ো আফসোস তোমার জন্যে! ক্যারিয়ার-গার্লফ্রেন্ড-সিনেমা-ফেইসবুক-ইউটিউব ইত্যাদি নানান কাজে ব্যস্ত তুমি। তোমাকে যখন এ কথাগুলো মনে করে দিই, তুমি শুধু বলো—'যাক না কটা দিন। এখন যৌবন। এনজয় করার সময়। বিয়ে করি, ছেলেপেলে বিয়ে দিই, নাতি-নাতনি হোক; তখন নাহয় দেখা যাবে। এত তাড়া কীসের!' কতই-না হঠকারী চিন্তাভাবনা তোমার! তুমি যৌবনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সময়টা রেখেছ নিজের আমোদ-প্রমোদের জন্যে, আর বার্ধক্যটা আল্লাহর জন্যে!—একজন মুসলিম হিসেবে এর চেয়ে আফসোসের বিষয় আর কী হতে পারে।

যৌবন তব করিলে পার অবহেলা-অনাদরে,

বৃদ্ধকালখানি রাখিয়া দিয়াছ মহান রবের তরে?

একি ছলনার-মাঝে সকাল-সাঁঝে পড়িয়াছ তুমি হায়,

পরপারে এসব ভোগাবে তোমায়, ভাবোনি কি নিরালায়?

ভাই আমার! অনেক তো হলো। আর কত? মিথ্যে মোহ আর নাটুকেপনা ঝেড়ে ফেলে এবার ফিরে এসো। সুপ্ত প্রতিভাগুলোকে গলা টিপে হত্যা কোরো না নিজ হাতে। তোমার মধ্যে যে সুন্দর কুঁড়িটা লুকোনো আছে, সেটাকে অবহেলায় অনাদরে বিনষ্ট হতে দিয়ো না। তাকে পুষ্প হতে দাও। এমন পুষ্প, যেটা নীরবে-নিভৃতে বেড়ে উঠবে। যার সৌন্দর্য, সুরভিত কোমল হাওয়া—বিমোহিত করবে সবাইকে। হয়তো কেউ তার পাপড়ি ছিঁড়ে নেবে, কেউ-বা তার স্রষ্টার প্রশংসা করবে। হোক না, তাতে কী। প্রাপ্তি তো সব ওপারে। যত পারো সুবাস ছড়িয়ে দাও। স্নিগ্ধ করো বিষাক্ত ধরণিকে। সুরভিত করো দূষিত পবনকে। মানুষ নিশ্বাস নিক প্রাণ খুলে। মন ভরে।

---

১৮৩. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হাদীস : ১০২৪৮, আলবানি, সহীহুল জামে, হাদীস : ১০৭৭।

অধ্যায়

১৪

তুমি ফিরবে বলে...

"হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি সন্তুষ্টচিত্তে ও সন্তোষভাজন হয়ে তোমার প্রভুর কাছে ফিরে এসো। অতঃপর আমার (প্রিয়) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।"

[সূরা আল-ফাজর, (৮৯) : ২৭-৩০ আয়াত]

আর আট দশটা বাবা-মা'র মতো হ্যারলড শিপম্যানের বাবা-মাও সন্তানকে ডাক্তার বানানোর স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু সন্তানকে মেডিক্যালে ভর্তি করানোর আগেই ওর মা মারা গেল। হাল ছাড়লেন না বাবা। ছেলেকে ভর্তি করিয়ে দিলেন লিডসের এক মেডিক্যাল কলেজে। যথারীতি কমপ্লিট হলো তার গ্র্যাজুয়েশান।

শিপম্যান তার কর্মজীবনে প্রবেশ করল আবরাহাম ওমেরড মেডিক্যাল সেন্টারের মাধ্যমে। আস্তে আস্তে এই মেডিক্যাল সেন্টারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হলো সে। কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটতে লাগল। ওর অধীনে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের মৃত্যুহার রহস্যজনকভাবে বাড়তে লাগল। রহস্য আরও জট পাঁকাল যখন তুচ্ছ কারণে অসুস্থ হয়ে যাওয়া বয়স্ক মহিলারাও তার অধীনে চিকিৎসা নিতে এসে লাশ হয়ে ফিরে যেতে লাগল। গঠন করা হলো মেডিক্যাল ইনকুয়েরি বোর্ড। শুরু হলো রোগীদের মৃত্যুর সঠিক কারণ অনুসন্ধানের কাজ।

তদন্তের মাধ্যমে জানা গেল, শিপম্যান রোগীদের হত্যা করেছে মরফিনের লিথাল ডোজ প্রয়োগের মাধ্যমে। পুলিশ গ্রেফতার করলো ওকে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দেওয়া হলো গোয়েন্দা বিভাগকে। গোয়েন্দারা জানাল, ১৯৭৫-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত মরফিন প্রয়োগে দু শ পনেরো জন রোগীকে হত্যা করেছে শিপম্যান। খুন করার জন্যে সে বেছে নিত বয়স্ক মহিলাদের। ওর কাছে চিকিৎসা নিতে আসা বয়স্ক মহিলারা আর জীবিত অবস্থায় বাড়ি ফিরতে পারত না। তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত হলো সে। আদালত ওকে যাবজ্জীবন কারাবাসের শাস্তি দিলো।

শিপম্যানের পুরো নাম Harold Frederick Shipman. ১৯৪৬ সালের ১৪ই জানুয়ারি তার জন্ম। মৃত্যু ১৩ই জানুয়ারি, ২০০৪। জন্মদিনের আগের দিন জেলের ভেতর ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করে শিপম্যান। তার মৃত্যুর পর আরেকটি তদন্ত থেকে জানা যায়, ২৫০+ রোগীকে হত্যা করেছিল সে। এখন পর্যন্ত সিরিয়াল কিলিং-

এ পুরো বিশ্বে ওর অবস্থান প্রথম।

বানী ইসরাঈলের মাঝেও শিপম্যানের মতো একজন খুনি ছিল।[১৮৪] একে একে নিরানব্বইটি খুন করেছিল সে। আড়াই শ খুন করেও শিপম্যানের মনে অনুশোচনা আসেনি, কিন্তু নিরানব্বই নম্বর খুন করার পর কেন জানি অনুশোচনা জন্ম নিল ওর মনে—শিপম্যানের সাথে তার তফাতটা ছিল এই জায়গাতেই। তাওবার প্রস্তুতি নিল সে। বাড়ি ছাড়ল নাজাতের পথ পাবার আশায়। পথ চলতে চলতে দেখা হলো এক পাদরির সাথে। পাদরির কাছে জানতে চাইল, 'আমার তাওবা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?' পাদরি বলল, 'কক্ষনো না। তুমি মস্ত পাপী। তোমার তাওবার কোনো সুযোগ নেই।'

খুন চেপে বসল তার মাথায়। রাগে-ক্ষোভে শেষমেশ পাদরিকেও হত্যা করল। কিন্তু মনের মধ্যে অনুতাপের যে আগুন জ্বলছিল দাও দাও করে, তা সে নেভাবে কী দিয়ে! তাই তো এমন কাউকে খুঁজতে লাগল, যে তাওবার পথ বলে দিতে পারে। লোকজন তার আগ্রহ দেখে বলল, 'তুমি অমুক জায়গায় যাও। সেখানে একজন ভালো লোক আছেন। উনি তোমায় তাওবার পথ বলে দিতে পারবেন।'

রওনা হলো সে। কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছুনোর মতো সৌভাগ্য হলো না তার। পথিমধ্যেই মারা গেল। ইতোমধ্যে দু-দল ফেরেশতা এল। একদল রহমতের, আরেক দল আযাবের। কোন দল ফেরেশতা তার রূহ নিয়ে যাবে, এই নিয়ে তর্ক শুরু করল তাঁরা। সে ছিল সিরিয়াল কিলার। গুনে গুনে এক শ মানুষ হত্যা করেছে। তাই আযাবের ফেরেশতারা তার লাশ নিতে চাইল। কিন্তু রহমতের ফেরেশতারাও ছাড় দিতে নারাজ। কারণ, লোকটি তাওবার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। আর তাওবা করার পর ব্যক্তির তো কোনো গোনাহ থাকে না। দু-দল যখন নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল, তখন আল্লাহ ﷻ বললেন, 'তোমরা এখান থেকে উভয় দিকের দূরত্ব পরিমাপ করো। (সে যদি তাওবার পথে বেশিদূর এগোয়, তবে তার লাশ রহমতের ফেরেশতারা নিয়ে যাবে)।'

পরিমাপ করে দেখা গেল, তাওবার দিকে এক বিঘত রাস্তা বেশি অতিক্রম করেছিল সে। আসলে রাস্তা সে নিজে অতিক্রম করেনি, আল্লাহ ﷻ তার জন্যে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন যমীনকে। ফলে সে তাওবাকারী হিসেবে গণ্য হয় এবং রহমতের ফেরেশতারা তার লাশ নিয়ে যায়। আল্লাহ ﷻ এই লোকটার তাওবায় এতটা খুশি

---

১৮৪. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : আম্বিয়া কিরাম, হাদীস : ৩২২৪।

হয়েছিলেন যে, এতগুলো খুন করার পরেও রহমতের দরজা খুলে দিয়েছিলেন তার জন্যে। প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন তাওবার পথ। কেন দেবেন না বলো? তিনি যে তাঁর বান্দাকে মা-বাবার চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। একটা ছেলেহারা মা তার হারানো ছেলেকে ফিরে পেলে যতটা খুশি হয়, বান্দার তাওবায় আল্লাহ ﷻ এর চেয়েও বেশি খুশি হন।

> "কজন কয়েদি হাজির করা হলো রাসূল ﷺ-এর সামনে। একজন মহিলা কয়েদিদের মধ্যে তার হারানো সন্তানকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বন্দিদের মধ্যে কোনো শিশুকে দেখলেই তাকে তার সন্তান মনে করে বুকে জড়িয়ে দুধ পান করাতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে রাসূল ﷺ বললেন, 'এ নারীটি কি তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে রাজি হবে?' সাহাবিরা বললেন, 'আল্লাহর কসম! সে কক্ষনো তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারবে না।' তখন রাসূল ﷺ বললেন, 'সন্তানের প্রতি এ নারীটির যত দয়া, আল্লাহ ﷻ তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চেয়েও বেশি দয়ালু।'[১৮৫]

আল্লাহ ﷻ মায়া-মমতাকে এক শ ভাগে ভাগ করেছেন। এর মধ্যে একভাগ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। মাত্র একভাগ।[১৮৬] এই একভাগ ভালোবাসা পেয়েই তো আমরা একে অপরের জন্যে ব্যকুল থাকি। মা সন্তানের জন্যে সীমাহীন দুখ-কষ্ট সয়ে নেয় মুখ বুজে, স্ত্রী নির্ঘুম রাত পার করে স্বামীর জন্যে, সন্তানের স্বাদ-আহ্লাদ পুরো করার জন্যে পিতা জুতোর তলা পর্যন্ত ক্ষয় করে ফেলে—এই একটু ভালোবাসা পেয়েই। মাত্র একভাগ রহমত সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে তা বণ্টন করা হয়েছে, তাতেই এই অবস্থা! তো যে স্রষ্টা নিজের কাছে নিরানব্বইভাগ রেখেছেন, তার ভালোবাসার মাত্রা কেমন হবে?

স্রষ্টার সে ভালোবাসার মাত্রা হলো ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি। এ ধারা শুরু হয় ইনফিনিটি দিয়ে, শেষও হয় ইনফিনিটি দিয়ে। এই ভালোবাসা এতটাই অসীম যে, কোনো ক্যালকুলেটরেই এর হিসেব ধরবে না। বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়া ও ভালোবাসা অসীম। তিনি এই অসীম ভালোবাসা বরাদ্দ রেখেছেন আমাদের জন্যে। তাই তো বান্দার ভুল স্বীকার করে অনুতপ্ত হওয়াটা তাঁকে বেশি আনন্দিত করে।

---

১৮৫. মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : তাওবা, হাদীস : ৬৭২৫।

১৮৬. "আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমতকে এক শ ভাগে ভাগ করে নিরানব্বই ভাগ নিজের নিকট রেখেছেন এবং এক ভাগ পৃথিবীতে নাযিল করেছেন। রহমতের এ অংশ থেকেই সৃষ্টজীব একে অন্যের প্রতি দয়া করে। এমনকি প্রাণি পর্যন্ত।" [মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : তাওবা, হাদীস : ৬৭১৯]

"আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দার তাওবার কারণে অধিকতর আনন্দিত হন।"[১৮৭]

বান্দা ভুল স্বীকার করলে আল্লাহ ﷻ কতটা খুশি হন, তা বোঝানোর জন্যে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরো, তুমি সাহারা মরুভূমিতে ভ্রমণ করছ। একা। একটি উট ছাড়া আর কেউই নেই সাথে। তো সফর করতে করতে যখন ক্লান্তি বোধ করছিলে, তখন দেখা মিলল বিশাল এক খেজুর গাছের। ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিলে সে গাছের ছায়ায়। কখন যে চোখ বুজে এসেছে, টেরই পাওনি। চোখ মেলে দেখলে তোমার উট হারিয়ে গেছে। খাবার-পানি যা ছিল, সব নিয়ে উধাও হয়েছে সে। তন্ন তন্ন করে খুঁজলে চারিদিক। কোনো সন্ধান মেলাতে পারলে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে পড়লে সেখানেই। সন্ধে নেমে এল। ক্লান্ত দেহে আবার ঘুমিয়ে গেলে। কাকভোরে ঘুম ভাঙল তোমার। উঠে দেখলে হারানো উটটি দাঁড়িয়ে আছে তোমার পাশে। বলো তো, এ অবস্থায় কেমন আনন্দ লাগবে?

এ অবস্থায় তুমি যতটা খুশি হবে, বান্দার তাওবায় আল্লাহ ﷻ এর চেয়েও বেশি খুশি হন।

> "বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে তখন তিনি ওই ব্যক্তি থেকেও অধিক খুশি হন, যে তার পাথেয় ও (পানির) মশক একটি উটের ওপর তুলে দিয়ে (সফরের উদ্দেশ্যে) চলতে থাকে এবং এক মরু প্রান্তরে উপস্থিত হয়। তখন তার দুপুরের বিশ্রামের সময় হয়ে যায়। সে নেমে গাছের নিচে দিবা-নিদ্রায় চলে যায়। সে ঘুমের-ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং তার উটটি চলে যায়। লোকটি জাগ্রত হয়ে (উটের খুঁজে) ওই টিলায় দৌড়ুল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। এরপর সে (অন্য টিলায়) দৌড়ুল, কিন্তু সেখানেও কিছু দেখতে পেল না। তারপর সে তৃতীয় আরেকটি টিলায় দৌড়ুল, কিন্তু ওখানেও কিছু দেখতে পেল না। অবশেষে সে যেখানে ঘুমিয়ে ছিল, সেখান এসে বসে রইল। এমন সময় হাঁটতে হাঁটতে উটটি হটাৎ তার নিকট ফিরে এল। অমনি সে তার লাগাম চেপে ধরল। আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দার তাওবার কারণে যথাবস্থায় (ওই লোকটি) উট ফিরে পাওয়ায় সময়ের (আনন্দের) চেয়েও অধিক আনন্দিত হন।"[১৮৮]

ভাই আমার! একটিবার ভাবো, বান্দার ফিরে আসাতে আল্লাহর কোনো লাভ বা ক্ষতি নেই। কারণ, আল্লাহ ﷻ এমন সত্তা, যিনি লাভ-ক্ষতির উর্ধ্বে। তবুও তিনি

১৮৭. মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : তাওবা, হাদীস : ৬৭০৫।
১৮৮. মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : তাওবা, হাদীস : ৬৭০৬।

বান্দার তাওবায় সবচেয়ে বেশি খুশি হন। একটা মেয়েকে খুশি করার জন্যে তো ১০১টি নীলপদ্ম এনে দিতে চাও, ঢেউ থামাতে চাও সাগরের, পাড়ি দিতে চাও সাত সমুদ্র আর তেরো নদী... কিন্তু তোমার প্রতিটি নিশ্বাস যাঁর ইচ্ছেধীন, সেই মহামহিম আল্লাহকে খুশি করার জন্যে কি সামান্য তাওবা করতে পারবে না?

তুমি কি এতটাই অকৃতজ্ঞ!

এক ব্যক্তি জীবনভর গোনাহ করেছিল। কখনও পুণ্যের কাজের ধারে-কাছেও যায়নি সে। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তখন সে পরিবার-পরিজনকে ডেকে বলল, 'আমি মারা গেলে আমার লাশ পুড়িয়ে ফেলবে। পুড়িয়ে যে ছাই হবে, তার অর্ধেক স্থলে এবং অর্ধেক জলে ফেলে দেবে।' পরিবারের লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এমন অদ্ভুত কাজ কেন করতে বলছেন?' সে জবাব দিলো, 'আল্লাহর শপথ! আল্লাহ যদি আমায় ধরতে পারেন তো এমন শাস্তি দেবেন, যা অন্য কাউকে দেবেন না।'

লোকটি জানত তার অপরাধের কথা। আবার আল্লাহর আযাবকেও ভয় করত। কিন্তু আগুনে পুড়ালে আল্লাহ ﷻ তাকে ধরতে পারবেন না, এই মিথ্যে ধারণা থেকেই হয়তো এমনটা করতে বলেছিল। লোকটি মারা যাওয়ার পর পরিবারের লোকেরা তার কথামতো লাশের ছাই মাটিতে এবং পানিতে ছিটিয়ে দিলো। কিন্তু এতেও শেষ রক্ষে হলো না তার। আল্লাহ ﷻ স্থলভাগ ও জলভাগকে নির্দেশ দিলেন ছাইগুলো একত্র করার। ছাইগুলো একত্র করে পুনরায় তার আকৃতি দেওয়া হলো। তারপর আল্লাহ ﷻ তাকে বললেন, 'তুমি কেন এমনটা করলে?' সে বলল, 'হে রব আমার! তোমার ভয়ে। আর তুমি তো সর্বজ্ঞ।' তার জবাব শুনে আল্লাহ ﷻ খুশি হলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।[১৮৯] সুবহানাল্লাহ! কী আশ্চর্যজনক একটি ঘটনা! সারাটা জীবন অবাধ্য হওয়ার পরও এই লোকের সাথে আল্লাহ ﷻ কতটা দয়ালু আচরণ করেছেন।

> "আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৯০]

ছোটোবেলায় আমরা মজা করে বলতাম, 'Man is mortal—মানুষমাত্রই ভুল।' বাস্তবিকই তাই। মানুষ হিসেবে আমরা কেউই ভুলের উর্ধ্বে নই। প্রত্যেক মানুষই ভুল করে, পাপ করে। আর আমরা যদি পাপ না করতাম, তবে আল্লাহ এমন জীব

---

১৮৯. মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : তাওবা, হাদীস : ৬৭৩০।
১৯০. সূরা আন-নিসা, (০৪) : ১০৬ আয়াত।

বানাতেন যারা পাপ করত।

> "যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, আমি তাঁর শপথ করে বলছি! যদি তোমরা গোনাহ না করতে তবে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের ধ্বংস করে এমন জাতি সৃষ্টি করতেন—যারা গুনাহ করে ক্ষমাপ্রার্থনা করত এবং তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন।"[১৯১]

মাঝে মধ্যেই আমরা পরাজিত হই প্রবৃত্তির কাছে। আসলে আমাদের দুর্বলতা কাজ করে পাপের প্রতি। তাই চলতে-ফিরতে ভয়ানক পাপ করে ফেলি। কিন্তু পাপ করে বসে থাকলে চলবে না। যত ভয়াবহ পাপই হয়ে যাক না কেন, তাওবা করতে হবে। যে তাওবা করবে, তাকে ক্ষমা করা হবে। এমনকি তাওবা করার পর কেউ যদি সে গোনাহ পুনরায় করে, সেও ক্ষমা পাবে।[১৯২] তবে কন্ডিশান একটাই—তাওবা করতে হবে।

> "বান্দা যখন নিজের পাপের কথা স্বীকার করে আল্লাহর কাছে তাওবা করে, আল্লাহ সেই তাওবা কবুল করেন।"[১৯৩]

আমি জানি, সব সময় একটা ভুল ধারণা কাজ করে তোমার মধ্যে। তুমি ভাবো—'এমন কোনো খারাপ কাজ নেই, যা আমি করিনি। আল্লাহ আমাকে কখনোই মাফ করবেন না।' বিশ্বাস করো, এটা ভুল ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। তুমি কি বানী ইসরাঈলের ওই লোকটির চেয়েও বেশি মানুষকে হত্যা করেছ? করোনি। আল্লাহ ﷻ যদি তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন, তবে তোমায় কেন দেবেন না? খামোখা মিথ্যে ধারণা করছ আল্লাহর ব্যাপারে।

তুমি কি শোনোনি, দয়াময় আল্লাহ ﷻ নিজের জন্যে দয়া অনুগ্রহের নীতি বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন?

> "তোমাদের রব নিজের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের নীতি বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি না জেনে অন্যায় করে, অতঃপর তাওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে, তা হলে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম

---

১৯১. মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : তাওবা, হাদীস : ৬৭১২।

১৯২. "যে ব্যক্তি গোনাহ করার পরপরই ক্ষমা চায়, সে বারবার গুনাহকারী গণ্য হবে না। যদিও সে দৈনিক সত্তর বার ওই পাপে লিপ্ত হয়।" [আবূ দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায় : সালাত, হাদীস : ১৫১৪]

১৯৩. মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : তাওবা, হাদীস : ৬৭৬৫; ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৮/৪৯-৫৫।

দয়ালু।"[১৯৪]

বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়াটাই আল্লাহর নীতি। এই নীতিকে তিনি আবশ্যক করে নিয়েছেন নিজের জন্যে। তিনি শুধু বান্দার চাওয়ার অপেক্ষায় থাকেন—কখন বান্দা ক্ষমা চায়, কখন ফিরে আসে তাঁর দিকে। বান্দা ফিরে এলেই আপন করে নেন। ভুল বুঝতে পারলে, শুধরে নেওয়ার সুযোগ দেন। একবার নয়, বারবার। তবুও কেন তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে অবাধ্যতা বাড়িয়ে যাচ্ছ দিনের-পর-দিন?

কেবল অবিশ্বাসীরাই নিরাশ হয় তাঁর রহমত থেকে।[১৯৫] তুমি তো অবিশ্বাসী নও! তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হওয়াটা তোমার সাজে না। কেন অনর্থক কেন নিরাশ হবে সে আদালত থেকে, যখন প্রধান-বিচারক নিজেই নির্ভয় দিচ্ছেন?

> "বলে দাও, হে আমার বান্দারা—যারা নিজেদের ওপর অবিচার করেছ—তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হোয়ো না। আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৯৬]

আমি বুঝি না, এরপরেও কেন দিগ্ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করছ এদিক-ওদিক? কেন গড়িমসি করছ আল্লাহর দিকে আসতে? তিনি তো স্পষ্ট করেই বলেছেন, ফিরে এলে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। সাথে বাড়তি পুরস্কার হিসেবে পুণ্যে পরিণত করে দেবেন তোমার পাপরাশিকে।

> "তবে তারা নয় যারা তাওবা করবে, ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে—আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৯৭]

স্বপ্নতে অফার পেলে মানুষ ধেইধেই করে নাচতে নাচতে চলে যায় শপিং করতে। ব্র্যান্ডের দোকানে মূল্যছাড় দিলে তো কথাই নেই, লাইন লেগে যায় তরুণ-তরুণীদের। ওসব অফার কিন্তু সীমিত সময়ের জন্যে দেওয়া হয়। কিন্তু মহামহিম আল্লাহর 'গোনাহকে পুণ্যে পরিণত অফার' সীমিত সময়ের জন্যে নয়। এ অফার

১৯৪. সূরা আল-আনআম, (০৬) : ৫৪ আয়াত।

১৯৫. "আর আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হোয়ো না। কেননা, অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।" [সূরা ইউসুফ, (১২) : ৮৭ আয়াত]

১৯৬. সূরা আয-যুমার, (৩৯) : ৫৩ আয়াত।

১৯৭. সূরা আল-ফুরকান, (২৫) : ৭০ আয়াত।

প্রতিটি ভোরের জন্যে, যা তুমি ঘুমিয়ে মিস করো। এ অফার প্রতিটি গোধূলির জন্যে, যা খেলাধুলোয় কাটিয়ে দাও। এ অফার প্রতিটি নিশির জন্যে, যা প্রেমালাপ করে পার করো। যত দিন কিয়ামাত না আসবে, এ অফার তত দিনের জন্যে।

> "নিশিতে আল্লাহ তাঁর করুণার হাত সম্প্রসারিত করেন, যেন দিনের অপরাধী তাঁর প্রতি ধাবিত হয়ে তাঁর নিকট তাওবা করে। একইভাবে তিনি দিনের বেলায় তাঁর হাত প্রসারিত করেন, যেন রাতের অপরাধী তাঁর প্রতি ধাবিত হয় ও তাঁর নিকট তাওবা করে। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ওঠা না পর্যন্ত (অর্থাৎ কিয়ামাত না আসা পর্যন্ত), এভাবে প্রতিনিয়ত চলতে থাকবে।"[১৯৮]

তুমিই বলো, এত বড়ো অফার না নিয়ে বসে থাকাটা কি ঠিক হবে?

কতই-না হতভাগা সেসব বান্দা, যারা আসমান ও যমীনের অধিপতির দেওয়া আনলিমিটেড অফার নিতে কার্পণ্য করে। দুনিয়ায় দুটো টাকা সেইভ করার জন্যে কত দৌড়াদৌড়ি। এ অফিস থেকে ও অফিস, এ শপিং সেন্টার থেকে ও শপিং সেন্টার... প্রতিটি জিনিসের একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব। কিন্তু আখিরাতের ক্ষেত্রে?

একেবারেই গা-ছাড়া ভাব!

এরই মধ্যে হয়তো শয়তান চলে এসেছে। ধোঁকা দিচ্ছে কানে কানে। বলছে—'ওসব নীতিকথা কথা ছাড়, বুঝলি? মিছেমিছি সোনালি সময়গুলো জলাঞ্জলি দিস না। আল্লাহ মাফ করবেন, বুঝলাম; কিন্তু তোর পাপ যে সমুদ্রের মতো বিশাল, সে খেয়াল আছে? এত এত পাপ কোনোদিনও মাফ করবেন না তিনি। তাওবা-টাওবার কথা বাদ দিয়ে নিজের পথ ধর। এনজয় কর! মাস্তি কর! অযথা সময় নষ্ট করিস না তো।'

শয়তান নিজে পথভ্রষ্ট, পথভ্রষ্ট করতে চায় তোমাকেও। খবরদার! ওর কথায় কান দিয়ো না। তোমার প্রতিপালক পরোয়া করেন না কারও। তুমি যদি পাপ করতে করতে আসমান-যমীন পূর্ণ করে ফেলো, তবুও তিনি ক্ষমা করবেন। পর্ন, লিপ কিস, জেনা সব মাফ করে দেবেন আল্লাহ। সব। এতে শয়তানের যত গা জ্বলে জ্বলুক।

> "হে আদম-সন্তান! তুমি যত দিন আমায় ডাকতে থাকবে এবং আমার কাছে আশা করতে থাকবে—তোমার পাপ যাই হোক না কেন—আমি তা ক্ষমা করে দেবো। এতে আমার কোনো পরোয়া নেই। হে আদম-সন্তান! তোমার পাপরাশি

---

১৯৮. মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : তাওবা, হাদীস : ৬৭৩৪।

> যদি আকাশের মেঘমালায়ও উপনীত হয়, এরপর তুমি যদি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তবুও আমি সব পাপ ক্ষমা করে দেবো। এতে আমার কোনো পরোয়া নেই। হে আদম-সন্তান! তুমি যদি যমীন পরিমাণ পাপরাশি নিয়েও আমার কাছে এসে উপস্থিত হও—আর আমার সঙ্গে কিছু শরীক না করে থাকো—তবে আমি সে পরিমাণ ক্ষমা ও মাগফিরাত তোমায় দান করব।"[১১১]

বান্দার জন্যে ক্ষমার দরজা সর্বদাই খোলা রেখেছেন তিনি। বান্দা শুধু একনিষ্ঠভাবে তাওবা করবে, আর তার ওপর অনবরত ক্ষমা ও মাগফিরাত বর্ষিত হবে আল্লাহর তরফ থেকে। ইশ! এমন সুযোগ আর কোথায় পাবে বলো? কে দেবে?

এখনও কি ঘাপটি মেরে বসে থাকবে?

ফিরবে না তবুও...

শয়তান এখনও ধোঁকা দিচ্ছে? 'তোর গোনাহ না হয় মাফ হলো, কিন্তু এই গোনাহগুলো যখন প্রকাশ করে দেওয়া হবে, তখন কেমন লাগবে? তুই যে ভালোবাসা দিবসে ওই মেয়েটার সাথে... যখন এগুলোর ফুটেজ সবার সামনে দেখানো হবে, সেদিন বুঝবি মজা! কিয়ামাতের দিন অপমানের হাত থেকে কে বাঁচাবে তোকে?'—এসব কানকথা দিচ্ছে ওই নির্লজ্জটা?

বেশ! শয়তানকে জানিয়ে দাও—তার এই ভুয়ো কৌশলও টিকবে না। কেন টিকবে না, সেটা বলছি পরে। আগে একটা কাহিনি বলে নিই। আমার বিশ্বাস, এ কাহিনি শোনার পর শয়তান আর কানভাঙাতে পারবে না তোমার।

কাহিনিটা নবি মূসা ﷺ-এর সময়কার। সে সময়ে বানী ইসরাঈল একবার অনাবৃষ্টিতে পড়ল। তো লোকজন গত্যন্তর না দেখে দৌড়ে এল মূসা ﷺ-এর কাছে। এসে বলল, 'হে আল্লাহর নবি! আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি দিয়ে পরিতৃপ্ত করেন।'

লোকদের নিয়ে একটি খোলা মাঠে গেলেন মূসা ﷺ। এরপর দু-হাত তুলে বলতে থাকলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দাও। আমাদের ওপর রহম করো। দুধের শিশু, ক্ষুধার্ত পশুপাখি আর দাড়িপাকা বুড়োদের ওসিলায় আমাদের ওপর মেহেরবানি করো।' লোকজনও তাঁর সাথে হাত উঠাল। মূসা ﷺ-এর দুআর জবাবে

---

১১১. তিরমিযি, আস-সুনান, অধ্যায় : দুআ, হাদীস : ৩৫৪০, আলবানি, আস-সহীহাহ, হাদীস : ১২৭, ১২৮।

আল্লাহ ﷻ বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন একজন লোক আছে, যে চল্লিশ বছর ধরে আমার নাফরমানি করছে। তুমি বের হয়ে যেতে বলো তাকে। তার কারণে আমি বৃষ্টি দিচ্ছি না।' মূসা ﷺ ঘোষণা দিলেন—'হে ওই গোনাহগার বান্দা, যে চল্লিশ বছর যাবৎ আল্লাহর নাফরমানি করছ! বেরিয়ে যাও তুমি আমাদের মধ্য থেকে। তোমার কারণে বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হচ্ছি আমরা।'

মূসা ﷺ-এর ঘোষণা শুনে পাপী বান্দাটি ডানে-বামে লক্ষ করল কেউ বেরিয়ে যায় কি না। কিন্তু কেউই বেরোল না। সে বুঝতে পারল, এই অনাবৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে হলে তাকেই বেরোতে হবে। কিন্তু এতগুলো মানুষের সামনে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ করছিল সে। লোকটা ভাবছিল—'বেরিয়ে গেলে লোকদের সামনে মুখ দেখাব কী করে! আর যদি বসে থাকি, তো আমার জন্যে সবাই বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে।'—কথাগুলো ভাবার সময় তার দু-চোখ বেয়ে অনুতাপের অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সে নিজের চেহারা কাপড়ে ঢেকে বলল, 'হে আল্লাহ! চল্লিশ বছর ধরে তোমার নাফরমানি করে যাচ্ছি, কিন্তু আমার অপরাধ আড়াল করে রেখেছ তুমি। বারবার সুযোগ দিচ্ছ আমায়। আজ তাওবা করছি তোমার কাছে। তুমি আমায় কবুল করো।'

লোকটি এভাবে কাকুতি-মিনতি করতেই থাকল। হঠাৎ ঘন মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। গুড়ুম-গুড়ুম মেঘ ডাকতে শুরু করল গগনতলে। বৃষ্টি নামল মুষলধারায়। অবাক হলেন মূসা ﷺ। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! শুকরিয়া তোমার, তুমি আমাদের বৃষ্টি দিয়েছ। কিন্তু কেউ তো বের হয়নি আমাদের মধ্য থেকে।' আল্লাহ ﷻ বললেন, 'মূসা! যার কারণে বৃষ্টি আটকে রেখেছিলাম, তার জন্যেই তো বৃষ্টিই দিলাম। তাওবা করেছে সে।' মূসা ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহ! আমি দেখতে চাই তোমার এই ভাগ্যবান বান্দাকে।' আল্লাহ ﷻ বললেন, 'যখন সে আমার নাফরমানি করত, তখনই তো আমি তাকে অপদস্থ করিনি। এখন কীভাবে আমি তাকে অপদস্থ করব, যখন সে আমার আনুগত্য করছে?'[২০০]

কী মনোমুগ্ধকর একটি কাহিনি! কী চমকপ্রদ এক কাহিনি!

ভাই আমার! এতটা প্রেমময় আচরণ যিনি করেন, তুমি কীভাবে তাঁর থেকে দূরে সরে থাকবে?

আল্লাহ তোমাকে কখনোই মানুষের সামনে অপমানিত হতে দেবেন না। প্রশ্নই আসে

২০০. আরিফি, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান, মৃত্যুর বিছানায়, পৃষ্ঠা : ১২৬-১২৭।

না। শয়তানকে বলে দাও, 'দুনিয়া ও আখিরাতে আমার বন্ধু ও সাহায্যকারী স্বয়ং আল্লাহ। তিনিই আমাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবেন। আমার গোনাহ গোপন রাখবেন। আমাকে রহমতের চাদরে ঢেকে নেবেন। তোর কানকথায় কিচ্ছু আসে যায় না।'

> "মনে রেখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই। আর তারা বিষণ্ণও হবে না।"[২০১]

এখন হয়তো মনে হতে পারে, বুঝলাম—তিনি আমার বন্ধু। কিন্তু কাছের বন্ধু না দূরের বন্ধু?

আরে পাগল! তাঁর থেকেও কাছের কেউ আছে নাকি?

ললনার চোখের জল দেখে ভেবো না, ও তোমার সবচেয়ে কাছের। আজ তোমার টাকা আছে, ইচ্ছেমতো ছিটাতে পারছ ওর পেছনে তাই ছায়ার মতো লেগে আছে। যেদিন টাকা ফুরিয়ে যাবে, সেদিন আর ওকে খুঁজে পাবে না। দেখবে—তোমার চোখের সামনেই ও অন্যের হাত ধরে কনসার্টে যাচ্ছে! কিন্তু তোমার সেই বন্ধু—যিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন—তিনি তোমাকে কোনো অবস্থায়ই ছেড়ে যাবেন না। তুমি শুধু তাঁকে ডাকবে, আর সাথে সাথে তিনি সাড়া দেবেন।

> "আমি তো কাছেই আছি। কেউ যখন আমাকে ডাকে, তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিই।"[২০২]

একবার তাঁকে ডেকেই দেখো না। একবার তাঁর দিকে ফিরেই দেখো না। বিশ্বাস করো, তুমি যদি পুরোপুরি ফিরে আসো আল্লাহর দিকে, তবে মাস্টারবেশান-পর্ন-জিনা... যত যা-ই হোক না কেন, ওগুলো কাউকে জানতে দেওয়া হবে না। কাউকে না। এপারে কিংবা ওপারে—গোপন রাখা হবে উভয় জায়গায়। কেবল আল্লাহ ও তোমার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

> "তোমাদের কেউ প্রতিপালকের নিকটস্থ হলে তিনি রহমতের আবরণ বিস্তার করে জিজ্ঞেস করবেন, 'তুমি কি এই কাজ করেছ?' সে বলবে, 'হ্যাঁ।' আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করবেন, 'তুমি কি এই কাজ করেছ?' সে তখনও বলবে, 'হ্যাঁ।'

---

২০১. সূরা ইউনুস, (১০) : ৬২ আয়াত।

২০২. সূরা বাকারাহ, (০২) : ১৮৬ আয়াত।

আল্লাহ এভাবে তার স্বীকারোক্তি নেবেন। তার পর বলবেন, 'আমি দুনিয়ায় তোমার ওসব (পাপ) গোপন রেখেছিলাম। আমি আজও তোমার জন্যে তা ক্ষমা করে দিলাম।'[২০৩]

ভাই আমার! সাহস করে পদক্ষেপটা নিয়েই ফেলো না। তুমি যতটুকুন এগোবে, আল্লাহর রহমত তার চেয়েও দ্বিগুণ পরিমাণে অগ্রসর হবে। যদি এক বিঘত এগোও, তবে তাঁর দয়া ও ক্ষমা একহাত পরিমাণ প্রসারিত হবে। যদি হেঁটে অগ্রসর হও, তবে তাঁর রহমত দৌড়ে আসবে তোমার দিকে।

"যদি কেউ এক বিঘত পরিমাণ আমার দিকে এগোয়, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। কেউ যদি একহাত পরিমাণ এগিয়ে আসে, তবে আমি এক বাগ (দু-বাহু ডানে-বামে প্রসারিত করলে যতটুকু দূরত্ব হয়) পরিমাণ এগোই। যদি কেউ আমার দিকে হেঁটে আসে, তবে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।"[২০৪]

আমি বুঝি না, পরকালের ব্যাপারে মানুষ এতটা ন্যাকামো করে কীভাবে। যে জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে চিরস্থায়ী সুখ-সমৃদ্ধি, কীভাবে এড়িয়ে যায় সে জীবনকে। মানুষ কি ঘুণাক্ষরেও ভাবে না, আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে একদিন?

"হে আমার বান্দারা! তোমরা রাতদিন গোনাহ করে থাকো। আর আমিই সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে মাগফিরাত কামনা করো। আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেবো।"[২০৫]

ভাই আমার! এখনও যদি ফিরে আসতে দ্বিধাবোধ করো, তবে তোমার মতো পোড়া কপালে আর দ্বিতীয়টি কেউ হবে না। এত করে বলছি আল্লাহ ﷻ মাফ করে দেবেন, তবুও ঘাপটি মেরে বসে আছ! ঘাপটি মেরে বসে থাকাটা তো ছাগলের অভ্যেস।

ফুযাইল ইবনু ইয়াজের নাম শুনেছ?

মনে হয় আকাশ থেকে পড়লে?

নামটা শোনোনি?

---

২০৩. বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : জাহমিয়াদের মতের খণ্ডন..., হাদীস : ৭০০৬; মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : তাওবা, হাদীস : ৬৭৫৯।

২০৪. মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : তাওবা, হাদীস : ৬৭০০।

২০৫. মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : সদ্ব্যবহার, হাদীস : ৬৩৩৮।

অবিশ্যি না শোনারই কথা। ধর্মীয় বই তো দু-পৃষ্ঠাও উল্টিয়ে দেখোনি। কীভাবে চিনবে তাঁকে! অত্যন্ত আল্লাহভীরু এবং জবরদস্ত আলিম ছিলেন তিনি। তৎকালীন সময়ের জ্ঞানের সমুদ্র ছিলেন। দূর দূরান্ত থেকে ছাত্ররা চলে আসত তাঁর ক্লাসে অ্যাটেন্ড করার জন্যে। ছাত্রদের এত ভিড় হতো যে, ক্লাসে তিল ধারণের ঠাঁই হতো না। এই লোকটার ব্যাকগ্রাউন্ড কী ছিল জানো?

একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিলেন তিনি। ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছিলেন মানুষের অন্তরে। তাঁর নাম শুনলে সবাই ভয়ে কাঁপত থরথর করে। ডাকাত থাকা অবস্থায় তিনিও প্রেমপ্রেম খেলা খেলেছিলেন তোমার মতো। কিন্তু পরহেজগার মেয়েটা পাত্তা দেয়নি তাঁকে। একদিন দেওয়াল টপকে প্রেয়সীর বাড়িতে হানা দেন ফুযাইল। ওই সময় কুরআন তিলাওয়াত করছিল মেয়েটি। সে পড়ছিল :

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

"যারা ঈমান এনেছে, তাদের কি আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি?"[২০৬]

আয়াতটুকুন শোনার পর কেমন জানি একটা ধাক্কা খেলেন ফুযাইল। নিজের অজান্তেই বলে ফেললেন, 'হ্যাঁ, সময় হয়েছে। হ্যাঁ, সময় হয়েছে।' এ কথা বলতে বলতে প্রেয়সীর বাসা থেকে ফিরে এলেন তিনি। এরপর আর দেখা করেননি মেয়েটির সাথে। ডাকাতির পেশা থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন চিরতরে। ফিরে এসেছিলেন আল্লাহর দিকে। পরিপূর্ণভাবে। তাওবার মাধ্যমে একসময়কার দুর্ধর্ষ ফুযাইল মস্ত বড়ো আল্লাহভীরু বান্দায় পরিণত হন। ইসলামের অনেক খেদমত করেছেন তিনি। একবিংশ শতাব্দীতে এমন কোনো আলিম পাওয়া যাবে না, যিনি কিনা ফুযাইলের নাম শোনেননি। উপকৃত হননি তাঁর জ্ঞান থেকে। ইতিহাসের পাতায় ফুযাইল ﷺ নামটি এখনও লেখা রয়েছে স্বর্ণাক্ষরে।[২০৭]

মাত্র একটি আয়াত পাল্টে দিয়েছিল ফুযাইলের জীবন। ডাকাত ফুযাইল থেকে ইমাম ফুযাইল ﷺ বানিয়েছিল তাঁকে। আল্লাহর বন্ধুদের একজন হয়েছিলেন তিনি। আর আমি সেই কখন থেকে বকবক করে যাচ্ছি, আয়াতের-পর-আয়াত শোনাচ্ছি, কিন্তু মন গলাতে পারছি না তোমার। ভিখিরিকেও মানুষ খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে ইতস্তত

২০৬. সূরা আল-হাদীদ, (৫৭) : ১৬ আয়াত।
২০৭. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/৩৪৪।

বোধ করে, আর আমায় ফিরিয়ে দিচ্ছ খালি হাতে?

ভাই আমার! কেন থামটি মেরে বসে আছ নববধূর মতো?

এই মেয়েলি স্বভাব তোমার মধ্যে এল কী করে? মনে হয় জাস্ট ফ্রেন্ড নাম দিয়ে ললনাদের সাথে ঘুরতে ঘুরতে এই অবস্থা হয়েছে। তাই প্রেয়সীর বিচ্ছেদে চোখের জল ঝরে, কিন্তু রবের বিরহে একটুও আনচান করে না মন! করবে কীভাবে, ওখানে তো রাখোনি তাঁকে। ওখানটায় যে ললনা বাস করে। সেদিন গুনগুন একটা গান গাইছিলে না—'মন পাজরে শুধু তুমি আছ, কেউ তো আর থাকে না। ভালোবাসি আমি শুধু তোমায়, চোখেতে চোখ রাখো না...' তোমার মনে যে রবের জন্যে কোনো জায়গা নেই, তা কি আর খাতা কলমে লিখে বোঝাতে হবে? হৃদয়ে যদি আল্লাহর জন্যে সামান্য জায়গাও থাকত, তবে তো তাঁর বিরহে একটু হলেও কাঁদতে।

কেঁদেছিলে কখনও?

দেখতে দেখতে এতগুলো বছর পেরিয়ে গেল। শৈশব থেকে চলে এলে যৌবনে। দেখবে, একদিন মৃত্যু এসে ঠিক কড়া নাড়বে দরজায়। চলে যাবে দুনিয়া ছেড়ে। সবকিছু পেছনে ফেলে। শুরু হবে নিঃসঙ্গ কবরের জীবন। সে জীবন পার করার পর দাঁড়াবে আল্লাহর সামনে। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, 'হে অমুক! আমি কি তোমায় সম্মান দান করিনি, নেতৃত্ব দিইনি, মিলিয়ে দিইনি তোমার জুটি, আরাম-আয়েশের মধ্যে পানাহারের ব্যবস্থা করিনি?'[২০৮] তিনি আরও বলবেন, 'হে অমুক! তোমার যৌবন কীভাবে কাটিয়েছ?'[২০৯]

'ইয়াবা খেয়েই কূল পাইনি, কিছু করব কীভাবে?'—উত্তরে এটা বলবে নাকি?

কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াবে আল্লাহর সামনে?

সেদিন অপমানিত হওয়ার চেয়ে সাবধান হয়ে যাও আজই। এখনই। ফিরে এসো আল্লাহর দিকে। আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে গেলে শিরনি রান্না করে খাওয়াতে হবে না। গিলাফ চড়াতে হবে না মাজারে। হুজুর ডেকে মিলাদও পড়াতে হবে না। ওগুলো হিন্দি কিংবা বাংলা সিনেমায় লাগে। বাস্তবে তাওবা করতে ওসবের প্রয়োজন পড়ে না। তাওবার পদ্ধতিটা খুবই সিম্পল। বলছি শোনো।

আচ্ছা, তোমার কি ওজু আছে? না থাকলে ওজুটা করে এসো। একটিবার আমার

২০৮. মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : যুহদ, হাদীস : ৭১৬৯।
২০৯. তিরমিযি, আস-সুনান, অধ্যায় : কিয়ামাত, হাদীস : ২৪১৬।

অনুরোধ রাখো। প্লিজ, যাও।

> "কোনো ব্যক্তি যদি গোনাহ করে ফেলে, এরপর সে ওঠে পবিত্রতা হাসিল করে সালাত আদায় করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তবে আল্লাহ ﷻ তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেন।"[২১০]

এখন দু-রাকাআত সালাত পড়ো। জাস্ট দু-রাকাআত। এরপর বলো, "রব আমার! তুমিই বাদশাহ। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমি আমার প্রভু আর আমি তোমার দাস। নিজের ওপর জুলুম করেছি আমি, আর এখন অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাচ্ছি। সুতরাং আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি ছাড়া আর কেউ অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে না। তুমি আমায় উত্তম পথে পরিচালিত করো। তুমি ছাড়া কেউ উত্তম পথে পরিচালিত করতে পারে না। কেউ মন্দ আচরণ থেকে আমায় বিরত রাখতে পারে না। রব আমার! আমি হাজির তোমার কাছে, আর প্রস্তুত আছি তোমার আদেশ পালনে। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। আর কোনো অকল্যাণ বর্তায় না তোমার প্রতি। আমি তোমার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি। তুমি মঙ্গলময়। সুমহান। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি আর তোমার দিকে ফিরে আসছি।"[২১১]

তুমি দেখো, ফিরে এলে সামান্য কষ্টেই মেজাজটা আর বিগড়ে যাবে না। খামোখা ঝগড়া লাগবে না কারও সাথে। না পাওয়ার বেদনা তাড়া করবে না কখনও। হতাশা নামক শব্দটা হারিয়ে যাবে তোমার অভিধান থেকে। অন্যরকম প্রশান্তি আসবে হৃদয়ে। ফুরফুরে লাগবে সবকিছু। কেমন জানি একটু বেশিই সতেজতা অনুভব করবে। আকাশটা আগের চেয়ে নীল মনে হবে। দখিনা বাতাসটাকে উপলব্ধি করতে পারবে আরও প্রবলভাবে। আকাশের রুপোলি জোছনা কথা বলবে তোমার সাথে। গগনের মেঘ ইশারায় ডাকবে শ্রাবণ-দিনে। বৃষ্টিবিলাসে পুলকিত হবে হৃদয়। কাননের সুবাসিত হাওয়া মুগ্ধ করবে বারেবারে। আপন মনে হবে রোদ্দুরকে। সমুদ্রের ঢেউয়ের ভাষা তুমি বুঝতে পারবে। পাহাড়ের কলতান, ঝরনার বহমান ধারা, পুবালি বাতাস, শীতের শিশির, ফুলের সুবাস, জোনাকির আলো—সবকিছু কেমন যেন নতুন মনে হবে। কেমন জানি এক অন্যরকম রোমাঞ্চ অনুভব করবে। এই তুমি এক নতুন তুমিতে

---

২১০. তিরমিযি, আস-সুনান, অধ্যায় : কুরআনের তাফসীর, হাদীস : ৩০০৬; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস : ১৩৯৫।

২১১. দুআটা নবি ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন। [নাসাঈ, , আস-সুনান, অধ্যায় : সালাত শুরু করা, হাদীস : ৯০০; আলবানি, সহীহ আত-তিরমিযি, হাদীস : ৩৬৬১]

রূপান্তরিত হবে।

হে ইসলামের সন্তান! তোমার মধ্যেই খালিদ ইবনু ওয়ালিদ লুকিয়ে আছে। নিজের সে প্রতিভাকে গলাটিপে হত্যা কোরো না। তাকে বিকশিত হতে দাও। হাল ধরো এই ধরণির। যত অনিয়ম আর উশৃঙ্খলতা আছে, সব মুছিয়ে দাও। যত ব্যথা-বেদনা আছে, সব দূর করে দাও। দাসত্বের যত শৃঙ্খল আছে, তা ছিনভিন্ন করে দাও। পৃথিবী তোমার প্রতীক্ষায়...

কষ্ট করে লেখাগুলো পড়ার জন্যে শুকরিয়া প্রিয় ভাই। ইন শা আল্লাহ জান্নাতুল ফিরদাউসে আবার আমাদের দেখা হবে। একটা জমকালো পার্টি হবে সেখানে। বাদবাকি কথাগুলো না হয় ওখানেই বলব। অপেক্ষায় রইলাম ভাই—তুমি ফিরবে বলে...

বকবক করেছি অনেকক্ষণ। আর জ্বালাতন করতে চাই না। ছোট্ট একটি কবিতা লিখেছি তোমার জন্যে, ওইটে বলেই বিদেয় নিচ্ছি। কবিতাটার কোনো নাম দিইনি। তুমিই একটা নাম দিয়ে দিয়ো। ভালো থেকো ভাই। অনেক ভালো।

ওই আকাশের নীলিমা, চাঁদের জোছনা

শ্রাবণের ঘন বরিষন, গন্ধবিধুর সমীরণ

শ্যামল মাটির ধরাতল, পাখপাখালির কোলাহল

গগনবিহারী মেঘমালা, বসন্তের সারা বেলা

মাধবীলতার ব্যাকুলতা, কুসুমকাননের ঝরাপাতা

আজি যত আয়োজন এই গগনতলে, তুমি ফিরবে বলে...

ফাগুনের রঙিন মায়া, নীপবনের স্নিগ্ধ ছায়া

হেমন্তে ফসলের হাসি, অন্তরীক্ষের রবীশশী

চৈতালি আমের মুকুল, তটিনীর উপচানো কূল

পালের উদাস হাওয়া, মাঝিমাল্লার নাও বাওয়া

ঝরনার কলকল্লোল, পারুলের নবহিল্লোল

আজি যত আয়োজন এই গগনতলে, তুমি ফিরবে বলে...

নিকুঞ্জের দখিনা বাতাস, জলধির প্রস্ফুটিত উচ্ছ্বাস
সাগরের জলকলকল, দীঘির নীলোৎপল
মুক্তোসমেত উষার শিশির, সুউচ্চ চুড়ো গিরিবরির
অরণ্যের হৃদয়হিন্দোল, শরতের শুভ্র কাশফুল
নিশির স্বপনের পারা, সুয্যির রোদ্দুর সারা
আজি যত আয়োজন এই গগনতলে, তুমি ফিরবে বলে...

অভিমত

“হতাশায় নিমজ্জিত তরুণ, যুবক কিংবা প্রৌঢ়—যারা দুনিয়ার মোহে নিজেকে বিলীন করেছে, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে রাব্বে কারীম থেকে—এই বইটি তাদের জন্য আলোর দিশারী। মনের বন্ধ দরজাগুলোর কপাট খুলে দিবে এর প্রতিটি চরণ, দুনিয়ার অসীম চাহিদা এবং না পাওয়ার যন্ত্রণা যাদেরকে ক্লিষ্ট করছে প্রতিক্ষণ। হতাশার বিষবৃক্ষকে উপড়ে ফেলে সত্য-সঠিক পথের রসদ যুগিয়েছেন এই প্রতিভাবান লেখক তার লেখনীতে। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, বিনয়ী, মেধাবী, আমার প্রিয় ছাত্রের এই খিদমাহ দ্বীনের জন্য কবুল করো। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।”

-আনিসুজ্জামান রানা | সহকারী অধ্যাপক, রসায়ন, CPSC, ময়মনসিংহ; প্রাক্তন প্রভাষক, সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ

“নামটাই তো অন্যরকম—‘তুমি ফিরবে বলে’। গল্পচ্ছলে বলা ভীষণ সত্য কথাগুলো আমাদের চিন্তার নদীতে আলোড়ন তুলবে। কাঁপিয়ে দিবে আজীবন লালিত দর্শনের ভিত্তিমূল। স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে শেখাবে আমাদের। একটিমাত্র অনুরোধ—থামবেন না যেন। ভুলের অন্ধকারে দীর্ঘকাল বসবাস করে যদি সত্য কিছু জানার সৌভাগ্য হয় আমাদের, আমাদের উচিত হবে সেই সত্য আলোর পথ অনুসরণ করে সামনে এগিয়ে যাওয়া। হাসি-তামাশা করা হবে, বিদ্রুপ শুনবেন কাছের মানুষদের কাছে, অপাঙ্‌ক্তেয় মনে হবে নিজেকে। থামবেন না যেন। হাঁটতে থাকুন যতক্ষণ-না বিপুল আলোর সামনে পর্যন্ত পৌঁছাবেন। দীর্ঘদিন অন্ধকারে থেকে ধীরে ধীরে আলোর সামনে এসে দাঁড়ালে চোখ মেলতে কষ্ট হয়। কিছুটা সময় লাগে চোখকে তার স্বাভাবিক দৃষ্টির জন্য উপযোগী করে তুলতে। তামাশা-বিদ্রুপের প্রতিকুল সময়টিকে চোখ খুলে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকানোর জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের সাথে তুলনা করুন শুধু। নিশ্চিত থাকুন, আদিগন্ত অবারিত আলোক রাশি চোখের সামনে যখন উদ্ভাসিত হবে একটি সময় পরে, ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে আমাদের আগমন, বেঁচে থাকা ও সর্বশেষে মৃত্যুর যৌক্তিক কারণ অনুধাবন করবেন আপনি। আর সেই জীবন যাপনের একটি অর্থবহ উপায়ও ভেসে উঠবে আপনার সামনে ইন শা আল্লাহ। আল্লাহুল মুসতাআন!”

- মুহাম্মাদ জাভেদ কায়সার

“ঝুম বৃষ্টি! বরষার শীতল ছোঁয়ায় কেঁপে উঠছে হিয়া। আকাশের চঞ্চল মেঘগুলো দুষ্টুমি করে ছুঁয়ে দিচ্ছে পাহাড়ের শিখর। কী যেন মনে হতেই এক লাফে ছুঁয়ে এলাম সেই দুষ্টু মেঘদলকে। নয়নাভিরাম বাগানে চারদিকে ফুটে থাকা অজস্র ভেজা ফুল হাসছে, শুধু হাসছেই। আমি শুনছি তাদের হাসির শব্দ, বৃষ্টির টুপটুপ শব্দ। চারিপাশ মিষ্টি হাওয়া আর ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা। দৃষ্টিপটে মায়া ছড়িয়ে আছে আকাশ-ভরা দুষ্টু মেঘ, দীঘির নীলজল, আর ফুটফুটে ফুলের হাসি। মরুভূমির লু-হাওয়া ভুলে এখানে শুধুই শান্তিবিলাস। অনেক পথ পার হয়ে এখানে পৌঁছনোর কষ্টক্লেশ কিছুই মনে নেই—‘তুমি ফিরবে বলে’ পড়ে এমনই অনুভূতি হয়েছে আমার। আমি ফিরতে চাই। তুমি ফিরবে না? এসো না, চলো জলে ভিজি, শ্রাবণ রাতের বৃষ্টিতে।”

- ডা. রাফান আহমেদ, MBBS | লেখক : বিশ্বাসের যৌক্তিকতা, অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়

“কিছু বই একটানা পড়তে হয় না। কয়েক পৃষ্ঠা পড়া হলে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসতে হয়। জীবনের সাথে মেলাতে হয়। নিজের ভাবনা-চিন্তা, জীবন-মননের দিকে প্রশ্ন তুলতে হয়। কাজটা বুদ্ধিমানদের, তাই বোধহয় সবাই করে না। অপূর্ব রিমাইন্ডারকে কেবল বুদ্ধিমানরাই কাজে লাগাতে পারে। আর এই বইটা শুধু তাদের জন্য।”

-মোহাম্মদ তোয়াহা আকবর (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ঢ.বি) | লেখক : উল্টো নির্ণয়

“আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় জাকারিয়া মাসুদ (আফাহুল্লাহ) ভাইয়ের রচিত ‘তুমি ফিরবে বলে’ বইটির কিছু অংশ পড়ার সুযোগ এই অধমের হয়েছে। আমি ভাবলাম বইটির নামকরণের সাথে লেখনী কতটুকু সার্থক হয়েছে?... সুতরাং বইটির আলোচনার বিষয়বস্তু ও আবেদন পাঠ করত এই ফলাফলেই পৌঁছলাম যে, বইটির বিষয়বস্তুর সাথে নামকরণের সার্থকতা অর্জন করেছে। আমি এই বইয়ের লিখার সাহিত্য, অধ্যায় শ্রেণীবিন্যাস ও অভিনব বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় দেখে যারপরনাই মুগ্ধ হয়েছি। আমি লক্ষ করেছি যে, বইটিতে লিখক ও সম্পাদক (ওয়াফফাক্বাহুমুল্লাহ বিমা ইউহিব্বু ওয়ার ইয়ারদ্বা) শুদ্ধ বানান, সঠিক শব্দ চয়নের পাশাপাশি সহীহ কিংবা গ্রহণযোগ্য হাদীস ও উদ্ধৃতি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।... আল্লাহ তাআলা এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে হিদায়াতের উপর অটল রাখুক এবং এই বইকে পথ ভোলা বান্দাদের হিদায়াতের যারিয়াহ বানিয়ে দিক। (আমীন)।”

-মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মামুন | পরিচালক : মারকাজুল উলূম আশ-শারইয়্যাহ ওয়া তারবিয়াতিল মুসলিমীন, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

“বর্তমান প্রজন্ম দুনিয়ার চাকচিক্যের পেছনে ছুটে চলছে অবিরাম। লেটেস্ট ভার্সনের মোবাইলসেট, দামি জামাকাপড় আর স্টাইলিশ জীবনে বুঁদ হয়ে আছে তারা। এই

পৃথিবীতে তাদের আগমন যে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে, সেই বোধ খুব অল্প ক'জনেরই আছে। উঠতি বয়সী তরুণ-তরুণীরা তো আরও বেশি বেপরোয়া।... নবপ্রজন্মের এই মানুষগুলোর জন্যই সুলেখক জাকারিয়া মাসুদ মনের গহীন থেকে দরদের সুর মেখে সাজিয়েছেন আবেগঘন কথামালা—'তুমি ফিরবে বলে'। হৃদয়ের তপ্ত আহ্বান তিনি তুলে ধরেছেন হাল আমলের তরুণ-যুবাদের সম্মুখে। নিজেও তরুণ হওয়ায় তিনি বেশ ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছেন কোন সুরে ও কোন ভাষায় সম্বোধন করলে তারা এই ডাকে কিছুটা হলেও সাড়া দিবে; তাদের মনের আকাশে কালো মেঘ সরে গিয়ে দেখা দিবে আলোকজ্জ্বল সূর্যের মুখ। সুবিন্যস্ত কথামালার ভেতরে ভেতরে তিনি কুরআন-হাদীসের পরশ মাখিয়ে রচনাগুলোকে করেছেন আরও বেশি প্রাণবন্ত ও হৃদয়স্পর্শী। যা পাঠকের ভাবনার অতল তলে বোধের বন্ধ দুয়ারে গিয়ে করাঘাত করবে, কষাঘাত করবে। জাগ্রত করবে তাদের ঘুমন্ত বিবেককে। লেখকের জন্য শুভকামনা।"

- মাওলানা আবদুল্লাহ আল মাসউদ | লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক

"অতল সুরঙ্গপথে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আটকে পড়া মানুষ দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে একটু আলোর দেখা পেতে। আলোর একটু আভাস তার ভয়ার্ত তৃষিত প্রাণে জলস্নিগ্ধতা দেয়, সুরঙ্গের শেষ আর মুক্তধরার চিরকাম্য চেহারা প্রতিভাত হবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু যে আলো হঠাৎ তার অক্ষিগোচরে এসে আশার সলতেতে জ্বালানি দিলো, তা হতে পারে প্রাণঘাতী পাতাল ট্রেনের, পর্যবেক্ষককে পিষ্ট করে দেওয়াই যার কাজ। তাই আলো মানেই মুক্তি নয়, সর্বগ্রাসী আগুনও প্রবল আলোকচ্ছটাতেই সংহার করে চলে বনের পরে বন। একালের তরুণেরা সুখ আর সাফল্যের মোড়কে ঢাকা অগ্নিরূপী একেকটি প্রবৃত্তিকে যেভাবে যেভাবে মুক্তির আলো ভেবে জাপটে ধরেছে, আত্মসংহারী একেকটি গ্রাসে উদরপূর্তি করে চলেছে, তা দেখে যে-কোনো সচেতন মুসলিমের আত্মাই কেঁদে ওঠে। ভাবে—এ পথ থেকে যদি একটু ফেরাতে পারতাম তাদের, বোঝাতে পারতাম যে আলোর পিছে তারা ছুটছে তা মুক্তির নয়, ঘাতক পাতালট্রেনের, যা ধেয়ে আসছে ওদেরই পিষ্ট করতে। কর্তব্যপরায়ণতার এই প্রবল বোঝার ভার একটু কমানোর তাড়না থেকে ভাই জাকারিয়া মাসুদ লিখলেন 'তুমি ফিরবে বলে'। অসামান্য দরদমাখানো হৃদয়গ্রাহী বর্ণনাশৈলীর একেকটি অধ্যায় একেকজন তরুণের হৃদয়ে ঝংকার হয়ে বাজবে, চিন্তার নতুন দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়ে তাদের সত্যপথের নির্দেশ দেবে—আরশের মহান অধিপতির কাছে এই প্রার্থনা রইল।"

-মুহাম্মাদ জুবায়ের, (EEE, BUET) | সম্পাদক

“প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের ডায়ারিতে এমন কিছু লেখা স্থান পায়—যার মাধ্যমে কিনা তার অন্তর চক্ষু খুলেছিল এবং তৎক্ষণাৎ জীবনের ট্র্যাক ঘুরিয়ে নেওয়াটা অনেকগুণে সহজ হয়েছিল। প্রিয় জাকারিয়া মাসুদের 'তুমি ফিরবে বলে' বইয়ের প্রতিটা অধ্যায়ই যেন সেই ডায়ারির এক একটা লেখনী। আশা করি প্রত্যেকটা গল্পই একেকজন পাঠকের অন্তরের মণিকোঠায় রেখাপাত করবে। বিশেষভাবে আমরা যারা উঠতি বয়সের তরুণ আছি—যারা কিনা প্রচলিত ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থার গোলামির জিঞ্জির থেকে বেরিয়ে মুক্ত আকাশের নিচে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই, তাদের জন্যই সমর্পণ প্রকাশনীর পক্ষ থেকে এবারের আয়োজন : *Tumi Firbe Bole.*”

-মুহাম্মাদ নাজিম আব্দুল্লাহ | IIT, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

“'তুমি ফিরবে বলে' আপাত-দৃষ্টিতে একটা বই হলেও আমি বলব এটি একটি ফিল্টার। এই বইয়ের প্রত্যেকটা পৃষ্ঠা আপনাকে ভাবাতে বাধ্য করবে আপনার অবস্থান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কেন আপনাকে পাঠিয়েছেন, আর আপনি কী করছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ রহমতে প্রকাশ হবার আগেই বইয়ের সবকটা লিখা পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। বইটি আমার মনসপটে দাগ কেটেছে। ভাবিয়েছে কোন পথে হাঁটছি আমরা। কোথায় ফিরে যাওয়া উচিত আমাদের। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভাইয়াকে এই খিদমাতের জন্য উত্তম প্রতিদান দিন। এই বইকে কবুল করে নিন এবং এই বইকে অসংখ্য পথভোলা পথিককে দ্বীনের পথে ফিরে আসার মাধ্যম হিসেবে কবুল করে নিন। আমিন।”

-জুবায়ের আহমেদ | BBA, IIUC

“আল্লাহ তাআলা খুব যত্ন করে তোমার জন্য এক অসাধারণ জান্নাত বানিয়েছেন। সেখানকার সুবিশাল প্রাসাদ, বাগান, নদী-ঝর্ণা সবকিছুর মালিক কেবল তুমিই হবে। কিন্তু তার আগে সেখানে যাবার একটা পূর্বশর্ত তোমায় পূরণ করতে হবে। সেটা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদাত, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য। ব্যস এটুকু এই জীবনে করতে পারলেই পাওয়া যাবে সেই মহা-নিয়ামাত, অফুরন্ত সুখের আধার। কিন্তু তুমি বেখেয়াল। তুমি পথে ভুলেছ। তাই তো ঠোকর খাচ্ছ ভুল পথে, ভুল দিশায়। তোমাকে ফিরিয়ে আনতেই এই প্রয়াস। যেন তুমি পথ খুঁজে পাও : 'তুমি ফিরবে বলে'... ”

-মানযুরুল কারীম, (ম্যানেজম্যান্ট বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) | অনুবাদক, সম্পাদক

“কিছু বই আছে যেগুলো কথা বলতে পারে। একজন পাঠকের বই পড়ার আনন্দ বহু গুণ বেড়ে যায় যখন কোনো বই তার সাথে কথা বলতে শুরু করে। বইটিকে তখন খুব কাছের বন্ধু বলে মনে হয়। বইয়ের সকল তত্ত্ব-উপাত্ত, নাসীহা তখন

পাঠক গ্রহণ করে অকপটে। গড়ে ওঠে পাঠক এবং বইয়ের এক নিবিড় সম্পর্ক। প্রিয় লেখক জাকারিয়া মাসুদ-এর 'তুমি ফিরবে বলে' বইটিও সেরকম একটি বই। বইটি যে শুধু পাঠকের সাথে কথা বলতে পারে, সেটাই না। বরং খুব সুন্দর ও সফলভাবে পাঠকের কাছে প্রয়োজনীয় বার্তাও পৌঁছে দিতে পারে। বর্তমান সময়ের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী এবং যুবক-যুবতীর খুব কাছের বন্ধু হতে পারে বইটি। এই সেক্যুলার সমাজে নতুন প্রজন্মের মুসলমানদের জন্যে 'তুমি ফিরবে বলে' খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। তরুণদের অন্তত একবার এই বইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলা দরকার। কথা বলতে সক্ষম অসাধারণ এই বইটির পাতাগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে দোষ কী!"

-আলী আব্দুল্লাহ | লেখক : সুবোধ, কারাগের সুবোধ, চার বন্ধুর সমুদ্র অভিযান

"যৌবন। জীবন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে এ যেন এক লাইটহাউজ। এই লাইটহাউজের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে পুরো জীবন। কিন্তু যদি নিভে যায় এই বাতিঘর, তবে জীবন হয়ে ওঠে ঘনঘোর অমানিশার এক দুর্বিষহ চোরাগর্ত। আজকের যুবকরা যেন হারিয়ে যাচ্ছে সেই চোরাগর্তেই, প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত। 'তুমি ফিরবে বলে' আমাদেরই এই হারিয়ে যাওয়া ভাইগুলোকে ফিরিয়ে আনার আকুতিভরা এক তীব্র মর্মস্পর্শী আখ্যান। এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ে অধ্যায়ে, প্রতিটি শব্দে শব্দে মিশে আছে পথহারা যুবকদের প্রতি ভালোবাসা মেশানো নববি দাওয়াত। আছে তাদের কোমর আঁকড়ে ধরে তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার আকুল আহ্বান। আল্লাহর রাস্তায় দাঈদের জন্য এই বইটি অমূল্য এক উপহার। বইটি পৌঁছে যাক প্রত্যেক যৌবনের মশালধারীদের হাতে, জ্বলে উঠুক যৌবনের বাতিঘর সমুজ্জ্বল ভাস্বরতায়, যার আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে জীবন সমুদ্রের শেষ কিনারটুকু পর্যন্ত।"

-মুহাম্মাদ নাফিস নাওয়ার | পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ, SUST

"বর্তমান জাতে উঠতে চাওয়া, আধুনিক-মনা, স্মার্ট সাজা তরুণ সমাজের জন্য যে রকম একটা বইয়ের কথা সব সময় ভাবতাম আর মনে মনে চাইতাম সেটা এই একটা বইয়ে পেয়েছি। যদি সুযোগ-সামর্থ্য থাকত তা হলে দেশের প্রত্যেকটা যুবকের হাতে এ বইটা পৌঁছে দিতাম। জীবনের নানামুখী হতাশা, পাপের বোঝায় নুয়ে পড়া যৌবনের আকুতি, পাথরের মতো শক্ত হয়ে যাওয়া হৃদয়ের গ্লানি—এ সব কিছুকে দূর করে নতুন করে জীবনকে ভাবতে শেখাবে বইটি। বইয়ের পাতায় পাতায় যেন ফেরার আহ্বান। ফিরে চলার আহ্বান এক মহান স্রষ্টার প্রতি। বইয়ের নামটিই তো হৃদয়কাড়া— 'তুমি ফিরবে বলে'। যেন লেখক পথহারা তরুণদের ফেরার জন্য প্রাণভরে আকুতি জানাচ্ছেন। তাদেরকে বলছেন, 'ফিরে চলো সকলে, জান্নাতের পথে।' লেখককে আল্লাহ কবুল

করুন। তাকে দিয়ে আরও বেশি বেশি খেদমত করার তৌফিক দান করুন।"

-আব্দুল্লাহ মজুমদার (আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) | অনুবাদক

"অনেক তো পড়েছেন ভাই সেল্ফ মোটিভেশনাল বই। ডেল কার্নেগি, পাওলো কোয়েলহো, জেমস অ্যালেন, নেপোলিয়ন হিল সবই হয়তো আপনার পড়া। কিন্তু আমি আপনাকে ওয়ারেন্টি দিতে পারি এই বইটা আপনাকে ভাবাবে, যেমনটা আপনাকে অন্য কোনো বই ভাবাতে পারেনি। এই বইটা আপনাকে আপনার অস্তিত্বের মূল থেকে ভাবাতে বাধ্য করবে। শুধু প্রয়োজন নিজের অস্তিত্বের সাথে একটু সৎ হওয়া, স্বীয় অস্তিত্বের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এই প্রশ্নগুলোকে এড়িয়ে না যাওয়া, আর সেই সততার সাথেই বইটা পড়া, বইয়ের মর্মগুলোকে উপলব্ধি করা। ভাই আমার! আসুন তা হলে এই উপলব্ধির জগতে।"

-হোসাইন শাকিল, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | লেখক : অশ্রু

"আগ্নেয়গিরির লাভাকে অনেকে 'ভয়ংকর সুন্দর' বলে থাকেন। একদিন এমন একটি লাভা দেখে অনেকগুলো মানুষ এই ভয়ংকর সৌন্দর্যে উদ্বেলিত হয়ে সেখানে মাস্তি করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় তাদের সবচেয়ে কাছের মানুষটি নিজের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন—এর ভয়াবহতা এবং তাদেরকে যে-কোনো মূল্যে ফেরাতে চাচ্ছেন এই মহাবিপদ থেকে। 'তুমি ফিরবে বলে' বইটি পড়ার পর আমার কাছে ঠিক এমনটিই মনে হলো যে, যৌবনের উন্মাদনায় যুবকেরা আল্লাহর অবাধ্যতা করে শাহাওয়াত (কামনা-বাসনা) দিয়ে ঘেরা ভয়ংকর জাহান্নামের দিকে পা বাড়াচ্ছে আর তাদেরকে সেই পথ থেকে ফেরানোর জন্য এক সুহৃদ হৃদয় নিংড়ে নাসীহা দিচ্ছেন। ভালোবাসা, আবেগ আর অভিমানমিশ্রিত লেখকের এসব নাসীহা এবং উদাত্ত আহ্বানগুলো যে-কোনো কঠিন হৃদয়কেও কাঁপিয়ে দিতে পারে, ইন শা আল্লাহ।"

-আল মুজাহিদ আরমান | মাস্টার্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

"লাগামহীন এই যুবসমাজকে টেনে ধরতে এবং 'আল্লাহর দিকে ফেরার' আহ্বান জানিয়ে এর চেয়ে ভালো দ্বিতীয় কোনো মোটিভেশনাল বই বাজারে আসছে কি না আমার জানা নাই। যারা দ্বীনের পথে আছেন, তাদেরও তাতে অটল ও টিকে থাকার প্রয়োজনীয় রশদ জোগাবে বইটি। বিশেষ করে আমাদের মতো জেনারেল পড়ুয়া প্রত্যেক যুবকদের হাতে হাতে বইটি পৌঁছানো উচিত।"

-আবুল কালাম আজাদ | MBBS (অধ্যয়নরত), ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ

“'তুমি ফিরবে বলে' বইটি আমাকে বারবার, 'ফা আইনা তাযহাবুনের' (সূরা তাকবীর, আয়াত ২৬) কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। 'তা সত্ত্বেও তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'— এই আয়াতটা মাথায় আসলেই তো এই ধোঁকাময় দুনিয়াটা ধূসর হয়ে ওঠে। ভেতর থেকে একটা ঝাঁকুনি আসে। এই ঝাঁকুনিটা আমাকে এই নশ্বর জীবনের বাস্তবতা বুঝিয়ে দেয়। জাকারিয়া মাসুদ-এর গদ্যে প্রাঞ্জলতা, সাবলীলতা, জাদু—সবই আছে। তিনি যুবকদের ভাষায় তাঁর হৃদয়ের তপ্ত আহ্বানগুলো এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, যাদের 'হৃদয়' আছে, তারা লেখকের বার্তাগুলো ধরতে পারবেন। আমি আশা করি, কামনা করি, দুআ করি—এই বইটা আমার মতো হাজারো 'আঠারো বছর বয়সের' যুবকদের অন্তরে ওই 'ঝাঁকুনি' তৈরি করুক। 'তুমি ফিরবে বলে' বইটি সফল হোক। আমীন!”

-আল মাসুদ আব্দুল্লাহ | ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

“রাতারাতি ধনী হওয়ার কৌশল শেখানোর জন্যে এই বই নয়। কথিত স্মার্টনেস শেখানোর জন্যেও এটি কোনো কাজে আসবে না। পাওয়া যাবে না কোনো গাইডলাইন। তবে এখনও যারা গান, নারী, মদ এবং গুনাহের সাগরে ডুবে আছে, তাদেরকে সীরাতে মুসতাকীমের পথ স্মরণ করিয়ে দেবে বইটি।”

- ইমরান রাইহান | লেখক, অনুবাদক

“জাকারিয়া ভাইয়ের 'তুমি ফিরবে বলে' বইটি একনাগাড়ে পড়ে শেষ করে ফেলার মতো চমৎকার একটি বই। কিছু বই আছে কয়েক পৃষ্ঠা পড়েই অসহ্য লাগে। নীরস ভাষার দুর্বোধ্য বই এগুলো। কিন্তু 'তুমি ফিরবে বলে' বইয়ের ভাষাগুলো এমনভাবেই লিখা আমার সারাক্ষণ মনে হয়েছে লেখকের সাথে পাশাপাশি বসে গল্প করছি।... এখান থেকে একজন তরুণ বা তরুণী তার লাইফটাকে নতুনভাবে চিন্তা করতে পারবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।... সেক্যুলার জীবনের তথাকথিত সিলেক্টিভ মানবতার লেসন শিখতে শিখতে একসময় মানুষ ইসলামকে কেবল জুম্মা আর দুই ঈদের সালাতের ছকে আটকে ফেলে। সেজন্যে এই বইটা সবার। আমার ইচ্ছে হয় সদ্য গোঁফ-গজানো কিশোর থেকে শুরু করে মাঝবয়েসী এমনকি সারাজীবন সেক্যুলার জীবনে জীবন্মৃত হয়ে সময় কাটিয়ে দেওয়া কোনো প্রৌঢ়কেও এই বইটি একটি বার পড়তে দিই।”

-মিসবাহ মাহীন | CUET

“অপার সম্ভাবনার অধিকারী হয়েও খাহেশাত আর অন্ধকার সমাজের এঁকে-দেওয়া জীবনের দুষ্টচক্রে ঘুরপাক খায় যৌবনের শত-সহস্র অধিকারীরা, হারিয়ে বসে নিজেদের আসল পরিচয়। সেই দুষ্টচক্রকে চিনিয়ে দিয়ে সরল পথে ফিরবার আহ্বান

করা বই 'তুমি ফিরবে বলে'। যাদের জন্য লিখা তাদেরই অবস্থান থেকে ভাবনা, স্পষ্ট নুসুস থেকে স্পষ্ট উত্তর আর দরদমাখা লিখনির সমন্বয় এর অনন্যতা। আর সমস্ত সফলতা তো কেবল আল্লাহরই পক্ষ থেকে।"

-তানভীর আহমেদ

"তিনটা বই পড়ার চেয়ে একটা ভালো বই তিনবার পড়া ভালো—এরকম একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়। কোনটা ভালো বই আর কোনটা গড়পড়তা বই সেটা একেকজন পাঠকের কাছে একেকরকম। আমার কাছে তিনবার পড়ার মতো ভালো বইয়েব সংজ্ঞা হলো, 'যে বইটা পড়ার পর মনে হয়, এটা তো আমার জন্যই লিখা হয়েছে, বইটা যেন আমার সাথে কথা বলছে।' জাকারিয়া মাসুদ ভাইয়ের 'তুমি ফিরবে বলে' বইটা পড়ার সময় মনে হয়নি কোনো বই পড়ছি। মনে হয়েছিল, একজন দ্বীনি ভাই আমাকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লিখেছেন। সেই চিঠিতে তিনি আমাকে দ্বীনে ফেরার আহ্বান জানাচ্ছেন। এরকম আবেগময় একটা আহ্বানের জন্য তো অপেক্ষা করছে লাখো-লাখো যুবক। আর দ্বীনদার যুবকদেব মধ্যে যারা আশেপাশের যুবকদের 'স্মার্টনেস' দেখে হীনম্মন্যতায় ভুগছেন, বইটি তাদেরকে দেখিয়ে দিবে, 'তুমি তো তাদের চেয়েও স্মার্ট'।"

-আরিফুল ইসলাম | লেখক : আর্গুমেন্টস অব আরজু, প্রদীপ্ত কুটির

তুমি দেখো, ফিরে এলে সামান্য কষ্টেই মেজাজটা আর বিগড়ে যাবে না। খামোখা ঝগড়া লাগবে না কারও সাথে। না পাওয়ার বেদনা তাড়া করবে না কখনও। হতাশা নামক শব্দটা হারিয়ে যাবে তোমার অভিধান থেকে। অন্যরকম প্রশান্তি আসবে হৃদয়ে। ফুরফুরে লাগবে সবকিছু। কেমন জানি একটু বেশিই সতেজতা অনুভব করবে। আকাশটা আগের চেয়ে নীল মনে হবে। দখিনা বাতাসটাকে উপলব্ধি করতে পারবে আরও প্রবলভাবে। আকাশের রুপোলি জোছনা কথা বলবে তোমার সাথে। গগনের মেঘ ইশারায় ডাকবে শ্রাবণ-দিনে। বৃষ্টিবিলাসে পুলকিত হবে হৃদয়। কাননের সুবাসিত হাওয়া মুগ্ধ করবে বারেবারে। আপন মনে হবে রোদ্দুরকে। সমুদ্রের ঢেউয়ের ভাষা তুমি বুঝতে পারবে। পাহাড়ের কলতান, ঝরনার বহমান ধারা, পুবালি বাতাস, শীতের শিশির, ফুলের সুবাস, জোনাকির আলো—সবকিছু কেমন যেন নতুন মনে হবে। কেমন জানি এক অন্যরকম রোমাঞ্চ অনুভব করবে। এই তুমি এক নতুন তুমিতে রূপান্তরিত হবে।